কবিতাসংগ্রহ

৪

কবিতাসংগ্রহ

৪

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

সম্পাদনা

সৌরীন ভট্টাচার্য

নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
৬৮ কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

ভূমিকা

'হাফিজের কবিতা' (ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪) থেকে 'অমরুশতক' (জানুয়ারি ১৯৮৮), এই চার বছরের চারখানি বই নিয়ে প্রকাশিত হল সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'কবিতা সংগ্রহ'-র চতুর্থ খণ্ড। এই চারখানি বইয়ের তিনখানিই অনুবাদ কবিতা। 'চর্যাপদ' অবশ্য বাংলা থেকেই বাংলায় তর্জমা, পুরনো বাংলা থেকে নতুন বাংলায়, সেদিনের বাংলাকে আজকের বাংলায় সাজানো। ঐ বইয়ের ভূমিকায় সে কথা নিজেই লিখেছেন কবি। অনুবাদ কবিতা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাব্যরচনায় বরাবরই একটা বড়ো জায়গা জুড়ে থাকে। এর আগে তিনি নাজিম হিকমত, নিকোলা ভাপৎসারভ্, পাবলো নেরুদা, ওলঝা সুলেমেনভ্ প্রমুখ কবিদের কবিতা অনুবাদ করেছেন। এঁদের কবিতা নিয়ে পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ কবিতার বই প্রকাশিত হয়েছে। নাজিম হিকমত ও পাবলো নেরুদার কবিতা নিয়ে দুটো করে বই রয়েছে। এরও বাইরে আছে, কিছুটা বিচ্ছিন্নভাবে হলেও, মারিস চাক্‌লাইস, ফয়েজ আহমদ্ ফয়েজ, রবার্ত রোজদেস্ত্‌ভেন্‌স্কি, ফেদেরিকো গার্থিয়া লরকা, সেজার ভায়্যেহো, তু ফু, সি. এফ. এণ্ডরুজ, আলেকজান্দার সল্‌ঝেনেৎসিন ও ভাল্লাথোল, এঁদেরও কিছু কিছু কবিতার অনুবাদ। কিন্তু ১৯৮৪ থেকে ১৯৮৮, এই সময়কালে তাঁর অনুবাদকর্মের যে চেহারা আমরা পাই তা কিছুটা অন্যরকমের। এখন তিনি অনেক বেশি মগ্নভাবে প্রাচীন কবিতার দিকে ফিরে তাকাচ্ছেন। নিকট সাংস্কৃতিক প্রতি-বেশের কাব্য ঐতিহ্যকে চিনে নিতে চাইছেন। এবং এ কথা তো লক্ষ করতেই হবে যে, হাফিজ-চর্যা-অমরুশতকের জীবনরসে টইটম্বুর কবিতা এখন তাকে কী নিবিড়ভাবে টানছে। সাধন-ভজন-পূজন এসব তো আছেই ; কিন্তু এহো বাহ্য। দৈনন্দিনের টুকিটাকিতে সবটুকু মজে থেকেই এখন তিনি জীবনকে খুঁজে পেতে চান তার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রত্যক্ষতায়। আর এ শুধু কোনো মরমী কথামাত্র নয়। সমাজ-ইতিহাসের অনুবন্ধেই তাঁকে খুঁজে নিতে হবে স্তরে স্তরে সাজানো আমাদের এই সমাজজীবনের বিচিত্র মাত্রা ও বহুবর্ণের সেই বৈভব। শহুরে রাজনীতির আবিলতাকে শাণিত ব্যঙ্গে বিদ্ধ করতে করতে তিনি পৌঁছে যেতে পারেন টানা ভগতের প্রার্থনায়। হাল্কা চালে বলে যেতে পারেন,

“শুনহ, মানুষ সত্য—
বলেছিল কোন এক হরিদাস
তুমিও তো বিশ্বাস করেছ।
আরে ছো!”

+ +

‘কবিতা সংগ্রহ’-র বর্তমান খণ্ডের সম্পাদনা কর্মেও আগের মতোই অনেকের সাহায্য পেয়েছি। তা না পেলে এ ধরনের কাজ করাও যায় না। নানা ব্যাপারে পরামর্শ দিয়েছেন ও পুরনো লেখাপত্র জোগাড় করতে সাহায্য করেছেন স্বপন মজুমদার, অরুণ সেন, পিনাকেশ সরকার, বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, অরুণা চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিজিৎ সেন। দিব্য মুখোপাধ্যায় তো তার সংগ্রহের কাগজপত্র উজাড় করেই দিয়ে থাকে। এবারেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। শঙ্খ ঘোষও যথারীতি গ্রন্থপরিচয় ও প্রসঙ্গকথা যতদূর সম্ভব ঠিকঠাক করে দিয়েছেন। সময়মতো কপি প্রেসের জন্য তাগাদা করায় অরিজিৎ কুমারের সৌজন্য কাজে যে কী পরিমাণ সাহায্য করে সে ওঁর সঙ্গে যাঁরা কাজ করেছেন তাঁরাই জানেন। আর বিভিন্ন প্রশ্ন নিয়ে সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে বিরক্ত করা সে তো আছেই।

এ সবের পরেও অসম্পূর্ণতা থেকে গেল। সে দায়িত্ব আমার।

সৌরীন ভট্টাচার্য

সূচি

হাফিজের কবিতা (১৯৮৪)

বাঘ ডেকেছিল (১৯৮৫)

অমরু শতক (১৯৮৮)

কবিতাসংগ্রহ

৪

হাফিজের কবিতা

আবু সয়ীদ আইয়ুব

শ্রদ্ধাস্পদেষু

অনুবাদ প্রসঙ্গে

আনুমানিক সাড়ে ছ'শো বছর আগে কবি হাফিজের জন্ম। পারস্যের সিরাজ শহরে জন্মেছেন ব'লে তার দীর্ঘ নামের সঙ্গে 'সিরাজী' কথাটা যুক্ত। এই শহরের প্রতি ভালোবাসা তাঁর বহু কবিতায় ব্যক্ত। কোরান তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল ; মুসলিম পুঁথি-পুরাণেও তাঁর ছিল রীতিমত দখল। স্বভাবদত্ত কবিক্ষমতাকে তিনি কষ্টার্জিত জ্ঞানে সমৃদ্ধ করেছিলেন।

তাঁর আর্থিক অবস্থা খুব সুবিধের ছিল না ; এমনকি সময়বিশেষে পয়সার জন্যে অন্যের পুঁথিও তাঁকে নকল করতে হয়েছে। রাজারাজড়া আমির-ওমরাহদের দানখয়রাত তাঁর ভাগ্যে বেশি না জোটার বড় কারণ হল, সে সময়টা খুব সুস্থির ছিল না ; রাজারাজড়াদের কেউই হাফিজের জীবনকালে গুছিয়ে রাজত্ব করতে পারে নি। একটা না একটা উপদ্রব লেগেই থাকত।

তবে বেঁচে থেকেই তিনি হয়েছিলেন প্রভূত যশের অধিকারী। হাফিজ বছর সত্তর বয়সে সিরাজ শহরেই মারা যান। তাঁর জীবন সম্বন্ধে যতটুকু জানা যায়, তাও পুরোপুরি প্রামাণ্য নয়। কারো কারো লেখায় জানা যায়, তিনি নাকি ভারতে আসবেন ব'লে মনস্থ করেছিলেন। তৈমুর লঙ্গের সঙ্গে নাকি তাঁর একবার কথা কাটাকাটি হয়েছিল।

হাফিজের একটি কবিতায় ভারত আর বাংলার উল্লেখ মেলে : 'দূর ভারতের শর্করাপ্রিয় তোতা পাখি', 'রূপসী বাংলায় আনা পারসী মিঠাই'। আর সেইসঙ্গে উল্লিখিত গিয়াসুদ্দিনকে তৎকালীন বঙ্গাধিপতি ব'লে মনে করা হয়, যাঁকে দেখবার জন্যে হাফিজ ছিলেন খুবই উৎকণ্ঠিত।

হাফিজের কবিতার বই প্রথম ছাপা হয় কলকাতায়। ১৭৯১ সালে। হাফিজের কবিতার প্রথম মুদ্রণের দ্বিশতবর্ষ পূর্ণ হতে বেশি দেরি নেই। কলকাতা সেদিক থেকে ভাগ্যবান।

॥ ২ ॥

হাফিজের সময়টা ছিল খুব কঠিন। সারা পারস্যে কেবল মারামারি আর হানাহানি। কাটা পড়ছে আজ এ-রাজা কাল সে-রাজার মুণ্ডু ; মাটিতে মিশিয়ে যাচ্ছে ঘরবাড়ি ;

কে গদিতে বসবে এই নিয়ে চলেছে লড়াই। মাঝে মাঝে হাফিজ হাঁফিয়ে উঠতেন : উন্মত্ত এই ভূমণ্ডলে এ কোন্ নৈরাজ্য? দিগন্ত ভ'রে উঠেছে যে শুধু বাদবিসংবাদ আর রাষ্ট্রদ্রোহে!

কিন্তু তারপরই তিনি আবার আত্মস্থ হয়েছেন। এ সবের উর্ধ্বে উঠে তিনি খুঁজেছেন এর মধ্যেকার অন্তর্লীন ঐক্য, জগতের অর্থ আর অভিপ্রায়। আবর্তের মধ্যে খুঁজেছেন অচঞ্চল নাভিপদ্ম।

হাফিজের কবিতায় স্তবস্তুতি বিরল; অতিশয়োক্তি নেই। ক্ষমতাবানদের ন্যায্য প্রশংসা করলেও, তাতে মাত্রাতিরিক্ত খোশামুদি নেই। কখনও কখনও তাদের এ কথা মনে করিয়ে দিতে ভোলেন নি যে, নিয়তির চোখে ছোট বড় ব'লে কিছু নেই—রাজা আর ফকির সমানভাবে দোষের জন্যে সাজা আর গুণের জন্যে পুরস্কার পাবে।

হাফিজের অন্বিষ্ট ছিল—সত্য, সততা আর ঐক্য; তাঁর চক্ষুশূল ছিল—সংঘাত আর বিসংবাদ। তুচ্ছ বিষয়ে কলহ আর মতবিরোধে হাফিজ দুঃখ পেতেন। কপট সাধুদের মিথ্যাচার আর প্রতারণার বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন খড়্গহস্ত। যেসব ভণ্ড সুফী লোটাকম্বল নিয়ে ফকির সাজে কিন্তু ভেতরে ভেতরে পাকা সংসারী, নিজে সুফী হয়েও, হাফিজ তাদের সমানে ঠুকেছেন।

হাফিজের বলবার নিজস্ব ধরন আছে। যে রীতিগুলোকে তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন, তার মধ্যে : দ্ব্যর্থকতা, পাশাপাশি সমান্তরাল প্রয়োগ, অনুপ্রাস, উপমা, রূপক ইত্যাদি। তিনি বিশেষ জোর দিয়েছেন দ্ব্যর্থকতার ওপর।

অনেক প্রচলিত উপমাও তিনি ব্যবহার করেছেন। যেমন : চুলের সঙ্গে নাস্তিকতা, শিকল, ফাঁদ, জাল, সাপের; ভুরুর সঙ্গে ধনুকের; দেহযষ্টির সঙ্গে সাইপ্রেস বা সরু ঝাউয়ের; মুখের সঙ্গে বাতি, গোলাপ, চাঁদের; হামুখের সঙ্গে গোলাপকাল আর পেস্তার। প্রথাদোষে দুষ্ট হয়েও হাফিজের হাতে এ সব শব্দ তাদের স্বভাবগুণ হারায় নি। সেই সঙ্গে হাফিজ তাঁর রচনায় সুন্দরভাবে ব্যবহার করেছেন লোকশ্রুতি আর লৌকিক প্রবাদ।

॥ ৩ ॥

গজলের জন্যেই হাফিজের এত নামডাক। আকারে ছোট এবং গীতোপযোগী; বিষয় প্রেম আর মদিরা—গজল এই ভাবেই শুরু হয়েছিল। হাফিজের আগে সাদীর হাতে গজল পেয়েছিল তার প্রায় নিখুঁত পরিণত রূপ। হাফিজ তাকে নিজের ছাঁচে গ'ড়ে নিয়ে প্রায় অসাধ্য সাধন করেন।

হাফিজের কাব্যসৃষ্টিকে তিন পর্বে ভাগ করা হয়।

আদি পর্বের বৈশিষ্ট্য হল: আগাগোড়া এক আর অভিন্ন প্রসঙ্গ; কবির আত্মতৃপ্ত না হওয়া অবধি তার বিস্তার। দ্বিতীয়ত, দার্শনিক তত্ত্বের অভাব। তৃতীয়ত, বস্তু শুধুই বস্তু; কোনো কিছুর প্রতীক নয়। শুধুই নরনারীর প্রেম, দ্রাক্ষা থেকে নিষ্কাশিত নিছক রক্তবর্ণ মদ।

মধ্য পর্বে শব্দ আর অর্থের অভিব্যক্তিতে দুটি বিশিষ্ট রূপ ফুটে উঠেছে। হাফিজের আগে যাঁরা লিখেছেন, তাঁদের গজলে এক বারে একটাই প্রসঙ্গ আসত। তাকে টেনে বড় করা হত নিছক কারিকুরি দিয়ে। কালোয়াতির মারপ্যাঁচে আসল কথাটা চাপা পড়ে যেত।

হাফিজ তাঁর কাব্যপ্রকরণে আনলেন প্রসঙ্গের ভিন্নতা। একই গজলে দুই বা তদধিক প্রসঙ্গ এল, অথচ গজলের ঐক্য অক্ষুণ্ণ রইল। আপাতবিষম প্রসঙ্গ জুড়ে এক অপূর্ব সামঞ্জস্যে পৌঁছুনো—গজলে এ জিনিস হাফিজের আগে ছিল না। কোনো প্রসঙ্গ পুরোপুরি আনারও দরকার নেই। খণ্ডভাবে আনলেও তা সমগ্রের অঙ্গীভূত হবে। অভ্যস্ত শ্রোতাদের স্মৃতিতে বহুশ্রুত ফারসী কবিতার সঞ্চিত ভাণ্ডার থাকায় হাফিজের এই নতুন রীতির গজল রসগ্রহণে ব্যাঘাত ঘটায় নি। ল্যাজ টানতেই মাথা এসে গেছে। এই আনুকূল্যের ফলে, হাফিজ তাঁর কিছু নতুন কথাও সেই 'সোনার তরী'তে স্বচ্ছন্দে চাপিয়ে দিতে পারলেন।

হাফিজ যুক্তির বদলে বরণ করেছিলেন প্রেমের পথ। তাঁর কাছে জীবন ছিল এমন রহস্য যা ভেদ করা যায় না। মতের দিক দিয়ে তিনি ছিলেন সুফী। কিন্তু দর্শন বা ঈশ্বরতত্ত্ব, মসজিদ বা মঠ, শ্রুতিস্মৃতি বা আচারবিচার—এ সবের ধার দিয়ে তিনি যান নি। 'আমিই সেই সত্য' ব'লে হাসিমুখে মৃত্যু বরণ করা মনসুর আল-হল্লাজের প্রতি হাফিজ প্রকাশ্যেই সমর্থন জানিয়েছিলেন। তেমন ভণ্ড সুফীদের বিরুদ্ধে মুখ খুলতেও তিনি ভয় পান নি। সর্বভূতে নিজেকে তিনি মিলিয়ে দিতে পেরেছেন।

হাফিজের শেষ জীবনের রচনায় এসেছে আরও বেশি দার্ঢ্য; কম কথায় ঠারেঠোরে বুঝিয়ে দেওয়ার প্রবণতা বেড়েছে। বাইরেটা আরও বেশি সহজ, কিন্তু ভেতরে পাক দেওঁয়া গভীর দহ।

সবশেষে অনুবাদক হিসেবে কয়েকটা কথা বলবার আছে।

আমি ফারসী জানি না। যিনি মূলের প্রতিটি শব্দ ধ'রে ধ'রে বুঝিয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে হাফিজের পদানুসরণে আমাকে সাহায্য করেছেন, এক্ষেত্রে আমার সেই

অঙ্কের নড়ি শ্রীযুক্ত রেওতীলাল শাহকে অশেষ ধন্যবাদ জানালেও তাঁর কাছে আমার কৃতজ্ঞতা ফুরোবে না। রেওতীলাল কলকাতাবাসী রাজস্থানী। উর্দু আর ফারসী, দুটোতেই তাঁর ভালো দখল। যোগ্যতায় ইলেকট্রনিক্স্ ইঞ্জিনিয়ারিং-এর মাস্টার ডিগ্রির অধিকারী। জীবিকায় ব্যবসায়ী। দিনের পর দিন জীবিকার কাজ ফেলে সাহিত্যের প্রতি ভালবাসার বশে আমাকে তিনি যেভাবে এ কাজে তাঁর মূল্যবান সময় দিয়েছেন, তাতে তাঁর কাছে আমি চিরঋণী থাকলাম।

অনুবাদে আমি হাফিজের যথাসম্ভব অনুগত থাকার চেষ্টা করেছি। কোথাও কোথাও আমার বোঝার ভুল হয়ে থাকতে পারে। রসের দৃষ্টিতে যাঁরা এই ভুল ধরিয়ে দেবেন, তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ থাকব।

কিছু পাঠকের আগ্রহে হাফিজ-এর মূল কবিতাগুলি বাংলা হরফে শেষাংশে দেওয়া হল। বাংলা পাঠান্তরে হরফের সীমাবদ্ধতায় সব ক্ষেত্রে যথাযথ উচ্চারণ নির্দেশ সম্ভব হয় নি ব'লে আগে থেকে মার্জনা চেয়ে রাখছি।

নিবেদন

যাঁরা ফারসী মূলের সঙ্গে পরিচিত হতে চাইবেন, তাঁদের জন্যে বাংলা অক্ষরে কবিতাগুলি অনুবাদের ক্রম অনুযায়ী গ্রন্থশেষে দেওয়া হল। এক লিপি থেকে অন্য লিপিতে ঠাঁইনাড়া করতে গিয়ে কিছু কিছু অক্ষরে বিশেষ বিশেষ ধ্বনি আরোপ করতে হয়েছে :

জ-র উচ্চারণ যেখানে জেড-এর মত, সেখানে 'য'; ব-র উচ্চারণ যেখানে ডবলিউ-এর মত, সেখানে ছোট 'ৱ'; ইঅ-র উচ্চারণের জায়গায় ব্যবহার করা হয়েছে 'য়' (যেমন য়ার=ইয়ার)। এ সত্বেও আমার অজ্ঞতাবশত ভাষাগত কিছু ভুল হয়ত থাকবে।

এ কাজেও আমার বন্ধু রেওতীলাল শাহ আমাকে নিঃস্বার্থভাবে যা সাহায্য করেছেন তাতে তাঁর কাছে আমার ঋণ শোধ হওয়ার নয়।

সু. মু.

পুঃ লজ্জার সঙ্গে জানাচ্ছি যে, এ-বই বার হতে আমারই দোষে বেশ দেরি হয়ে গেল—যদিও উৎসর্গপত্রটি লেখা হয়েছিল প্রায় এক বছর আগে।

প্রেম সহজ না

এসো সাকি, এসো, রেখো না বসিয়ে
হাতে হাতে দাও ভর্তি পেয়ালা ;
আগে ভাবতাম প্রেম কী সহজ,
আজ দেখি তাতে কী বিষম জ্বালা।

খোঁপা থেকে মৃগনাভির সুরভি
ভেসে এসেছিল ভোরের হাওয়ায়
চমৎকানো তার চূর্ণ অলক
হৃদয়ে রক্তগঙ্গা বহায়।

প্রাণবঁধুয়ার পান্থশালায়
এ সুখশান্তি ক'দিনের বলো !
দিনরাত খালি বাজছে ঘণ্টা :
'গোটাও তোমার পাততাড়ি, চলো !'

কী ঘোর রাত্রি, কী ভীষণ ঢেউ,
রসাতলে-টানা ঘূর্ণী এমন —
কী ক'রে জানবে শুক্‌নো ডাঙায়
ঝাড়া হাত-পায় যে করে ভ্রমণ !

বুড়ো মাজি বলে, নমাজ পড়ার
আসনে ছুটুক মদের ফোয়ারা ;
সদ্‌গুরু নয় অজ্ঞ, সে জানে
সঠিক লক্ষ্যে চলবার ধারা।

মাজি—ইংরিজি 'ম্যাজি'। যাজক সম্প্রদায়, জাদুকরও বটে। যা থেকে 'ম্যাজিক'। পুরনো ফার্সীতে 'মগুস'। ইরাণীতে মগু। বাংলায় 'মাজী' পদবী আছে। সংস্কৃত 'মায়া'র সঙ্গে 'ম্যাজিকে'র মিল থাকা সম্ভব।—অনুবাদক

পরিণামে রটে নিন্দে, কারণ
যা করেছি শুধু নিজেরই জন্যে ;
সে রহস্য থাকে গোপন কিভাবে
জানাজানি হলে এ জনারণ্যে !

হাফিজ, চাও কি তার দর্শন ?
ক'রো না নিজেকে আড়াল তাহলে ;
দেখা দিলে প্রিয়া, এই জগৎটা
ভুলে যেয়ো তুমি, ছেড়ে যেয়ো চ'লে ॥

কোথায়

ওদিকে রয়েছে পুণ্যকর্ম
এদিকে রয়েছি আমি দুরাচার ;
চেয়ে দেখ, এই দুইয়ের মধ্যে
রচে ব্যবধান অকূলপাথার ।

মঠমন্দির নামাবলীভেখ
ওতে মন নেই, ছেড়েছি ওসব ;
কোথা কোণার্ক, কোথা সদ্গুরু
কোথায় মিলবে শুদ্ধ আসব ?

সংযম আর সৎকর্মের
সঙ্গে কী যোগ মদ্যপানের ?
উপদেশ-কথামৃতের সঙ্গে
আওয়াজে কী মিল থাকবে গানের ?

চোখে যদি ভাসে বন্ধুর মুখ
তবে কোন্ ভাব হবে শত্রুর ?

কোথাও হয়ত জ্বলছে না বাতি,
কোথাও আবার ঠা-ঠা রোদ্দুর।

যেখানে তোমার দেহলির ধুলো
আমার আঁখিতে কাজল পরায়,
ব'লে দাও প্রভু, অন্য কোথায়
চ'লে যেতে হবে ছেড়ে এই ঠাঁই।

আপেলের মত প্রিয়ার চিবুক
তার মাঝে এক কুয়ো আছে জেগে;
মন, তুমি এই সব কিছু ছেড়ে
কোথায় চলেছ হন্ হন্ বেগে!

আমরা যে মিলেছিলাম একদা
সে সুখস্মৃতির হল অবসান;
কী ক'রে আপনি মিলাল সে সব
সে মোহিনী মায়া, সেই অভিমান!

বন্ধু আমার, হাফিজের কাছে
সুখ বা স্বস্তি ক'রো না কো আশা;
জানে না সে কাকে বলে তিতিক্ষা,
শান্তি কোথায়? তার জিজ্ঞাসা॥

স্বর্গে যা নেই

গালে-কাল্লো-তিল সেই সুন্দরী
স্বহস্তে ছুঁলে হৃদয় আমার,
বোখারা তো ছার, সমরখন্দ্ও
খুশি হয়ে তাকে দেব উপহার।

স্বর্গে যা নেই, আমি যেন পাই
হে সাকি, বানাও এমন বিধান,
রুক্‌নাবাদের নদীর কিনার,
মুসল্লার সে ফুলের বাগান।

খণ্ডিত এই প্রেম দিয়ে আমি
পারি না বাঁধতে সে অপরূপাকে ;
রং তিল চুল—কিছুই কিছু না
যদি লাবণ্য চোখেমুখে থাকে।

দিনে দিনে ইউসুফের যে রূপ
বাড়ছে চন্দ্রকলার সমান
সতীসাধ্বীর পর্দা সরিয়ে
জুলেখাকে দেবে সবলে সে টান।

গানে আর মদে জমাও আড্ডা
ভবরহস্য হাত্‌ড়ে কী লাভ ?
বুদ্ধির পথে চললে কখনও
পাবে না কেউ এ ধাঁধার জবাব।

কান দাও, প্রিয়া, আমার কথায় :
ঘা দিয়ে যতই শেখাক জীবন,
নওজোয়ানেরা জানে, তার চেয়ে
ঢের বেশি দামী প্রাজ্ঞবচন।

আকথা-কুকথা বলেছ অনেক
তবু কোনো ক্ষোভ রাখি নি কো প্রাণে ;

হাফিজের জন্মভূমি শিরাজ শহরে ছিল রুক্‌নাবাদ নদী আর মুসল্লার গোলাপবাগ।
ইউসুফ আর পতিফার-জায়া জুলেখার কোরান-বর্ণিত প্রেমকাহিনী ফারসী কবিদের জনপ্রিয় প্রতীক।

তুমি ঠিকই বলো : বিম্বাধরের
কটু কথাটাও মিঠে লাগে কানে।

বানিয়েছ তুমি এমন গজল
কথা দিয়ে গাঁথা মুক্তোর হার,
হাফিজ, তোমার ছত্রে ছত্রে
যেন ঝিকিমিকি তারার বাহার ॥

সুবাতাস

হে বাতাস, যাও সেই অপরূপ
হরিণকে বলো মধুর ভাষায় :
'তোমারই জন্যে নির্জন মাঠে
পাহাড়ে পাহাড়ে নিত্য বেড়াই—

'রূপের রাজ্যে তুমি শাহান্‌শা
এ জগতে জানি তুমিই পরম ;
তোমার মনের এককোণে ঠাঁই
প্রার্থনা করে এ দীন অধম।'

শতায়ু হোক সে ! যে মিঠাইঅলা
বাড়ি বাড়ি ফেরী করে মধুরতা ;
কেন এতটুকু ভেঙে দেয় না সে—
মিষ্টি যে এত ভালবাসে তোতা !

হে গোলাপ, তুমি রূপবতী ব'লে
পড়ে না গর্বে পা বুঝি মাটিতে,
প্রেমে পাগল যে বুলবুল, কই,
দেখি না তো তার কোনো খোঁজ নিতে।

এত্ত সুন্দর তোমার আদব
জালে আটকাবে বিজ্ঞ যে কেউ,
কিন্তু চতুর পাখি পা দেবে না
ফাঁদে যদি দানা ছড়ানো থাকেও।

দুটি কালো চোখ, চন্দ্রবদন,
দেহযষ্টির অপূর্ব ঢং ;
বুঝতে পারি না তবু কী কারণে
ফোটে নি কো তাতে প্রণয়ের রং।

তার মুখ হত অনিন্দনীয়
কেবল একটি তিল থেকে গেলে
সে-শুভচিহ্নে বোঝা যেত ঠিক
একনিষ্ঠতা তার কাছে মেলে।

যখন বন্ধুবান্ধব নিয়ে
বসবে জমাট আড্ডা মদের
যেন মনে পড়ে শুধু একবার
ছন্নছাড়া এ ভবঘুরেদের।

যদি হাফিজের একটি গজল
নিয়ে শুকতারা আশমানে মাতে,
যদি নাচে যীশুখ্রীস্ট সে সুরে
আশ্চর্যের কী রয়েছে তাতে ?

এ বসন্তে

বাগানে-বাগানে বনে-উপবনে
নওজোয়ানের কাল এসে গেছে ;
পেল সুকণ্ঠ বুলবুল আজ
সেই সুখবর গোলাপের কাছে।

বাগানের যৌবন গায়ে মেখে,
হে বাতাস, গেলে এই পথ দিয়ে
ঘাস, সরুঝাউ, গোলাপের কাছে
আদাব আমার দিও পৌঁছিয়ে।

যেসব মানুষ মাতালকে দেখে
পরিহাস করে, মাতে নিন্দায়—
ভয় হয়, তারা খুইয়ে ধর্ম
শুঁড়ির পসার বাড়িয়ে না দেয়।

ঈশ্বরে মতি রয়েছে যাদের
তাদের সঙ্গে তুমি ভাব রাখো ;
তুফানে নোয়া-র নৌকোর মাটি
একবিন্দুও ভয় করে না কো।

আকাশের আস্তানা থেকে নামো ;
দেখো, যেন ভিখ্ মেগো না কো রুটি—
তাহলে সে লোভী নিষ্ঠুর হাতে
টিপে ধরবেই অতিথির টুঁটি।

সরাইখানার লালছেলে যদি
এইভাবে তার রূপ মেলে ধরে,

সরুঝাউ—সাইপ্রেস গাছ।

ভুরু দিয়ে বেঁধে নেবো ফুলঝাড়ু
যাতে কোনো ধুলো না থাকে এ ঘরে

অস্তিত্বের একবিন্দুও
ধরা পড়বে না তোমার চিত্তে,
যদি তুমি এই কর্মজগতে
ঘুরে মরো শুধু একই বৃত্তে।

একটি রাতের এ পান্থশালা
পরিণামে হবে দুমুঠো ভস্ম,
কী লাভ তেমন ইমারত তুলে
মাথা করে যার গগন স্পর্শ!

বুঝি না কেন যে ও-কেশগুচ্ছে
এত অযত্ন, এত অবহেলা—
কস্তুরীমাখা চূর্ণ অলক
আলুথালু হয়ে থাকে সারাবেলা!

জেনো, মুক্তির নিজবাসভূমি,
একা এককোণে শান্তির ঠাঁই,
এই দৌলত অসিবলে কাড়ে
হায় রে, জগতে সে রাজা কোথায়!

খেয়ে যাও তুমি শরাব, হাফিজ
নেশা ক'রে বুঁদ হও, সুখে থাকো।
অন্যের দেখাদেখি কোরানকে
ফাঁদে ফেলবার কল ক'রো না কো॥

কর্মলোক

নড়বড়ে ভিতে দাঁড় করানো এ
আশার মিনার ; তুমি এসে যাও।
ভর ক'রে আছে জীবন শূন্যে—
আনো গো শরাব, পেয়ালা সাজাও।

এখানে এ নীল আকাশের নিচে
আছে যার এতখানি হিম্মত,
যাকে ছোঁয় না কো কোনো আসক্তি—
তাকে দিই লিখে গোলামির খৎ।

কাল রাত্তিরে শরাবখানায়,
আমার তখন মত্তাবস্থা,
অন্য জগৎ থেকে এই কথা
এসে ব'লে গেল এক ফেরেস্তা—

'হে দূরদর্শী শাহবাজ, যার
থাকার জায়গা সপ্তস্বর্গ,
কর্মলোকের এককোণে ছোট
নীড় নয় তার থাকার যোগ্য।

'ঊর্ধ্বলোকের কার্নিশ থেকে
শুনছ কি ভেসে আসছে সওয়াল—
বলো, কোন্ দুর্বোধ্য কারণে
তোমাকে আটক করেছে এ জাল ?

'বলব তোমাকে যা বলেছিলেন
আমাকে তত্ত্বজ্ঞানী একজন ;
ভুলো না সে বাণী, ক'রো বরাবর
অক্ষরে অক্ষরে তা পালন—

'যা পেয়েছ, হও তাতেই তুষ্ট ;
ফুটিয়ে তুলো না ভ্রূভঙ্গে খেদ,
তোমার আমার নেই কোনো হক,
রুদ্ধ দুয়োরে প্রবেশনিষেধ।'

পার্থিব ক্লেশে থেকো অবিচল,
ভুলো না আমার সৎ উপদেশ ;
প্রেমের কথায় একদা আমায়
এক ভবঘুরে বলেছিল বেশ—

'এ ধরাধামের ভিৎটাই কাঁচা
ভেবো না সে কথা দিয়ে কথা রাখে
জরদ্গব এ বুড়িটা নাচায়
হাজারটা বর দড়ি দিয়ে নাকে।'

অন্তরে নেই বিশ্বস্ততা
ঠোঁটে যে হাসিই ফোটাক গোলাপ ;
ভগ্নহৃদয়ে কাঁদে বুলবুল
হায় রে, এখানে শুধুই বিলাপ।

অপটু কবিরা, হাফিজকে দেখে
কেন ঈর্ষ্যায় হচ্ছ কাতর ?
রসবোধ আর রচনাশক্তি
সবার থাকে না, দেন ঈশ্বর ॥

গভীর নিশীথে

খুলে গেছে খোঁপা, ঝ'রে পড়ে ঘাম
ঠোঁটে হাসি, মুখে মাতোয়ারা ভাব ;
ছিন্ন পিরান, কণ্ঠে গজল,
দু'হাতে সুরাইভর্তি শরাব—

শেষের সেদিন গভীর নিশীথে
এসে বসেছিল আমার শিয়রে ;
কমল নয়নে আহত দৃষ্টি,
ছিল কিছু ব্যথা তাপিত অধরে।

আমার কানের কাছে মুখ এনে,
অভিমানে গলা কেঁপে যায়, তাও
বলল বঁধুয়া, 'হে প্রিয় আমার,
এ মধুনিশিতে তুমি নিদ্ যাও ?'

বিছানায় শুয়ে মুখের গোড়ায়
এভাবে যে পায় শরাব রাতের,
সে পারে না হতে খাঁটি মদ্যপ
প্রেমের জগতে জেনো সে কাফের।

বলব : 'যা ভাগ !'—যদি দুয়ো দেয়
মদ্যপদের মোল্লাপুরুতে ;
সৃষ্টিকর্তা একটাই বর
ওদের যে দেন সবার শুরুতে।

•

পেয়ালায় তিনি যাই ঢেলে দেন
গিলে ফেলি এক গণ্ডুষে সব—
হোক্ গে তা পরব্রহ্ম কিংবা
দ্রাক্ষাফলের মজানো আসব।

পেয়ালার ঠোঁটে মৃদু মৃদু হাসি—
প্রিয়ার চূর্ণ কেশের কলাপ
ভেঙেছে তোবা তো সকলেরই, শেষে
হাফিজেরও হল কথার খেলাপ ॥

দুই-দুয়ারী

বাগানে ফুটেছে রক্তগোলাপ,
মাতোয়ারা হল বুলবুল সব ;
হে সুরাপ্রেমিক, কোথায় তোমরা !
তোলো চারিদিকে আনন্দরব ।

পাথরের মত কঠিন কঠোর
যতই হোক গে ভিত্তি তোবার,
দেখ, কী সহজে কাঁচের গেলাস
করল সে-ভিৎ ভেঙে চুরমার ।

ছেড়ো না কদাচ ন্যায়ের রাস্তা
থাকেও তোমার ডানাপাখা যদি,
আকাশের দিকে ছুটন্ত তীর
মাটিতেই মাথা ঠোকে শেষাবধি ।

ছেড়ে চলে যাওয়া নিয়তি যখন
দুই-দুয়ারী এ পান্থশালায়,
সংসারে কার মোকাম ক'তলা
সে হিসেবে বলো কিবা আসে যায় !

মন থেকে ঝেড়ে ফেলো 'হয়' 'নয়',
থাকো খাসা সদানন্দ চিত্তে ;

যা কিছু নিখুঁত সুন্দর সব
লীন হয় শেষে অনস্তিত্বে।

আসফের দোর্দণ্ড প্রতাপ,
সে হাওয়াই ঘোড়া, পাখির জবান—
মিলাল হাওয়ায় ; ছেড়ে গেল সেও
সর্বেসর্বা যে খানজাহান।

নিয়ে এসো মদ, দু'হাতে বিলাও ;
পান যেন রাজা, পায় দ্বারবান।
যে হুঁশিয়ার, যে মাতাল বেহেড
এই মজলিশে সকলে সমান।

হাফিজ, তোমার লেখনীর মুখে
ধ্বনিত হবে কি আশীর্বচন ?
হাতে হাতে ফেরে গানের সে ডালি
তুমি দিয়েছ যা উপঢৌকন॥

নাম আছে তাই

গলায় ফুলের মালা, হাতে মদ,
প্রেয়সী এসেছে আমার সকাশ ;
এমন মধুর দিনে মনে হয়
রাজাও আমার কাছে ক্রীতদাস।

রাজা সুলেমানের উজীর ছিলেন আসফ ; হাওয়া ছিল তাঁর ঘোড়া, তিনি পাখির ভাষা বুঝতেন।

মিনতি আমার, মহফিলে আজ
বাতি জ্বালানোটা থাকুক বন্ধ ;
প্রিয়ার মুখচ্ছবিতে দেখ না
জ্বলজ্বল করে পূর্ণচন্দ্র ।

বঁধু হবে ফুলতনু, সরুঝাউ !
দেহটি তোমার আদলে সুঠাম ;
সে কাছে থাকবে, তবেই বৈধ—
না হলে ধর্মে শরাব হারাম ।

সুরেলা বাঁশিতে, তবলার বোলে
কান পেতে রাখি সমস্তক্ষণ ;
চেয়ে চেয়ে দেখি দুটি কালো ঠোঁটে
পানপাত্রের গমনাগমন ।

এই মজলিশে আনতে আমেজ
কেন মিছিমিছি ছড়াবে আতর ?
তোমার চুলের গন্ধে তো দেখি
সব কিছু হয়ে গিয়েছে বিভোর ।

কথাটা যখন ওঠে মিষ্টির
কেন আনো মেওয়া, মণ্ডামিঠাই ?
তোমার ঠোঁটের মিষ্টতা ছাড়া
আমার মাথায় আর কিছু নাই ।

কেলেঙ্কারির কথা যদি বলো,
তাতেই আমার নামডাক এত ;
তোমার সওয়ালে আমার জবাব—
নাম আছে, তাই আমি কুখ্যাত ।

আমি যে মাতাল, ছিটগ্রস্ত,
করে ছোঁক ছোঁক বামাচারী চোখ—
মানছি, কিন্তু দেখাও শহরে
আমার মতন নয় কোন্ লোক ?

পূজারীর কাছে কখনও ক'রো না
আমাদের নামে নিন্দেমন্দ ;
কেননা তারাও আমাদেরই মত
সন্ধান করে পরমানন্দ ।

ব্যথাবেদনার সঞ্চিত ধন
কবে নিল ঠাঁই হৃদয়ে আমার ?
পান্থশালার এককোণে যেই
পেতেছি আমার নিজ সংসার ।

হাফিজ, থেকো না ব'সে তিলার্ধ
মদ ও বধূর সঙ্গবিহীন ;
চেয়ে দেখ, ফোটে যুঁই ও গোলাপ
এসে গেছে রোজা ভাঙবার দিন ॥

পোহালে রজনী

বাগানে সদ্যফোটা গোলাপকে
পোহালে রজনী বলে বুলবুল :
'কী অত ঠেকার ? তোমার মতন
ফুটেছে অমন কত শত ফুল !'

উত্তরে হেসে বলেছে গোলাপ :
'করব না এতে কোনো কটাক্ষ ;

বামাচারী চোখ—নজরবাজ ; মেয়েদের দিকে যার নজর ।

এও ঠিক, প্রিয় বলে নি প্রিয়াকে
কখনও এমন কঠিন বাক্য।'

রত্নখচিত পেয়ালায় সাধ
হয় যদি লাল মদিরা খাওয়ার,
গেঁথে আনো আঁখিপক্ষ্মে তাহলে
চুনি আর মোতি দিয়ে মণিহার।

প্রলয়ের আগে প্রেমের সুবাস
কেউ যদি তার ঘ্রাণে চায় পেতে,
জেনো, দুই গাল ঘ'ষে তাকে ঝাঁট
দিতে হবে পানশালার মেঝেতে।

ইরমের ফুলবনে কাল রাতে
আকাশবাতাস ছিল আহামরি,
ভোর হতে মৃদুমন্দ হাওয়ায়
খ'সে গেল নীলকান্ত কবরী।

বলি, 'ওহে জামশেদের তখ্‌ত,
কোথা সে বিশ্বদর্শী পেয়ালা?'
বলে সে সখেদে, 'জেগে-ওঠা ধন
অঘোরে এখন ঘুমায়, কী জ্বালা।'

জিহ্বাগ্রে যা নিঃসৃত হয়
তাতে ফোটে না কো প্রেমের স্বরূপ;
হে সাকি, এদিকে বাড়াও শরাব,
আর কথা নয়, একদম চুপ।

ইরমের বাগান—কথিত আছে, এডেনের কাছে, মরুভূমির মধ্যে পিতামহ ইরমের নামে রাজা সাদ্দাদ এই বাগানের পত্তন করেন।

জামশেদ—প্রাচীন পারস্যের রাজা। তাঁর জাদু-পেয়ালায় নাকি বিশ্বসংসারের ছবি ফুটত।

বুদ্ধিশুদ্ধি ধৈর্যও তার
অশ্রুধারায় মিলালো সাগরে ;
লুকানো যায় না প্রেমের এ জ্বালা,
হাফিজ পড়েছে বিষম ফাঁপরে ॥

পবনবাহন

পবনবাহন পাখি হুদ্ হুদ্,
শেবা-র মহিষী আছেন যেথায়—
সেইখানে যাও ; যেতে যেতে দেখ
কোথা দিয়ে পথ কোন্‌খানে যায়।

দোহাই, হে মরজগতের পাখি,
বায়ুপথে আমি তোমাকে পাঠাই—
একনিষ্ঠতা রয়েছে যে নীড়ে
এইখান থেকে আর কোনো ঠাঁই।

ভালবাসার যে পথ, সেখানে তো
দূর বা নিকট ব'লে কিছু নেই—
দুচোখে দেখছি তোমাকে স্পষ্ট,
পাঠাচ্ছি তাই শুভেচ্ছা এই।

উত্তরে আর পুবের হাওয়ায়
সকালসন্ধ্যা রোজ দুইবেলা

হুদ্ হুদ্—হুপো পাখি। রাজা সুলেমান নাকি তাঁর দূত হিসেবে এই পাখিকে রাণী বিলকিসের কাছে পাঠিয়েছিলেন।

শেবা-র মহিষী—দক্ষিণ ইয়েমেনে ছিল সাবা রাজ্য ; বাইবেলে বলা হয়েছে শেবা। শেবা-র রাণী বিল্‌কিস্ জেরুজালেমে গিয়েছিলেন রাজা সুলেমানের প্রাজ্ঞতা যাচাই করতে।

পাঠাই তোমার সন্দর্শনে
আমার আশীর্বাদের কাফেলা।

দেখবে নিজের মুখচ্ছবিতে
দক্ষ হাতের কিবা খোদকারি ;
পাঠাই আয়না, দেখ তাতে ফোটে
যে মুখ, সেটা তো স্বয়ং খোদারই।

তোমার হৃদয়রাজ্য যাতে না
ব্যথার ফৌজ করে ছারখার,
তোমার দুঃখে দুখী আমি তাই
পাঠাচ্ছি প্রাণপুরুষ আমার।

পৌঁছিয়ে দাও বেদনা নিয়ত,
নিজ গরিমায় আওড়াও খালি :
'পাঠালাম আমি খোদার নামেই
তোমাকে দুঃখশোকের এ ডালি।'

দৃষ্টির অগোচরে থাকলেও
হৃদয়ে আমার পেতেছ আসন ;
তোমার কুশল প্রার্থনা করি,
পাঠাই আমার আশীর্বচন।

গায়কেরা যাতে ব'লে দিতে পারে
কে আমি, কেমন রুচি—এ সকলি,
তোমাকে সটান পৌঁছিয়ে দিই
সুরসংযোগে গজলের কলি।

কথিত আছে, আলেকজাণ্ডারেরও ছিল এমন আয়না যাতে সব কিছুই দেখা যেত।

'কই সাকি, আনো!' কোথা থেকে এক
ফেরেস্তা এসে বলল, 'ও ভাই,
সুখবর আছে। ধৈর্য ধরলে
পেয়ে যাবে এক জবর দাওয়াই।

আসরে বসলে সকলের মুখে
হে হাফিজ, শুধু তোমার কথাই।
জিন্-দেওয়া ঘোড়া, জাব্বা-জোব্বা
পাঠাই। পত্রপাঠ আসা চাই॥

নিজেরই মধ্যে

হৃদয়ের সেই চিরকেলে জেদ—
দিতে হবে জামশেদের পেয়ালা।
যা আছে নিজেরই মধ্যে, কী ক'রে
দেবে তা অন্যে? এ তো ভ্যালা জ্বালা!

ভেঙে বার হয়ে এল যে মুক্তো
দেশ ও কালের খোলসটা খুলে
তলব করো তা যার কাছে, নিজে
বাউণ্ডুলে সে দরিয়ার কূলে।

'দেখুন, পড়েছি বড়ই ধাঁধায়'—
কাল রাতে বুড়ো মাজিকে বলায়
শুধু তিনি এক নজর দেখেন,
সব উত্তর তাতে মিলে যায়।

ঘোড়া আর জাব্বাজোব্বা—রাজা গুণীজনদের ডেকে পাঠালে সঙ্গে সাজানো ঘোড়া আর ভদ্রস্থ পোশাক পাঠানোর রেওয়াজ ছিল।

দেখি আনন্দময় হাসিমুখ
করতলে ধরা মদের পেয়ালা ;
সেই দর্পণে ফোটে অবিরত
শ'য়ে শ'য়ে গাঁথা সদুক্তিমালা।

তাঁকে শুধোলাম, 'হে প্রাজ্ঞ, কবে
পেলেন পেয়ালা বিশ্বদর্শী ?'
'যেদিন প্রথম গাঁথা হয়েছিল
নীল গম্বুজ অলকস্পর্শী।'

খোদা যদি আজ খুশি হয়ে ফের
বহান জগতে করুণার ঢেউ,
যীশুখ্রীস্ট যা করেছেন তাও
করতে পারেন অন্য যে কেউ।

বলি, 'যে বন্ধু করেছিল স্তুতি
শূলদণ্ডের, দিতে হল প্রাণ।
শুধু অপরাধ : যা ছিল গুহ্য
দিয়েছে বন্ধু তার সন্ধান।'

'আসা-নড়ি আর শ্বেত হস্তের
কাছে বাজিকর সামুরি ঘায়েল।
এখানেও ঘটে অবিকল তাই ;
হার মেনে যায় বুদ্ধির খেল্।'

হুসেনকে শূলে চড়ানো হয়েছিল, কারণ তিনি বলেছিলেন 'আমিই সত্য'। ভগবৎপ্রেমের গোপন রহস্য তিনি ফাঁস করেছিলেন—এই তাঁর অপরাধ।

'আসা-নড়ি' আর 'শ্বেত-হস্ত'—স্বর্গীয় মায়া-বিদ্যাবিশারদ মুসার প্রতীক। তাঁর কাছে পরাস্ত হন বাজিকর সামুরি।

তাঁকে বলি, 'আমি বুঝি না কী বলে
বঁধুয়ার ঘন চুলের ও-বেণী।'
'বুঝলে হাফিজ; ওটা হল মান—
এ অমানিশায় চাঁদ যে ওঠে নি!'

হে দিশারী

মদিরেক্ষণে বানালে গোলাম
রয়েছে যাদের তখ্‌ত-তাউস;
তোমার রক্তাধরের শরাবে
যারা হুঁশিয়ার তারাও বেহুঁশ।

তোমার শরম, আমার অশ্রু
গোপন কথাটি করেছে প্রকাশ;
লোকে খোঁটা দেয়: প্রেমিক-প্রেমিকা
দেখ দিকি করে রহস্য ফাঁস।

পথে যেতে যেতে যেন চোখে পড়ে
চূর্ণ কেশের ডাইনে ও বাঁয়—
মন-হুহু-করা অমন কত যে
ভক্ত তোমার দুপাশে লুটায়।

যেহেতু দৈব অনুকম্পায়
কেবলমাত্র পাপীদেরই হক,
আমরাই যাব স্বর্গে। যা ভাগ্‌—
ঈশ্বরজ্ঞানী, ধর্ম্মযাজক!

তোমার গোলাপী গালের স্তুতিতে,
জেনে রাখো, আমি একা নই মোটে;

সহস্র বুলবুল দিকে দিকে
দেখ, সেই একই গানে মেতে ওঠে।

হাত ধ'রে তুমি নিয়ে চলো, সখা
লক্ষ্মীটি, ধরো হাত হে দিশারী,
একা আমি, দেখ, পায়ে হেঁটে যাই,
সহযাত্রীরা সবাই সওয়ারী।

এইখানে, এসো, এ পানশালায়,
উপাসনালয়ে যেয়ো না কো মোটে।
কুকর্মে যারা হাত কালো করে,
তারাই ওসব জায়গায় জোটে।

হাফিজকে যেন ছাড়াতে যেয়ো না
ওর কেশজাল-বন্ধন থেকে ;
এমন টানে যে বাঁধা প'ড়ে রয়,
তার চেয়ে আর স্বাধীন আছে কে!

আতস

দেখি একদল ফেরেস্তা এসে
রাতে দরজার কড়া নেড়ে কাল
বানিয়ে ফেলল মদের গেলাস
ছেনে আদমের মাটি একতাল।

ইন্দ্রপুরীর অন্তরঙ্গ
মহলের সব স্বর্গবাসীরা
রাস্তায়-থাকা এ অভাজনকে
দিয়েছে মত্ত-করা এ মদিরা।

যখন বইতে পারে নি কো আর
আশমান তাঁর প্রেমের সে ভার—
ভাগ্যের দান ফেলে দেখা গেল,
উঠে এল নাম এই ক্ষ্যাপাটার।

শুধু একদানা গমের দরুন
গোল্লায় গেছে মাটির আদম—
আমরা যাব না? যাদের রয়েছে
শতসহস্র গোলায় অহম্।

সে নয় আতস, মোমবাতি যার
শিখার ওপর হেসে পড়ে ঢ'লে,
আসলে আতস হল সেই চিজ
পতঙ্গের যা অন্তরে জ্বলে।

বাহাত্তরটা জাতে মারপিট,
এ ভিন্ন আর আছে কী উপায়!
দেখতে পায় না কোন্‌টা সত্যি;
পুরাণ যা বলে, সেই পথ নেয়।

তাঁহারই পরম করুণায় নিই
বোঝাপড়া ক'রে আমি আর সে;
হুরীরা নমস্তস্যৈ ব'লে
নামে পেয়ালার পানীয় ধ্বংসে॥

সেই যে একদা কাব্যবধূর
কালো চুলে ঠাঁই নিয়েছে কাঁকই,
ভাবের ঘোমটা খুলে দেয় নি তো
হাফিজের মত আর কেউ কই!

এখনও হৃদয়

আকাঙ্ক্ষা থেকে সরাব না হাত
বাসনা আমার সিদ্ধ না হলে ;
হয় পাবে প্রাণ বধুর নাগাল,
নয়ত যাবে সে দেহ ছেড়ে চ'লে ।

মরলে আমার কবরটা খুঁড়ে,
দেখো তুমি, গেছে অন্তরে রয়ে
যেহেতু আগুন, কাফন আমার
রয়েছে ধোঁয়ায় ধোঁয়াকার হয়ে ।

মুখটি ফেরাও ! হায় হায় ক'রে
উঠুক দুনিয়া ; বলুক, কী সুখ ।
খোলো দুটি ঠোঁট ; তা দেখে সকল
স্ত্রীপুরুষ প্রার্থনায় বসুক ।

আমার ওষ্ঠাগত হল প্রাণ,
এখনও হৃদয় কত কী যে চায় !
ও-দুটি ঠোঁটের বাসনা গেল না,
এদিকে আত্মা দেহ ছেড়ে যায় ।

মনকে বলেছি, 'ছেড়ে চলে এসো,
কথা শোনো, কাছে যেয়ো না কো ওর ।'
মন বলে, 'তারই সাজে এই কাজ
নিজের ওপর যার আছে জোর ।'

পাকিয়ে রেখেছে কত শত দহ
তোমার চুলের প্রতিটি বলয় ;
কী ক'রে খুলবে সেসব গ্রন্থি
আমার বন্দী দীর্ণ হৃদয় !

হয়ত বা দুটি একটি ফুলেও
মিলবে তোমার মুখের আদল,
হরদম সেই আশায় আশায়
ফুলের বাগানে হাওয়ার টহল।

খাড়া হয়ে তুমি দাঁড়াও মাটিতে,
দৈর্ঘ্য এবং কৃশ কটি যাতে
এ বাগানে সরুঝাউ ও বেতস
মেলায় একই দেহে একসাথে।

আমি নই ব্যভিচারী যে নিত্য
বদ্‌লে ফেলব বন্ধুর পাট ;
যে পর্যন্ত ধড়ে প্রাণ আছে
তোমার দুয়োরে আমি চৌকাঠ।

সকলেই জানে যে মজলিশেই
কথা হয়, লোক করে গিজ গিজ—
বলবে, তা ঠিক ! তেমন প্রেমিক
একজনই আছে, সে হল হাফিজ ॥

দাও

দাও যৌবন, প্রেম, রাঙা সুরা—
ভরুক আসর সাঙ্গোপাঙ্গে ;
অন্তরঙ্গ বন্ধু মিলুক,
দাও দীয়তাং ভুজ্যতাং হে।

সাকি যেন হয় সুমিষ্টভাষী,
গায়কের হোক কণ্ঠ মধুর,

সঙ্গীরা হবে চরিত্রবান,
সুখ্যাতি যেন রটে বন্ধুর।

অমৃততুল্য দাও প্রাণবঁধু
যে স্থিতপ্রজ্ঞ, যে সতীসাধ্বী ;
রূপে যার ধারে-পাশে দাঁড়াবার
নেই কো পূর্ণচাঁদেরও সাধ্যি।

পেয়ালায় দাও হালকা মধুর
নেশায় মাতানো রসাস্বাদন
ধারালো তীব্র সেই শরাবের,
যার রং ঠিক ফুলেরই মতন।

একটুকু দেবে প্রিয়ার অধর,
একটুকু লাল মদের গেলাস—
পরম্পরায়। সেই তো স্বর্গ
যেখানে এমন প্রেমিকের বাস!

দেউল ঋষির তপোবন হোক,
বিশ্বাসী সাথী, বিনীত সেবক,
সব বলা যায় এমন বন্ধু,
যারা সতীর্থ হোক সহায়ক।

ভ্রূভঙ্গে সাকি পরম জ্ঞানের
ধরে যেন উদ্যত তলোয়ার,
জড়াতে আষ্টেপৃষ্টে হৃদয়
বঁধুয়া বিছিয়ে দিক কেশজাল।

যে এসব ছেড়ে দূরে যেতে চায়,
এ জীবনে নেই যার কোনো টান,
সে-ই পাপিষ্ঠ। এসব মায়ায়
যে বাঁধে নিজেকে, সে ধর্মপ্রাণ॥

যাবার আগে

কোথায় তোমার মিলনের ডাক ?
এ দেহ ছাড়তে আর কত কাল ?
আমি পাখি সেই ঊর্ধ্বলোকের,
চ'লে যাব কেটে ভবের এ জাল।

যদি ভালোবাসো, যদি মেনে নাও
ক্রীতদাস ব'লে আমাকে, তাহলে
দেশ ও কালের সার্বভৌম
এ রাজ্য ছেড়ে আমি যাব চ'লে।

সুরা আর সুরকার নিয়ে তুমি
বসলে আমার কবরের পাশে
তারই গন্ধে গন্ধে আসবো
নাচতে নাচতে আমি অনায়াসে।

লীলায়িত গতিভঙ্গিতে, প্রিয়া
দাঁড়াও, দেখাও মুখ সুধাভরা ;
হাত ধুয়ে ফেলে যেন যেতে পারি
ছেড়ে এ জীবন, এ বসুন্ধরা।

বুড়ো বটে, তবু একটি রাত্রি
আমাকে তোমার বুকে দিলে ঠাঁই,
দেখো, পাশে ঘুম ভেঙে উঠে ভোরে
কি রকম নবযৌবন পাই।

মৃত্যুর দিন শুধু ক্ষণকাল
আমি দেখি যদি চকিতে ও-মুখ—
হাফিজের মতো এ প্রাণ, এ লোক
ছেড়ে যেতে, আহা আমারও কী সুখ॥

মদ পুজো

চেয়ে দেখ, সাকি, রাত্রি পোহায়
দাও মদিরায় ভ'রে এ পেয়ালা
ঊর্ধ্বে সমানে দে-দৌড় দে-দৌড়,
তাড়াতাড়ি করো, বয়ে যায় বেলা।

এই নশ্বর পৃথিবী ক'দিন !
তার ধ্বংসের আগেই, দোহাই
হে সাকি, আমাকে শেষ ক'রে দিও
ফুল-রাঙা সুরা-সুরাহির ঘায়।

সুরাভাণ্ডের পুবদিকে, দেখ
নবারুণ রূপ ধরে মদিরার ;
যদি তুমি চাও পরমানন্দ
ওঠো, উঠে পড়ো ! ঘুমিয়ো না আর।

জ্যোতিশ্চক্রে আমারই মাটিতে
আশমান হাঁড়িকুড়ি দেবে গ'ড়ে ;
মাথার চাঁদির মৃন্ময় ঘট
দিও সেইদিন মদিরায় ভ'রে।

করি না কো পুজো, নই সংযমী
নেই আপসোস, নেই গোস্তাকি,
বলি না কো তোবা। মদের পেয়ালা
হাতে দিয়ে বলো স্বাগতম্, সাকি !

সুরা পান করা অতি সৎ কাজ
এই কথা মনে রেখো, হে হাফিজ
সংকল্পের মুখটা ঘোরাও
যেদিকে রয়েছে ঐ ভালো চিজ ॥

জানতেও পারে

যিনি শাহানশা শালপ্রাংশুর,
মধুকণ্ঠের ছত্রাধিপতি,
যাঁর চাহনির চাবুকের ঘায়
দীর্ণহৃদয় রথীমহারথী—

মাতোয়ারা হয়ে যেতে যেতে তিনি
সহসা দেখেন পথের ফকির
আমাকে। বলেন ডেকে, 'হে চেরাগ,
চক্ষুরত্ন সব সুভাষীর!

'সোনাচাঁদি বিনে নিঃস্ব থাকবে
কতদিন? হও আমার গোলাম।
হবে লাভবান। চাঁদের হাটেও
দেখবে, চাঁদির দেহ দেবে দাম।

'ভেবো না নিজেকে অণু থেকে অণু,
দীনস্য দীন, সবার অধম;
আকাশ ডিঙিয়ে ছুটে গিয়ে ধরো
সূর্য যেখানে একা একদম।'

মদ্যপ সেই প্রবীণ প্রাজ্ঞ
(শান্তি লভুন সেই মহাত্মা!)
বলেন, 'যে করে কথার খেলাপ
দিও না কো তাকে আদৌ পাত্তা।

'খুলো না কো গাঁটছড়া বন্ধুর,
রেখো শত্রুকে শতহস্তেন,
ঈশ্বরে সঁপে দিও প্রাণমন
লাই পায় না কো শয়তান যেন।

'রেখো না ভরসা ভবসংসারে,
মদের পেয়ালা থাকে যেন মুখে,
তন্বঙ্গী ও রতির তুল্য
ভ্রূবিলাসে কাল কেটে যাবে সুখে।'

বইছিল মৃদুমন্দ বাতাস
ভোরবেলা গজস্নুন্দীর বনে ;
আমি শুধোলাম, 'কোন্ শহীদের
খুন লেগে আছে এসব কাফনে ?'

বলেন, 'হাফিজ, তুমি আমি কেউ
ছাড়াতে পারি না এ সবের জট ;
হয়ত জানলে জানতেও পারে
লাল মদ, মধুময় রাঙা ঠোঁট ॥'

ঢের ভালো হত

ঢের ভালো হত নামাবলীটলী
বন্ধক দিয়ে কিনলে শরাব,
এসব অর্থহীন হাবিজাবি
শরাবে ডোবালে ঢের হত লাভ।

ভেবে দেখি আজ সব দিক থেকে
ব্যর্থ জীবন ঘুরে দোরে দোরে
ভালো হত পানশালার কোনায়
মদ খেয়ে যদি থাকতাম প'ড়ে।

আমার মত্ত হৃদয়ের কথা
বলব না সারা বিশ্বকে ডেকে ;

বলবার হলে বলব সে কথা
ঘোম্‌টা এবং পর্দায় ঢেকে।

ল্যাজামুড়ো আগাগোড়া কিছু নেই
এমনি যখন আকাশের হালও,
তখন মাথায় সাকি আর হাতে
শরাব—এমন চিন্তাও ভালো।

টন্‌টনে জ্ঞান না থাকে না থাক
ফকিরের, সে তো সংসারী নয় ;
বুকভরা জ্বালা, চোখভরা জল
থাকলে বরং ঢের ভালো হয়।

হাফিজ, হয়েছ বুড়ো এখন তো
পানশালা ছেড়ে যাওয়াই আদব ;
সুরাপান আর কাম-আসক্তি
কম বয়সেই মানায় ওসব ॥

ভেতরে করুণা

কাল রাতে পানশালার দুয়োরে
গিয়েছি যখন চোখে ঘুমঘোর ;
মদে ছিল ভেজা নমাজে বসার
আসন এবং গায়ের কাপড়।

আমাকে ওভাবে দেখে ছুটে এসে
মদবিক্রেতা সেই লালছেলে
বলেছে সখেদে, 'ওঠো, ভবঘুরে
মাতাল, ওঠো হে, চাও চোখ মেলে।

‘ধুলোকাদা সব আগে করো সাফ,
হাতমুখ ধোও, করো মোছামুছি—
তবেই এ পানশালায় ঢুকবে
নইলে হবে তা মলিন অশুচি।

‘মধুময় লাল ওষ্ঠাধরের
অতৃপ্ত আশাআকাঙ্ক্ষা নিয়ে
তুমি আত্মার জহরত ঢেকো
তরল পদ্মরাগমণি দিয়ে।

‘বয়েস তো হল, এ বার্ধক্যে
সংযমী হও ; টেনে ধরো রশি।
লোলচর্মের মুখে এঁটো না কো
মুখোস কখনও জোয়ানবয়সী।

‘যতই ডহর হোক এ দরিয়া
যে জানে প্রেমের গতিবিধি ঠিক,
গা তার কিছুতে জলে ভিজবে না
যত কেন গভীরেই ডুব দিক।

‘বাসনার ডোবা থেকে উঠে এলে
ধুয়েমুছে সাফ হওয়াটাই প্রথা ;
কেননা ও-জলে কাদামাটি পাঁক
দেবে না তোমাকে শুচিশুদ্ধতা।’

আমি বললাম, ‘হে বিশ্বপ্রাণ,
বসন্তে যদি কুসুমের থলো
টাটকা মধুতে হয় নিষিক্ত—
বলো, তাতে তার কোন্ দোষ হল ?’

শুনে সে কী রাগ! বলল, 'হাফিজ,
তর্ক করছ? খুব যে স্পর্ধা!
যাও, কেটে পড়ো।'—ভেতরে করুণা,
দুয়োরে ঝোলানো ক্রোধের পর্দা ॥

জ্যোতিশ্চক্রে

ভোরবেলা গিয়ে গোলাপের বনে
মনে হল, তোলা যাক কিছু ফুল;
এমন সময় কোথা থেকে যেন
এসে ডেকে ওঠে এক বুলবুল।

তারও দেখি ঠিক আমারই মতন
একটি ফুলের সঙ্গে প্রণয়;
আমার মতন তারও বুকে জ্বালা,
তার হাহাকার সারা বনময়।

একবার আসি একবার যাই
পায়চারি করি ফুলবাগিচায়;
বুলবুল আর গোলাপের কথা
মাথায় কেবলি ঘুরপাক খায়।

বনময় তার সেই হাহাকার
ছেয়ে ফেলে মন এমন বিষাদে!
নিজেকে তখন কিছুতেই ধ'রে
রাখতে পারি না, খালি প্রাণ কাঁদে।

পাঁপড়ি মেলেছে এত যে গোলাপ
বাগানের এত অসংখ্য গাছে,

যখনি যে কেউ তুলেছে সে ফুল
হাতে তার ঠিক কাঁটা ফুটে গেছে।

যেখানে গোলাপ সেখানেই কাঁটা,
বুলবুল আর প্রেম একই ধারা ;
কী গোলাপ আর বুলবুল কিবা
থাকে না একটি অন্যটি ছাড়া।

হে হাফিজ, তুমি জ্যোতিশ্চক্রে
আশা ক'রো না কো সুখ অদৃষ্টে ;
ইষ্ট কিছুই পাবে না সেখানে,
ঝুলি তার ভরা শুধু অনিষ্টে॥

আত্মা যেখানে

গুহাবাসী এক সাধক এলেন
কাল রাত্তিরে পান্থশালায় ;
ভেঙে ফেললেন ব্রহ্মচর্য
টান মেরে তিনি ভরপেয়ালায়।

সহসা স্বপ্নে দেখা মিলে যায়
যৌবনের সে প্রাণ-বঁধুয়ার
ফলে, সে বৃদ্ধ হাবুডুবু খায়,
হয় তারই প্রেমে পাগল আবার।

বুদ্ধি-ব্রহ্মচর্যাপহারী
লালছেলে সেই পথ দিয়ে যায় ;
তাকে দেখে চেনা অচেনা সবাই
ছুটে ছুটে এসে পড়ে তার পায়।

হায়, গোলাপের গালের আতসে
খাক হয় বুলবুলের মরাই ;
হেসে-ঢ'লে-পড়া দীপের শিখা যে
পতঙ্গদের কপাল পোড়ায়।

সভায় যে সুফী মদের পেয়ালা
ভেঙে বাধিয়েছে দক্ষযজ্ঞ ;
রাতে একফোঁটা পেটে পড়তেই
কী সদাশিব সে, কী স্থিতপ্রজ্ঞ !

আমি দেখি যেন বিড় বিড় ক'রে
মন্ত্র পড়ছে সাকির নেত্র ;
পানপাত্রের গতিচ্ছন্দ
সেই তো আমার ধ্যানের ক্ষেত্র।

আত্মা যেখানে ব্রহ্মে বিলীন
হাফিজ সে কৈবল্যই চায় ;
হৃদয় গিয়েছে দরদীর কাছে,
বঁধুয়ার কাছে প্রাণ চলে যায় ॥

যা পেয়েছি

বুড়ো মাজি-র সে পান্থশালায়
স্বর্গীয় আলো দেখি চোখ মেলে ;
কী আশ্চর্য, এমন যে আলো—
তাও দেখ, শেষে কোথা গিয়ে মেলে !

শোনো, ওহে বড়কর্তা হজের,
কী তোমার অত বাক্‌ফাট্টাই !

তুমি দেখ শুধু পাথরের থান,
আমার চোখে যে স্বয়ং খোদা-ই।

প্রেয়সীর কালো কেশের গুচ্ছে
যতই খুঁজি না কেন মৃগনাভি,
জানি তো সে অতি দূরের ভাবনা—
মেটবার নয় আমার সে দাবি।

অন্তর্দাহ, অশ্রুর ধারা,
ভোরের বিষাদ, বিলাপ রাতের—
এসব কিছুরই উৎসে তোমার
করুণা রয়েছে, পেয়েছি তা টের।

তোমার মুখের ছবি অবিরাম
ফোটাচ্ছি আমি আপন খেয়ালে ;
কাকে ডেকে বলি কী দেখছি আমি
এই অবগুণ্ঠনের আড়ালে।

খোটানের কস্তুরীতে কিংবা
চৈনিক মৃগনাভিতে কে পায়
সন্ধান সেই অতুলনীয়ের—
যা পেয়েছি আমি ভোরের হাওয়ায় !

হাফিজের চোখ বামাচারী ব'লে
দিও না, বন্ধু, অপবাদ তাকে ;
আমি জানি, তার প্রেমিক হৃদয়
সবার মধ্যে ঈশ্বর দেখে ॥

সাদা আর কালো

দেখ, কালো মণি সাদা হয়ে গেল
চোখে অশ্রুর এমনই জোয়ার ;
বলো, তুমি মুখ ফিরিয়ে থাকবে
হে প্রাণবঁধুয়া, কতদিন আর ?

আমরা দুজনে দুজনকে, এসো,
বাহু দিয়ে বাঁধি, সরে এসো কাছে ;
পুরনো স্মৃতির ভার বওয়া মিছে,
অতীত তুলো না ; যা গেছে তা গেছে।

ওর ওই আঁখিপক্ষ্মে, হে খোদা,
দেখ, দেওয়া আছে কী তীক্ষ্ণ ধার !
ও কেটেছে ছলাকলার কাঁচিতে
সংযমের এ জামাটা আমার।

গৌরী মুখের, কালো চিকুরের
যে ছায়া এ আঁখিদর্পণে ফেলো,
তাতেই আমার নয়নের পটে
দুটি রং ফোটে : সাদা আর কালো।

হে হাফিজ, বড় একটা আসে না
গজলের গীতে 'জ'-বর্ণে মিল ;
আশা করি, তুমি একদিন ঠিক
পাবে মেলাবার সে দরাজ দিল্॥

যুগলবন্দী

শুধাই, 'তোমার ওষ্ঠ ও মুখ
পুরাবে আমার কামনা কখন ?'
বলে, 'জেনো, ওরা করবে তামিল
যাই ফরমাক তোমার নয়ন।'

আমি বলি, 'দেখ, তোমার অধর
নজরানা চায় মিশর মুলুক।'
সে বলে, 'তা হোক, এই মামলায়
লোকসান কারো নেই এতটুক।'

শুধোলাম, ঠিক কোন্ পথে গেলে
তোমার মুখের পেয়ে যাব খেই ?'
সে বলে, 'যে জানে সব রহস্য
জিগ্যেস করো বরং তাকেই।'

বলি, 'ক'রো না কো বিগ্রহ-পুজো,
ধ'রে ব'সে থাকো খোদাতাল্লাকে।'
সে বলে, 'প্রেমের পন্থা যে নেয়
এটা আর ওটা দুটোই সে রাখে।'

আমি বলি, 'পানশালার টানেই
মেটে যত জ্বালা আছে অন্তরে।'
সে বলে, 'ভাগ্যবান তো তারাই
যারা দিল্ খুশিখোশালিতে ভরে।

আমি বলি, 'নামাবলী ও শরাব
ধর্মে চলে না দুটো একসাথে।'
সে বলে, 'অব্যাহত আছে আজও
এসব মাজি-র ব্রতচর্যাতে।'

শুধাই, 'তোমার মিঠে লাল ঠোঁটে
বুড়োদের আছে ফায়দা বা কোন্?'
সে বলে, 'জেনো হে, মধুর চুমোয়
বুড়োরাও ফিরে পায় যৌবন।'

শুধাই, 'রাজন্, কোন্ শুভক্ষণ
বধূর বাসরে পদার্পণের?'
উত্তর মেলে, 'শুক্লচাঁদনীর
যোগে যাওয়াটাই প্রশস্ত ঢের।'

বলেছি, 'তোমার দৌলতে দোয়া
চাইছে হাফিজ ধ্যানে অবিরত।'
সে বলে, 'সপ্তস্বর্গে নিয়েছে
ফেরেস্তারাও সেই একই ব্রত॥'

বাংলায়

শোনো সাকি, বলি তাদের গল্প
সরুঝাউ, গজসুন্দী, গোলাপ—
স্নান করানোর তিন মেয়ে; চলে
তাদের সঙ্গে এ নিয়ে আলাপ:

গোষ্ঠের নববধূটির রূপ
ফেটে পড়ে, দেখ! ঢালো সুধারস।
জেনে রেখো, এই জমানায় বেশ
কাজে লাগে ঘটকের হাতযশ।

ভারতবর্ষে আছে যত তোতা
সবাই মধুর রসের রসিক,

কেননা চালান যায় বাংলায়
যে মিষ্টান্ন সব পারসিক।

শাহানশাহের বাগানটা থেকে
ফুরফুরে হাওয়া এসে লঘুচালে
গজসুন্দীর ফুলের পাত্রে
শিশিরের মদ হরদম ঢালে।

জাদুঅলা চোখজোড়ার পেছনে
সার বেঁধে ভোজবাজির কাফেলা;
পূজারীকে পথ ভোলাতেও পারে
দু আঁখির ভানুমতীর সে খেলা।

কী ঘর্মাক্ত কলেবর সে যে,
লাজে রাঙা মুখ সুন্দরী ব'লে;
বিন্দু বিন্দু শিশিরের স্বেদ
লেগে আছে মল্লিকার কপোলে।

এ দুনিয়া যেন বাহারচালিতে,
দেখো, তোমাকে না ভেড়ুয়া বানায়;
মিটমিটে বুড়ি ডাইনীটা ব'সে
কাল কাটাচ্ছে টালবাহানায়।

হ'য়ো না কো সেই সামৃরীর মত
গর্দভ থেকে স্বর্ণ যে দেয়
মুশার অমন আশ্রয় ছেড়ে
শরণ নেয় যে বাছুরের পায়।

হায়, সুলতান গিয়াসুদ্দিন!
হাফিজ, তোমার বড় অভিলাষ
তাঁর দরবার। নীরব থেকো না;
কান্নাই জেনো মেটাবে সে আশ॥

ফুটলে গোলাপ

বাগানে গোলাপ উঠে এল আজ
নামরূপ থেকে প্রপঞ্চলোকে ;
দেখ, বনফ্‌সা প্রার্থনা করে
গোলাপের কাছে নতমস্তকে।

ঢোলের আওয়াজে তবলার তালে
ভোরের মদিরা ঢেলে নাও মুখে
বাঁশী ও বীণের স্বরসপ্তকে
আঁকো চুম্বন সাকির চিবুকে।

বাগানে আবার ঢেলে সেজে দাও
জরথুস্ত্রের সাবেকী কানুন ;
চেয়ে দেখ, গজস্থন্দী এখন
জ্বালিয়েছে নামরুদের আগুন।

মনের মানুষ যিনি, আছে যাঁর
রুপোলী কপোল খ্রীস্টের প্রাণ—
আদ্‌সমুদ্‌কে ভুলে বেমালুম,
তাঁর হাত থেকে সুরা করো পান।

এ ভূলোক হয় স্বর্গের মত
ফুটলে গোলাপ, ফোটে যদি যুঁই ;
কিন্তু এ সবে কোন্‌ লাভ, যদি
অবিনশ্বর না হয় কিছুই ?

আকাশের রূপ ধরেছে কুঞ্জ
দেখ, রাশি রাশি ফুলের স্তবকে !
ফুটেছে কী সৌভাগ্যের যোগ
বিছানো সে রাশিচক্রের ছকে।

ফুল হয় যেই হাওয়ার সওয়ার
নিজেকে ভাবে সে রাজা স্থলেমান ;
দাউদের সাধা স্থরেলা গলায়
ভোরবেলা পাখি গেয়ে ওঠে গান।

ফুটলে গোলাপ থেকো না কো একা
মদিরা, বঁধুয়া, তবলা জোটাও ;
আমাদেরই পরমায়ুর মতন
জেনো, গোনাগাঁথা সপ্তাহটাও।

আসিফের সেই কালের স্মরণে
কানায় কানায় মদ ভ'রে আনো ;
উজির সে স্থলেমানের আমলে
ইমাতুদ্দিন মেহবুব যেন।

হাফিজের এই মজলিশটির
রয়েছে যেসব বস্তুর থাঁই,
হয়ত সেসব মিলে যেতে পারে
রাজানুকূল্য যদি পাওয়া যায় ॥

স্থখের সময়

চঞ্চুতে ধ'রে ছিল বুলবুল
ফুলের পাঁপ্ড়ি খাসা রংদার ;
গানে আর পাঁপ্ড়ির নিঃস্বনে
ফুটে উঠেছিল তার হাহাকার।

দেখা হতে আমি শুধোলাম তাকে,
'কেন কাঁদো ? কেন করো হায়-হায় ?'

সে বলে 'প্রিয়ার সৌন্দর্যই
ফেলেছে আমাকে আজ এ দশায়।'

সখা যদি পাশে বসতে না চায়
কার কাছে আমি জানাব আর্তি ?
কৃতকৃতার্থ বাদ্‌শা রাখেন
দূরে দূরে তাকে যে তাঁর প্রার্থী।

নাস্তির ভবসংসারপথে
ঘুরে-বেড়ানো সে প্রাজ্ঞ মানুষ
দেখেশুনে এই রহস্যলোক
হয়ে যান তার নেশায় বেহুঁশ।

প্রিয়ার রূপের কাছে দাম নেই
যত করি অনুনয় ও বিনয় ;
অহংকারী যে, করে যে ঠেকার
সে পয়মন্ত, সেই সুখী হয়।

এসো হে ছড়াই ছিটাই জীবন
সেই পটুয়ার তুলির আগায়,
যিনি তাঁর এই আজব নক্সা
ধ'রে দেন দিগ্‌দর্শী চাকায়।

বদ্‌নাম হলে পিছিয়ো না ভয়ে
যদি হও প্রেমপথের সাধক ;
শেখ সান্নার নামাবলীটাও
শরাবখানায় ছিল বন্ধক।

সেটা ছিল ভারি সুখের সময়
ফকির যখন যেতেন সফরে

দেখা যেত তাঁর যজ্ঞসূত্রে
তখনও হাতের জপমালা ঘোরে।

বয় হাফিজের নয়নের জল
সে অপ্সরার ছাদের তলায়,
যেন নন্দনকাননের নিচে
ফল্গুর জলধারা বয়ে যায়॥

শিরাজ

বাস্তুকর্মে তুলনারহিত
আমার শিরাজ কী যে রূপময়
ঈশ্বর, দেখো এ শহর যেন
কোনোদিন বিধ্বস্ত না হয়।

মিনতি আমার, এ রুক্‌নাবাদ
নদী যেন থাকে নিয়ত বজায়
যেন খিজিরের মত পরমায়ু
এর নির্মল জলে লোকে পায়।

একদিকে আছে মুসল্লা এই
ওদিকে জাফরাবাদ কোন্ সেই—
ব'য়ে নিয়ে যায় উত্তুরে হাওয়া
আবিরগুলাল দু' জায়গাতেই।

এসো হে শিরাজে, দীক্ষিত হও
জ্ঞানীগুণীদের এ পীঠস্থানে
(দেবদূত জিবরাইলের মত)
মুখনিঃসৃত স্বর্গীয় জ্ঞানে।

মিশরের সেই মিছ্‌রির নাম
মুখেও নেয় না লোকে ভয় পেয়ে—
পাছে লজ্জায় মাথা কাটা যায়
শহরে সে সব যা মিষ্টি মেয়ে!

ও পুবালী হাওয়া! সেই যাযাবরী
যে বিবাগী, মাতোয়ারা সুধারসে—
তার কাছ থেকে তুমি এলে। বলো,
কী খবর তার? ভালো আছে তো সে!

মিনতি জানাই, আমার এ ঘুম
ভাঙিয়ো না, ডেকে তুলো না, দোহাই;
বঁধুয়ার চিন্তায় ডুবে গিয়ে
অন্তরে আমি মহাসুখ পাই।

ঝরালে আমার খুন লালছেলে
হে হৃদয়, তাও ধর্মাচরণ
ব'লে মেনে নিও; যেমন ন্যায্য
মাতৃস্তন্যে দুগ্ধক্ষরণ।

ও হাফিজ, যদি সত্যিই হও
বিচ্ছেদভয়ে এতই কাতর,
মিলনের ক্ষণে কেন থাকল না
কৃতজ্ঞতার কোনো স্বাক্ষর?

নামরূপ থেকে প্রপঞ্চরূপে

সরু ঝাউটার মগডালে ব'সে
গোলাপের উদ্দেশে পুনরায়
সর্বংসহা বুলবুল গায় :
'দূর হোক তার সকল বালাই !'

'গোলাপ, তোমার মনের মতন
হয়েছে যখন রূপ খোলতাই—
প্রেমোন্মত্ত এ বুলবুলকে
ক'রো না কো যেন আর দূরছাই।'

কারো কাছে করি না কো অনুযোগ
নজরে যখন পড়ে না ও-মুখ ;
জেনো, নামরূপ আছে ব'লেই তো
প্রপঞ্চরূপে দেখে এত সুখ।

লোকে যদি দিন কাটাত আরামে,
জীবনটা হত সুখশান্তির,
প্রিয়ের দুঃখকষ্টও তবে
হত দৌলত মধুর, মদির।

ইন্দ্রপুরী ও স্বর্গের পরী
সাধুদের থাক। আমি মনে করি
শরাবখানাই সে অমরাবতী ;
সাঙাতেরা অপ্সরা-অপ্সরী।

পেয়ালা ওঠাও ঢোলকের তালে ;
ক'রো না আদৌ মেজাজ খারাপ ;
কেউ যদি বলে, 'খেয়ো না শরাব'—
বলবে, 'খোদার কাছে সব মাপ।'

বিচ্ছেদে বুক ফেটে যায় ব'লে,
হাফিজ, চোখের জল কেন ফেলো ?
বিরহে নিহিত রয়েছে মিলন,
কালো পর্দাটা সরালেই আলো ॥

শরাবখানায়

শরাবখানায় কাল একজন
এককোণ থেকে হুঙ্কার দেন :
'যার যত পাপ হয়ে যাবে মাপ
পেয়ালা ওঠাও, সুরা করো পান ।'

কাজ ক'রে যায় আপন গরজে
খোদার অঢেল সেই রহমত—
এই সুখবর এসে পৌঁছুল
স্বয়ং ফেরেস্তার মারফত ।

অপরিপক্ক কাঁচা মাথাটাকে
ঠেলে নিয়ে চলো শরাবখানায়
লাল মদ যাতে গন্‌গনে আঁচে
রক্তে রসের ভিয়েন বানায় ।

পাবে না কো তুমি তার সাক্ষাৎ
পা বাড়াও যদি বীরবিক্রমে ;
হৃদয়, তবুও থেকো না কো ব'সে
সাধ্যমতন লাগো পুরোদমে ।

আমার পাপের চেয়ে ঢের বড়
খোদার সে ক্ষমাসুন্দর রূপ ।

কেন ফাঁস করো সে গুপ্তকথা ?
মুখে ছিপি আঁটো ; একদম চুপ।

একবার দেখ আমার এ কান
আর সে চূর্ণ অলক সখার ;
একবার দেখ আমার এ মুখ,
ধুলোমাখা ঐ শুঁড়ীর দুয়ার।

গর্হিত কোনো অপরাধ নয়
হাফিজ, তোমার এই সুরাপান ;
বাদ্‌শার বড় দয়ার শরীর
সমস্ত দোষ তিনি ঢেকে দেন॥

ফুল ব'লে দেয়

গোলাপকুঞ্জে ফুলের গন্ধে
আমিও গেলাম রাত্রিপ্রভাতে
প্রেমার্ত বুলবুলের মতন
পারি যাতে আমি হৃদয় জুড়াতে।

চেয়ে দেখি লাল একটি গোলাপ
চোখেমুখে তার কী রক্তরাগ।
কৃষ্ণপক্ষ রাতের আঁধারে
কেউ যেন জ্বেলে দিয়েছে চেরাগ।

একটাই তার উদাসীনতা যে,
হাজার রকম ছলছুতো ক'রে
রূপ আর যৌবনের গর্বে
বুলবুলকেও আনে না নজরে।

চেয়ে চেয়ে যার জলভরা চোখ
ও হে, স্থন্দরী নারগিস্ ওটা ;
গজস্থন্দরী দীর্ণ হৃদয়ে
দেখ, লেগে আছে রক্তের ফোঁটা ।

ধারালো ফলার লকলকে জিভে
স্থলপদ্মের গাছ ধমকায় ;
হাঁ-সর্বস্ব লট্কন্ দেখ
ঘুরে ফিরে খালি মুখনাড়া দেয় ।

কারো হাতে ছিল আস্ত স্থরাহি
বেহেড মাতাল একেবারে তারা
কারো বা হাতের চেটোয় পেয়ালা
সাকির মতই তারা মাতোয়ারা ।

যৌবন দেয়, নাও উপহার
মধুমাস—নেয় ফুল যে রকম ;
রস্থল কেবল বার্তাবাহক ;
পৌঁছিয়ে তাঁর কাজটি খতম ॥

আশাভরসা

আমার হাজারো দুশমন যদি
আঁটে মতলব আমাকে মারার,
আমি একটুও ভয় করব না
যদি কাছে থাকো, বন্ধু আমার

মিলবেই সান্নিধ্য তোমার—
বাঁচায় আমাকে এই আশ্বাস ;

তুমি কাছে নেই অহরহ তাই
দেখাচ্ছে ভয় সমূহবিনাশ।

হাওয়া যদি ঘ্রাণে পৌঁছে না দেয়
প্রতি নিশ্বাসে তোমার সুবাস,
তবে আশাহত গোলাপের মত
ছিঁড়ে ফেলে দেব সব বেশবাস।

হবে দুঃখের, তোমার চিন্তা
ছেড়ে দিয়ে যদি দুচোখ ঘুমোয় ;
এও ভালো নয়, তোমার বিরহে
যদি নিশ্চুপ থাকে এ হৃদয়।

তুমি কাটো-ছেঁড়ো সেও ঢের ভালো
চাই না অন্য কারুর দাওয়াই ;
তুমি বিষ দিলে আপত্তি নেই
নেব না অন্যে যদি সুধা দেয়।

যথাযথভাবে তোমার স্বরূপ
কার দৃষ্টিতে ধরা ঠিক পড়ে ?
কার কী নজর তারই ওপর
কে কী দেখে সেটা নির্ভর করে।

তলোয়ার দিয়ে কেটে ফেললেও
টানব না আমি রাশ কিছুতেই ;
নিতে পারো তুমি গর্দান, তবু
হাতটা থাকবে জিনের ফিতেয়।

হে হাফিজ, ঝনৃকাঠের ধুলোয়
নত হয়ে তুমি মাথা পেতে দিও ;
দেখবে তাহলে বিশ্বের চোখে
তুমি হয়ে গেছ সকলের প্রিয়॥

মনে কি পড়ে

আজও মনে পড়ে সেইসব দিন।
এসেছি যে একে অন্যের কাছে
বন্ধুত্বের টানে বাঁধা প'ড়ে—
সেসব দিন কি আজও মনে আছে?

ব্যথাবেদনার জরোজরো বিষে
ট'কে গেছে আজ সমস্ত দাঁত;
মনে পড়ে কেটেছিল কী মধুর
মাতালের কলগুঞ্জনে রাত?

যদি এও হয়, বন্ধুরা সব
এতদিনে ভুলে গিয়েছে আমায়;
আমি কিছুতেই পারি না ভুলতে
সহস্র স্মৃতি মনে প'ড়ে যায়।

দুর্ভাগ্যের শৃঙ্খলে বেঁধে
নিয়তি যতই করুক ভ্রূকুটি;
ভুলি না সেসব বন্ধুর হাত
ছুটে এসে যারা ধরেছিল মুঠি।

শত শত নদীনালা বহালেও
আমার অশ্রুময় দু'নয়ন,
মনে পড়ে যেন জিন্দারবাদ
আর তার সংলগ্ন কানন।

সে আলুলায়িত চূর্ণ অলক,
গোলাপের রঙে রাঙানো কপোল—
সেই দিন, সেই রাতের স্মৃতিকে
কেবলি বলছি দে দোল, দে দোল।

এই জমানায় কাউকে পাবে না
রাখা যায় যার ওপর আস্থা,
বন্ধু এবং বিশ্বাসীদের
পাওয়া যায় নিলে স্মৃতির রাস্তা।

কেউ কোনো খোঁজখবরও নেয় না
আজ ব্যথা সই একা মুখ বুঁজে;
একদিন ছিল, হাত বাড়ালেই
বিপদে বন্ধু পাওয়া যেত খুঁজে।

হাফিজের পর তার গূঢ় কথা
ফাঁস না করাই ভালো অবশ্য;
বার বার এনো স্মরণে তাঁদের
যাঁরা জানতেন সেই রহস্য ॥

সুসমাচার

সুখবর শোনো। হৃদয় আমার!
এসে গেছে এক খ্রীস্টের প্রাণ।
হাওয়ায় হাওয়ায় তার নিশ্বাসে
নাকে ভেসে আসে কী যে সুঘ্রাণ!

কেঁদো না ব্যথায়; ক'রো না নালিশ!
মিনতি জানালে যাঁর সাড়া মেলে
তিনি আসছেন: এটা জানা গেল
কাল ভাগ্যের ছকে দান ফেলে।

খ্রীস্টের প্রাণ—প্রাণ বলতে নিশ্বাস, যীশু ফুঁ দিয়ে অসুখ সারাতেন (ঝাড়ফুঁক?)। খ্রীস্টের মত আরোগ্যকারী।

য়েমনের দুনে দেখি যে আতস
সে সুখ নয় তো আমার একারই,
স্বয়ং মুশাও অগ্নিকণার
খোঁজে সেইখানে দিয়েছেন পাড়ি।

যারাই তোমার পথ বেছে নেয়
ইচ্ছেটা থাকে কাজ গোছাবার ;
আসতে তো কই দেখি না কাউকে,
বলতে গেলে, যে নয় উমেদার।

কিছুই জানি না কোথায় লক্ষ্য
জানি না পথের শেষ কোন্‌খানে ;
দূরাগত এক ঘণ্টার ধ্বনি
তবু অবিরাম ভেসে আসে কানে।

পানীয় কই হে ! পান্থশালায়
বিশ্বাসী সব বন্ধুরা ব'সে ;
এইখানে তারা আসে প্রত্যেকে
নিয়ে অভিলাষ যে যার মানসে।

বাগানের, আহা, সেই বুলবুল !
প্রশ্ন ক'রো না, 'কী খবর তার'—
এখানে বসেই শুনতে পাচ্ছি
খাঁচায় বন্দী তার চিৎকার।

হাফিজের দিল্ শিকার করাটা
বঁধুয়ার কাছে কিছুই তো নয় ;
জেনো বন্ধুরা,"মাছিকে শা-বাজ
খাবায় পুরবে যেকোনো সময় ॥

দুন—উপত্যকা। মুশা—বাইবেলের মোজেজ। পাহাড়ের ওপর আগুন পেয়েছিলেন।

ধৈর্য, কেবল ধৈর্য

ঐ দিল্‌খুশ ঠোঁট ছুটি থেকে
নিয়ত পরম সুখ আমি পাই ;
খোদার মেহেরবানিতে আমার
অপূর্ণ নেই কোনো বাসনাই।

পরুষ ভাগ্য, প্রিয়াকে সজোরে
বাহুডোরে বাঁধো ; কখনও চুমুক
দাও পেয়ালায়, কখনও প্রিয়ার
দিল্‌খুশ ঠোঁটে রাখো তুমি মুখ।

যত গোমুখ্যু বৃদ্ধ স্থবির
ভ্রষ্টাচারী যে মোল্লা ও শেখ
আমার মদ্যপান নিয়ে ওরা
বানাল আষাঢ়ে গল্প অনেক।

ঋষিদের মুখনিঃসৃত বাণী
জেনে গেছি আজ ওসব ফক্কা,
সাধুসন্তের হাত থেকে যেন
আল্লা আমাকে করেন রক্ষা।

হে প্রিয়া, তোমাকে কী ক'রে বোঝাই
তোমার বিরহে হৃদয়ে কী জ্বালা ;
শতধারে চোখে জল, শত বার
শুধু জ্বলন্ত নিশ্বাস ফেলা।

সরুঝাউ তার তনুর আকারে,
চন্দ্রিমা তার ফুটফুটে গালে,
যে ব্যথা জাগায় হৃদয়ে যেন তা
থাকে কাফেরের চোখের আড়ালে।

থাকলে প্রিয়ার প্রতীক্ষাগুণ
সবচেয়ে শ্রেয় সেই মাধুর্য।
মনে মনে তুমি দোয়া আওড়াও :
হে খোদা, ধৈর্য ! হে খোদা, ধৈর্য !

যে পথে গলায় ঝোলে উপবীত
বুঝো সেটা ভণ্ডামির মলাট ;
স্থফীর ধর্মে, চলে না ওসব,
নেই কো আচারবিচারের পাট।

তোমার ও-মুখ দেখার বাসনা
হাফিজের ভ'রে দিয়েছে চিত্ত ;
ফলে, সে ভুলেছে রাতের দরূদ,
শাস্ত্রীয় সব প্রাতঃকৃত্য ॥

মার্জনা ক'রো

যদি অগোছালো তোমার ও-চুল
বাতাসের হাতে পড়ে একবার,
তাহলে যেখানে আছে যত দিল্
নিখিল শূন্যে হবে ছারখার।

প্রতীক্ষার যে নৌকো আমার
ভাসিয়ে দিয়েছি ব্যথার সাগরে,
দেখা যাক শেষকালে সে তক্তা
কোন্‌খানে ঠেলে নিয়ে যায় ঝড়ে।

তার মুখ চেয়ে যতটা যে পারে
ভাগ্যের দান ফেলে প্রত্যেকে ;

দেখা যাক, কার হাতের ঘুঁটিটা
কোন্ ঘরে পড়ে ; কে হারে, জেতে কে !

হৃদয়কে করে মুক্ত যে মদ
ছিঁড়ে দুঃখের বন্ধনজাল,
আসে যেই পালা আমার নেবার
দেখি সে বুকের খুনে লালে লাল।

চৈনিক মৃগনাভির সঙ্গে
মেলে বঁধুয়ার ঘনকালো চুল—
ব'লে থাকি যদি, মার্জনা ক'রো,
হয়ে গেছে মুখ ফস্‌কে ও-ভুল।

বিরহব্যথার হাতে হাফিজের
হৃদয়ের হাল খুব শোচনীয়,
সে হয়ে গিয়েছে আস্ত পাগল—
যা হয় প্রিয়ার বিচ্ছেদে প্রিয় ॥

আজব

তোমারই প্রেমের রূপ ধ'রে আছে
দেখ হে, আজবলীলার গাছটা ;
তোমার নির্বিকল্পে ফুটেছে
আজবলীলার কী পরাকাষ্ঠা।

নির্বিকল্পদশার অন্তে
দিয়েছিল ডুব যারা সমাধিতে,
আজবলীলার রসের সাগরে
ম'জে গিয়েছিল তারাও আদিতে।

আজবলীলার ধ্যানজ্ঞান যদি
একবার সেইখানে দেখা দেয়,
তাহলে নির্বিকল্প কিংবা
প্রেমিক প্রেমিকা পাবে না কো ঠাঁই।

যেদিকেই কান পাতি, শোনা যায়
আজবলীলার ব্যাপার-স্যাপার,
দেখাও এমন হৃদয়ের মুখ
যাতে নেই তিল আজবলীলার।

আজবলীলার জেল্লাজলুস
এসে দেখা দিল যে জায়গাটায়,
শ্রদ্ধাজনিত মানইজ্জত
জেনো, সেইখানে পেয়েছিল ঠাঁই।

হাফিজের গোটা অস্তিত্বই
আদ্যোপান্ত আপনাতে মেলে
প্রেমের মানসমুকুল ফোটানো
আজবলীলার ডালে আবডালে॥

প্রেমের ভাষা

হে পয়মন্ত সকালের হাওয়া,
ঠিকানা তো জানো, জানো রাস্তাও
খবর আমার পৌঁছিয়ে দাও
কী চাই বলছে তুমি জানো তাও।

তুমি রাজদূত, তোমার আশায়
চেয়ে আছি আমি দু'নয়ন মেলে ;

তুমি সবি জানো, আমার বার্তা
পৌঁছুনো যায় কোন্ পথে গেলে।

তাকে ব'লো, 'আমি এত কাহিল যে
আত্মা আমার হাত থেকে খসে ;
দয়া ক'রে দাও সে পদ্মরাগ
ফিরে পাবো প্রাণ যার সুধারসে।

'কথা দুটো আমি লিখেছি যেভাবে
তাতে আর কেউ পাবে না কো টের ;
তুমিও এমন ক'রে প'ড়ো যাতে
হয় শুধু বোধগম্য নিজের।

'তোমার অসির চিন্তাসূত্রে
জল ও তৃষ্ণা—এই আখ্যান ;
করেছ বন্দী প্রেমে, তুমি নাও
যেভাবে ইচ্ছে আমার এ প্রাণ।

'তোমার অমন স্বর্ণমেখলা
মেটাবে আমার, বলো, কোন্ আশা ?
তুমি জানো, তার অন্তর্গত
কোন্‌খানে বাঁধে রহস্য বাসা।'

ও হাফিজ, জেনো এই মামলায়
তুর্কি ও আরবিতে ভেদ নেই ;
তুমি ব'লে যাও প্রেমের গল্প
তোমার জানিত হর জবানেই ॥

আপ্তগরজী

ও তুমি আপ্তগরজী, শোনো হে,
সর্বক্ষণ কী অত ঠেকার ?
ভালবাসা যদি না থাকে তোমার
দুনিয়ায় হবে সহায় কে আর ?

যেসব মানুষ প্রেমোন্মত্ত
ঘুরে বেড়িয়ো না তাদের মহলে,
তোমাকে সবাই এক ডাকে চেনে
যারা বুদ্ধির পথ ধ'রে চলে।

ওহে, তোমার ও ঘটে এতটুকু
নেই কো প্রেমের সে উন্মাদনা ;
যত ছাইপাঁশ, থাকার মধ্যে
দ্রাক্ষাসবের বেলেল্লাপনা।

পাণ্ডুর মুখমণ্ডল আর
ভারাক্রান্ত সে দীর্ঘশ্বাস
প্রেয়সী ও প্রাণসখার আর্তি
চোখের সামনে করেছে প্রকাশ।

হাফিজ, মোটেই পরোয়া ক'রো না
হোক খুব খ্যাতি, হোক পায়া ভারী ;
চেয়ে নাও এক পাত্র শরাব,
সাফ হবে মাথা, ভাঙবে খোঁয়ারি ॥

মাতাল

আমার ওপর কেন যে তোমার
অত রাগ, কেন অভিমান অত !
কতকালের যে এই সহবত
তারও তো রয়েছে দাবি ন্যায্যত।

আমার কথায় কান দাও, শোনো,
তোমাকে দিচ্ছি উপদেশ এই—
জেনে রেখে দিও, এর চেয়ে দামী
মুক্তো তোমার কোষাগারে নেই।

আকাশের চাঁদসূর্যের কাছে
তোমার ও-মুখ ঠিক দর্পণ ;
ম'দোমাতালেরা, বলো, কোন্‌দিন
তোমার মুখের পাবে দর্শন !

মাতালকে মিছে দিও নাকো গাল,
মুখ সাম্‌লে হে, শেখ, হুঁশিয়ার !
কারণ, তাহলে হবে অধর্ম,
লঙ্ঘিত হবে বিধান খোদার।

আমার দীর্ঘশ্বাসের আতসে
এতটুকু ভয়তরাসে তুমি না ;
যে আলখাল্লা জড়িয়েছ গায়,
আমি ঠিক জানি, সেটা পশমিনা।

দোহাই তোমার, শোনো প্রার্থনা
বেচারা এ হতভাগা মাতালের—
কাল রাতে বেঁচেছিল যে শরাব
অধমকে দিয়ে টানো তার জের।

হাফিজ, তোমার বুকের মধ্যে
যে কোরাণ আছে, তুলে নিয়ে হাতে
বলছি সত্য : তোমার যে গান
তার জুড়ি আর নেই দুনিয়াতে ॥

জীবনের ধাঁধা

ভোরে উঠে দেখি বেজায় খোঁয়ারি,
গিলেছি প্রচুর কালকে রাত্রে ;
তাই বাঁশি আর ঢোলকের তালে
চুমুক দিচ্ছি মদের পাত্রে।

সমানে চালাই ধারালো তীক্ষ্ণ
অঙ্কুশ আমি বুদ্ধির ঘটে,
অস্তিত্বের এ নগর ছেড়ে
যুক্তিতর্ক যাতে দূর হটে।

দেখাল যা সব রংঢং সেই
সুরাপসারিণী প্রেয়সী আমার,
দুনিয়া এখন চোখে ধুলো দিয়ে
বিপদে ফেলতে পারবে না আর।

ধনুকের মত বাঁকা ভুরুঅলা
সুরাপসারিণী সেই সাকি বলে,
'ব্যথাবেদনার জ্যামুক্ত শর
তোমাকে লক্ষ্য ক'রে ছুটে চলে।

'হবে না তোমার তিলার্ধ লাভ
এই কটিদেশ থেকে, জেনে রাখো ;

যতদিন সব কিছুর মধ্যে
সর্বদা শুধু নিজেকেই দেখ।

'অন্য কোথাও সে চেষ্টা করো
যদি ফেলবার সাধ হয় জাল,
আঙ্কা পাখির বাসা এত উঁচু
কিছুতেই তার পাবে না নাগাল।'

এক গেলাসের যেমন ইয়ার
তেমনি গায়ক, সাকিও তো একই ;
জল আর মাটি এসব ভাবনা
আদতে বাহানা, মূলে সব ফাঁকি।

সে রাজশ্রীর সঙ্গে মিলন
কে করতে পারে তেমন দুরাশা
শাশ্বতকাল ধ'রে চলে এই
নিজের সঙ্গে তার ভালবাসা।

কোনোদিকে কূলকিনারা দেখি না
সামনে দরিয়া অপার, অথই,
আনো শরাবের জলযান সেই
সুখে তাতে ভবসাগর পেরোই।

সরাইখানায় যারা এসেছিল
ছেড়ে গেছে একে একে তারা সব
কেবল তুমিই প'ড়ে আছ একা
ঢালো আর খাও, হে মহানুভব।

ও হাফিজ, এই জীবনটা ধাঁধা—
কারো জানা নেই এর উত্তর ;
অস্তিত্বের বাস্তবিকতা
অলীক কাহিনী, ফুস্‌মন্তর॥

কুসুমের মাস

কুসুমের মাস এলো, বন্ধুরা
এসো ফুর্তির ফোয়ারা ছোটাই—
প্রাণ ভ'রে মদ ঢালি আর খাই
কান রেখে বুড়ো মাজির কথায়।

কোথা গেল দিলদরিয়া মানুষ!
এদিকে সুখের দিন বয়ে যায়;
কুশাসন বেচে মদ কেনা ছাড়া
থাকছে না আর অন্য উপায়।

মন্দমধুর বয় সুবাতাস
হে খোদা, পাঠাও সে তন্বঙ্গী—
আমরা যখন গোলাপী মদের
আসরে বসব, সে হবে সঙ্গী।

ঊর্ধ্বলোকের কলকাঠি-নাড়া
শয়তান ডাকু ঠক বাটপাড়
গুণীদের করে সর্বস্বান্ত—
সাধে রাগ হয়? করি চিৎকার!

ফুটেছে কুসুম, তাকে সিঞ্চিত
করি নি আমরা শরাবের জলে;
বিনা দোষে আজ আমরা পুড়ছি
অপূর্ণ বাসনার দাবানলে।

আমরা পেয়ালা থেকে ঢেলে খাই
তোফা স্বকপোলকল্পিত মদ;
গায়ক ও সুরা ছাড়া বেশ আছি
নজর না দেয় বালাই আপদ।

ও হাফিজ, কাকে বলি এই কথা
হয়েছে বড়ই শোচনীয় হাল,
বুলবুল যেন হয়ে গেছে বোবা
এসেছে যখন কুসুমের কাল ॥

বাউল হরিণ

হে উদ্‌ভ্রান্ত বাউল হরিণ,
তুমি আছ কোন্‌খানে কোন্ বনে !
তোমার আমার ভাব-ভালোবাসা
সেই কবে থেকে ! পড়ে না কি মনে ?

অসহায় খামখেয়ালী আমরা
দুজনে যে যার পথে চলি একা ;
একটি সামনে, একটি পিছনে
দুটি পথ আছে তাক ক'রে রাখা।

যেখানেই থাকো ছুটে চলে এসো,
ঘনিষ্ঠ হই তুমি আমি ফের,
কার কিবা হাল দেখি স্বচক্ষে
ব'সে মুখোমুখি পরস্পরের।

তোমার আমার ব্যবধানের যে
বেদনা রয়েছে, তার কথা থাক ;
তার চেয়ে এসো কার কী বাসনা
যতটুকু পারি জেনে নেওয়া যাক।

ওহে দেখ, ঘিরে ধ'রে আমাদের
ঘন জঙ্গল দেখাচ্ছে ভয় ;

এমন চারণভূমি দেখছি না
যেখানে ঘুরলে আনন্দ হয়।

বলো, আর্তের কে ত্রাণকর্তা ?
কে দীনবন্ধু ? যদি মিতাহারী
খিজির দেখান পথ, তো সহজে
এই দূরত্ব লঙ্ঘাতে পারি।

২

হয়ত এসেছে সেই সুসময়
আল্লা যখন খোলেন বরাত ;
চোখ বুঁজে যেই পাতা উল্টেছি
অমনি নজরে পড়ল আয়াৎ :

'মনে করো যাকারিয়ার উক্তি,
আল্লার কাছে তার প্রার্থনা :
তুমিই তো প্রতিপালক সবার
নিঃসন্তান আমাকে রেখো না।'

একবার এক মুসাফির দেখে
আরও একজন সেই পথে চলে :
তাকে কাছে ডেকে সেই মুসাফির
বলল তখন হেঁয়ালির ছলে :

'এই যে আসুন, বসুন আজ্ঞে—
কী রয়েছে মশায়ের থলিটিতে ?
যদি গচ্ছিত থাকে কিছু দানা
পেতে দিন ফাঁদ তাহলে মাটিতে।'

শুনে তখন সে বলে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ,
সদাসর্বদা দানা কাছে রাখি।

তবে কী জানেন ? ধরার বাসনা
কেবল চিরঞ্জীব সেই পাখি ।'

'মৃত্যুঞ্জয় পাখি ধরবেন ?'
শুধাল আবার সেই মুসাফির :
'আপনার কাছে ঠিকানা আছে কি ?
জানেন, কোথায় সে পাখির নীড় ?'

'আমি কেন ? কেউ এ পর্যন্ত
জানে না কোথায় সে পাখির বাসা ;
তা ব'লে ভগ্নমনোরথ হয়ে,
বলি না, ছাড়তে হবে তার আশা ।'

৩

চিরপুরাতন সে সহযাত্রী
ভারী বেআদব তার ব্যবহার ;
হা মুসলমান, যো মুসলমান
হায় খোদা ব'লে করি চিৎকার ।

সে বিচ্ছেদের তলোয়ার দিয়ে
আঘাত এমন হেনেছে কঠিন,
মনে হবে যেন তার ও আমার
মধ্যে ছিল না ভাব কোনোদিন ।

শোকে পরিণত ক'রে সব সুখ
ফিরে চলে গেল সে তো তারপর ;
কখনও এমন ঘোর অবিচার
ভাই করে না কো ভাইয়ের ওপর ।

যাতে খুঁজে পায় পরস্পরকে
জোড়ভাঙা বিচ্ছিন্ন আত্মা ;

তাই মিতাহারী খিজির হয়ত
পদাঙ্কে তাঁর দেখান রাস্তা।

দেখবে যখন সে শালপ্রাংশু
যাবে কাফেলার সঙ্গে পা ফেলে,
ব'সে থেকে সরুঝাউয়ের তলায়
ক'রো অপেক্ষা দুই চোখ মেলে।

মধুমাস আর মদের পেয়ালা
ওহে, তুমি রেখো নিয়ত মাথায় ;
মদোন্মত্ত জ্যোতিশ্চক্র
দেখো, যেন বিস্মরণে না যায়।

ঝর্ণার ধারে, নদীর কিনারে
অশ্রু তোমার করো বর্ষণ ;
বন্ধু ও গতাসুদের সঙ্গে
নিভৃতে চলুক স্বাগতভাষণ।

বসন্তে আকাশে কী ঘনঘটা
ভিড়ে যাও আজ সেই দঙ্গলে ;
অশ্রু ঝরিয়ে মেঘ কাছে এলো,
ধরো তার হাতে নয়নের জলে।

৪

কাগজের গায় মুহূর্তে যেই
লেখা শুরু করে কলম আমার,
প্রকৃতির বুকে যা কিছু নিহিত
সব রহস্য টেনে করে বার।

বুদ্ধি এবং আমার আত্মা—
তারা একাকার হয় নিজে নিজে ;

মাটিতে ফুটবে মানসমুকুল ;
তাদের মিলনসম্ভূত বীজে।

আহরণ ক'রে আনো সৌরভ
বিধুর সে আশাআকাঙ্ক্ষা থেকে
শাশ্বতকাল সেই সুগন্ধ
আত্মার নাকে থাকে যেন ঠেকে।

চূর্ণ অলক থেকে এক পরী
মৃগনাভির এ গন্ধ ছড়ায় ;
না, অরণ্যের হরিণ নয় সে
মানুষ দেখে যে বিষম ডরায়॥

জানতে চেয়ো না

সইতে হয়েছে কী.ব্যথাবেদনা
ভালোবেসে তাকে—
জানতে চেয়ো না।

তার বিচ্ছেদে ঢেলেছি যে, ইস্
কণ্ঠে কী বিষ—
জানতে চেয়ো না।

ঢুঁড়ে ঢুঁড়ে আমি কিভাবে দুনিয়া
পেয়েছি এ প্রিয়া—
জানতে চেয়ো না।

কী চেয়ে তোমার ও-দোরগোড়ায়
অশ্রু ঝরাই—
জানতে চেয়ো না।

তুমি বিনে থাকি গরিবখানায়
কী যন্ত্রণায়—
জানতে চেয়ো না।

কাল রাতে তার মুখ থেকে নিজে
শুনলাম কী যে—
জানতে চেয়ো না।

ওল্টানো রাঙা ও-ঠোঁটে আমার
কোন্ অধিকার—
জানতে চেয়ো না।

প্রেমপথে হাফিজের পায় পায়
এলাম কোথায়—
জানতে চেয়ো না॥

অতুলনীয়

মিলবে না ক্ষণেকের যন্ত্রণা
যদি তুমি গোটা পৃথিবীও দাও ;
বেচে নমাজের আসন যে মদ
কিনবে তাতেও বেশ মোটা দাঁও।

শুঁড়িরা গণ্য করবে না ওটা
তুল্যমূল্য এক পাত্রেরও ;
ব্রহ্মচর্য একেবারে বাজে—
হায় খোদা, একি কপালের গেরো !'

হোক ঝকমকে বাদ্‌শার তাজ—
ভয় তার, হবে কখন কোতল ;
লোভনীয় বটে মুকুট, কী লাভ
দেয় যদি মাথাব্যথাই কেবল।

বেদলের লোক তেড়ে এসে বলে,
'সরাইতে মাথা গলাস্‌ নে, যা তো'
আমার মাথাটা নয় দেহলির
ধূলিরও যোগ্য ? বাঃ, বেশ মজা তো !

যে চাইছে মন কাড়তে তোমার
ঢের ভালো তাকে মুখ না দেখানো ;
সৈন্যেরা যদি হয় নাজেহাল
তাহলে রাজ্য জয় করা কেন !

বন্ধুরা সব এবং স্বদেশ
মানুষের পায়ে পরায় যে বেড়ি ;
তা নইলে শুধু পারস্য কেন,
থাকত না টান খোদ বিশ্বেরই।

আগে ভাবা গিয়েছিল দরিয়ায়
দুঃখ ও ক্লেশ কিছু না এমন ;
একটিও ঢেউ খেতে রাজী নই
একশো মুক্তো পেলেও এখন।

যাও, সন্ধান করো মহাসুখ
সহজভাবের কোণে ঠাঁই নিও ;
একদণ্ডও থেকো না বিরস
দেয় যদি সসাগর মেদিনীও।

হাফিজের মত হও মহাসুখী,
ছাড়ো এ ফিচেল খল সংসার ;
ইতরের তিলমাত্র নিও না
পেলেও মুক্তো দু'চার হাজার ॥

এনে দাও

পড়ে যদি বঁধুয়ার মঞ্জিল
পথে যেতে, ও হে পুবের বাতাস,
তবে তুমি তার কুন্তল থেকে
বয়ে এনে দিও অমৃতসুবাস।

আমার বধুর মাথার দিব্য,
জলছড়া দেবে আমার আত্মা
কৃতজ্ঞতায় ; যদি তুমি আনো
তার কাছ থেকে কুশলবার্তা।

তার মঞ্জিলে ঢোকা সম্ভব
নাও যদি হয় তোমার পক্ষে,
তার দেহলির ধুলো বয়ে এনো
তা দিয়ে কাজল পরব চক্ষে।

আমি প্রেয়সীর মিলনভিখারী
পথের ফকির এক নগণ্য,
স্বপ্নেই শুধু আমার লভ্য
হয়ত প্রিয়ার রূপলাবণ্য।

কেঁপে কেঁপে ওঠা খড়ের মতন
হৃদয় আমার হয় উত্তাল,

চাই আমি নলদণ্ডের মত
তোমার ও-বরতনুর নাগাল।

আমাকে যে কানাকড়িরও মূল্য
দেয় না বঁধুয়া তাতে নেই ভুল ;
আমি যদি দিই তামাম ছুনিয়া
মিলবে না তার একটিও চুল।

ঘুরতে ঘুরতে যদি কোনো রাতে
সে-গলিতে গিয়ে পড়ি দৈবাৎ
পৌঁছে তোমার সিংহদুয়ারে
দর্শাবো আমি কোন্ অজুহাত ?

হৃদয়ের যদি এই দশা হয়
পড়েনি যখন গলায় জোয়াল,
একবার হলে বধূর গোলাম
হাফিজের হবে তখন কী হাল ?

স্বাগতম্

স্বাগতম্, শুভবার্তা-বাহক !
দিন ভালো যাবে, এসো শুভানন,
কী খবর ? এলে কোন্ পথ দিয়ে—
বলো পাখি, আছে বন্ধু কেমন ?

হে খোদা, শুরুর সে শুভদিনটি
কাফেলাকে যেন নিরাপদে রাখে ;
ছুশমন যেন ধরা পড়ে জালে,
বন্ধু নিত্য যেন পাশে থাকে।

আমি আছি, আছে বঁধুয়া আমার
এই গল্পের শেষ নেই কোনো ;
কেননা নেই কো যার আরম্ভ
সে মেনে নেয় না অন্ত কখনও।

ফুল পেয়ে গেছে বেশি আহ্লাদ—
তুমি একবার দেখাও তো মুখ !
ভালো নয় সরুঝাউয়ের দেমাক—
একবার হাঁটো, দুনিয়া দেখুক।

স্বর্গশিখরে করেছে কূজন
আমার যে প্রাণপাখি এতকাল
তোমার গালের তিল দেখে শেষে
নিজে সেধে পরে বন্ধনজাল।

আমাকে যখন প্রিয়ার অলক
যজ্ঞসূত্র ফরমাশ দেয়,
যাও ভাগো, শেখ ! অধর্ম হবে
যদি আমি নামাবলী দিই গায়।

তোমার ভ্রূ দেখে মজেছে হাফিজ
মনে হয়, তার একটি কারণ—
মিনারের গম্বুজের তলায়
লেখকেরা সব বেছে নেয় কোণ ॥

স্বর্গত হাফিজের সঙ্গে স্বগত আলাপ

আমি বললাম, 'হয়েছ ভ্রান্ত,
নাও নি কো তুমি সঠিক পন্থা।'
সে বলে, 'কী আর করা যাবে, বলো—
অদৃষ্ট সবই, বিধি নিয়ন্তা।'

বলি, 'চেয়েছিলে এক হয়ে যেতে,
মেটান সে আশা অন্তর্যামী।'
সে বলে, 'চাই নি ঠিক এইভাবে
খোদার সঙ্গে এক হতে আমি।'

শুধোলাম তাকে, 'এই দুর্দশা
হল আজ কার কুসংসর্গে?'
সে বলে, 'আমারই মন্দভাগ্য
থাকে যে নিত্য আমার সঙ্গে।'

শুধাই, 'ও চাঁদ, কেন তুলে নিলে
আমাতে তোমার অচলা ভক্তি?'
সে বলে, 'জ্যোতিশ্চক্র বৈরী,
কারণ আমার অন্যাসক্তি।'

বলেছি, 'সুখের পেয়ালা দেদার
ঢেলেছ গলায় এর আগে রোজ।'
সে বলে, 'সবার শেষেরটিতেই
পাই বিশল্যকরণীর খোঁজ।'

বলি, 'আঁকা হল তোমাকে নিয়ে তো
অবিশ্বাসের কতই না ছবি।'
সে বলে, 'ললাটপটে লেখা আছে—
দেখ হে, আদ্যোপান্ত ও-সবই।'

আমি বলি, 'অত ব্যস্ততা কেন,
যেতে তো এখনও আছে ঢের দেরি !'
বলল সে, 'দেখেশুনে মনে হয়
এ নির্ঘণ্ট স্বয়ং কালেরই।'

আমি শুধোলাম, 'তুমি ছেড়ে গেলে
কোন্ যুক্তিতে হাফিজকে, হায় !'
বলল সে, 'ছিল মনের গহনে
নিয়ত আমার এ-অভিপ্রায় ॥'

হাফিজ-এর মূল কবিতা

১

আল্লা য়া আহিয়া উস্সাকী
আদির্কা সা ব নাবিল হা
কি ইশ্ক্ আঁসা নমুদ অব্বল
বলে উফ্তাদ মুশ্কিল হা।

ব বু-এ-নাফা কি আখির
সবা য তুর্রা বকুশায়দ
য তাবে জাদে মুশকিনশ্
চি খুঁ উফ্তাদ দর দিল্হা।

মরা দর মনযিলে জানাঁ
চি অম্ন্ ব ঐশ্ চুঁ হরদম
জরস ফরিয়াস মীদারদ্
কি বরবন্দীদ মহ্মিল হা।

শবে তারীক ব বীমে মৌজ
ব গিরদাবে চুনীঁ হায়ল
কুজা দানন্দ্ হাল-এ-মা
সুবুকসারানে সাহিল হা।

ব ময় সজ্জাদা রঙ্গীঁ কুন
গরৎ পীরে মুগাঁ গোয়দ
কি সালিক বেখবর নবুঅদ
য রস্মো রাহে মন্যিল হা।

হমা কারম য খুদকামী
ব বদনামী কুশীদ আখির
নিহাঁ কে মানদ আঁ রাযে
কি য বে সাযন্দ মহ্ফিল হা।

হুযুরী গরহমী খাহী
অয উ গায়ব মশৌ হাফিয
মতী আ তল্খ্ মন তহ্ৰা
দ এ আল্লাহ নয়াৰ অম্ হিল্হা ॥

২

স্বলাহে কার কুজা
ৰ মন খরাব কুজা
ববী তফাৰতে রাহ
অয কুজাস্ত্ তা কুজা।

চি নিস্বতস্ত্ বরিন্দী
স্বলাহো তকৰা রা
স্বমা-এ ৰায কুজা
নগ্মা-এ-রবাব কুজা।

দিলম্ য স্বমিয়া বগিরফ্ৎ
ৰ খিরকা-এ-সালূস
কুজাস্ত্ দৌরে মুগাঁ
ৰ শরাব কুজা।

বশুদ য য়াদে খুশ
য়াদে রোযগারে ৰিসাল
খুদ আঁ করিশ্মা কুজা
রফ্ৎ ৰ আঁ ইতাব কুজা।

য রূ-এ-দোস্ত্
দিলে দুশমনাঁ চি দর য়াবদ
চিরাগ মুর্দা কুজা
শমএ আফতাব কুজা।

ববীঁ সেবে যনখদাঁ
কি চাহে দর রাহস্ত্‌
কুজা হমী রৱী ঐ দিল্‌
বদীঁ শিতাব কুজা

চু কু হলে বীনশে মা
খাকে আস্তানে শুমাস্ত্‌
কুজা রৱেম বফর্মা
অযীঁ জনাব কুজা।

করার ৱ খ্‌ৱাব য হাফিয
তমৃঅ মদার ঐ দোস্ত্‌
করার চীস্ত্‌ সবুরী কুদাম
ৱ খ্‌ৱাব কুজা॥

৩
অগর আঁ তুর্ক-এ-শিরাযী
বদস্ত আরদ দিল-এ-মারা
বখাল-এ হিন্দৱশ বখ্‌শম
সমরকন্দ ৱ বুখারারা।

বদহ সাকী ময়-এ-বাকী
কি দর জন্নৎ ন খাহী য়াফ্‌ৎ
কিনার-এ-আব-এ রুক্‌নাবাদ
ৱ গুলগশ্‌ৎ-এ-মুসল্লারা।

য ইশ্‌কে না তমাম-এ-মা
জামাল-এ-য়ার মুস্তগনীস্ত্‌
ৱ আব-ৱ-রঙ্গ-ৱ-খাল-ৱ-খৎ
চি হাজৎ রু-এ-যেবারা।

মন অয আঁ হুস্ন-এ-রোষ অফযুঁ
কি য়ুসুফ দাশ্‌ৎ দানস্তম্
কি ইশ্‌ক্ অয পর্দা-এ-অস্‌মৎ
বয়রূঁ আৰর্দ্ যুলেখারা।

হদীসে অয মুৎরিব-ৰ-ময়
গোই ৰ রাজ-এ-দহর কম্‌তর জো
কি কস ন কশুদো-কশায়দ
বহিকমত ঈ মুঅম্মারা।

নসীহৎ গোশ কুন জানাঁ
কি অয জাঁ দোস্ত্‌তর দারন্দ্
জবানান-এ-সআদৎমন্দ্
পন্দ-এ-পীর-এ-দানারা।

বদম গুফ্‌তী ৰ খুরসন্দম
অফাকুল্লাহ্ নকু গুফ্‌তী
যৰাব-এ-তল্‌খ্ মীসাজদ
লব-এ-লাল-এ শক্কর খারা।

গযল গুফ্‌তী ৰ দুর্‌র্ সুফ্‌তী
বয়া ৰ খুশ বখাঁ হাফিয
কি বর নয্‌ম্-এ-তু অফ্‌শানদ
ফলক উক্‌দ্-এ-সুরেইয়ারা॥

৪

সবা বলুৎফ্ বগো আঁ
গয্‌যাল-এ-রানারা
কি সর বকোহো-বয়াবাঁ
তু দাদা মারা।

ব শুক্‌রে আঁ কি তু ই
বাদ্‌শাহ্‌-এ-কিশ্বর-এ-হুস্‌ন্‌
ব ষ্বাদ আর গরিবানঙএ-
দশ্‌তো সহরা রা।

শক্কর ফরোশ কি উম্রশ
দরায বাদ চি রা
তফক্‌কুদে নকুনদ তুতী
এ-শক্কর খারা।

গুরুরে হুস্‌ন্‌ ইজাযৎ
মগর নদাদ ঐ গুল
কি পুর সিশে নকুনী
অন্দলীবে শৈদা রা।

ব হুস্‌নে খুল্‌ক্‌ তৱাঁ
কর্দ্‌ অহ্‌লে নযর
ব দামো দানা নগীরন্দ্‌
মুর্গে দানা রা।

চুঁ বা হবীব নশীঁ ৱ
বাদা পৈ মাই
ব য়াদ আর হরীফানে
বাদা পৈ মারা।

ন দানম অয চি সবব
রংগে আশ্‌নাই-নীস্ত্‌
সহী কদানে সিয়াহ্‌ চশ্‌মে
ৱ মাহে সীমা রা।

জুয ইঁ কদ্‌র্‌ ন তৰাঁ গুফ্‌ৎ
দর জমালে তু ঐব্‌
কি খালে মেহরো বফা নীস্ত্‌
রূ এ যেবারা।

দর আস্‌মাঁ চি অজব গর য
গুফ্‌তা এ হাফিয
সুমা এ যুহ্‌রা বরকৃস্‌
আৰদ মসীহারা॥

৫

রৌনকে অহদে শবাবস্ত
দিগর বোস্তাঁরা
মী রসদ মুয্‌দা-এ-গুল
বুলবুলে খুশ ইলহাঁরা।

এ সবা গর ব জৰানানে
চমন বায রসী
খিদ্‌মতে মা বরসা সর্ৰোঁ
গুলোবো রীহাঁরা।

তরসম আঁ কৌম কি বর
দুর্দ্‌কশাঁ মীখন্দদ
দর সরে কারে খরাবাৎ
কুনন্দ ইমাঁরা।

য়ারে মর্দানে খুদাবাশ কি
দর কশ্‌তী-এ-নূহ্‌
হস্ত খাকে কি বাবে
ন গিরদ তূফাঁরা।

বরো অয খানা-গর্দ্
বদর ৰ ন'া মতলব
কি ই সিয়াহ্ কাসা দর আখির
ব কুশদ মহ্ম'ারা।

গর চুনীঁ যলৰা কুনদ
মুগবচ্চা বাদাফরোশ
খাকরোবে দরে ময়খানা
কুনম মিযগাঁ রা।

ন শৰী ৰাকিফ ইক নুক্তা
য অসরারে ৰজুদ
গর তু সর গশ্তা শৰী
দায়রা-এ-ইমকাঁ রা।

হর করা খবাবগাহ্ আখির
বদো মুস্তে খাকস্ত্
গো চি হাজৎ কি বর
অফ্লাক কশী ইবারা।

দর সরে যুল্ফ্ ন দানম
কি চি সৌদা দারী
কি বহম বর জদা-এ-গেসূ-এ
মুশ্ক্ অফ্শাঁরা।

মুল্কে আযাদগী ব কুন্জে
কনাঅৎ গন্জেস্তস্ত্
কি ব শমশীর ময়স্সর
ন শৰদ স্থলতাঁরা।

হাফিয ময় খুর ব রিন্দী
কুন্ ব খুশ্‌বাশ বলে
দামে তজ্জবীয মকুন চুঁ
দিগরাঁ কুর্‌আঁ রা ॥

৬

বয়া কি কস্রে অম্‌ল্ সখ্‌ৎ
সুস্ত্‌ বুনিয়াদস্ত্‌
বয়ার বাদা কি বুনিয়াদে
উম্‌র্ বরবাদস্ত্‌।

গুলামে হিম্মতে আনম
কি যেরে চর্খে কবুদ
য হর চি রংগে তআল্লুক
পযীরদ আযাদস্ত্‌।

চি গোয়মৎ কি ব ময়খানা
সরোশে আলমে গৈবম
দোশ মস্তো খরাব
চি মুয্‌দহা দাদস্ত।

কি ঐ বলন্দ্‌ নযর
শাহবায সিদ্‌রানশীঁ
নশেমনে তু নইঁ কুন্‌জে
মেহনতাবদস্ত্‌।

তুরা য কুংগ্‌রা-এ-অর্শ্‌
মীযনদ সফীর
ন দানমৎ কি দর ইঁ দাম
গাহ্‌ চি উফ্‌তাদস্ত্‌।

নসীহতে কুনমৎ য়াদ গীর
ব দর অমূল আর
কি ঈঁ হদীসে য পীরে
তরীকতম য়াদস্ত্।

রযা ব দাদা বদেহ্ ব
য জবী গিরহ্ বকুশাই
কি বর মনো-তু দরে
ইখ্তিয়ার ন কুশাদস্ত্।

গমে জহাঁ মখুর ব পন্দে
মন মবর অয য়াদ
কি ইঁ লতীফা-ই-ইশ্কম
য রহরবেঁ য়াদস্ত্।

মজো দুরুস্তী-এ-অহদ অয
জহানে সুস্ত নিহাদ
কি ইঁ অযুযা অরূসে
হযার দামাদস্ত্।

নিশানে অহদো বফা নীস্ত্
দর তবস্সুমে গুল
বনাল বুলবুলে বেদিল
কি জারে ফরিয়াদস্ত্।

হসদ চি মীবরী ঐ সুস্ত্
নযম বর হাফিয
কবুলে খাতির ব লুৎফে
সুখন খুদা দাদস্ত॥

৭

যুল্‌ফ্‌ আশুফ্‌তা ৱ খী করদা
ৱ খন্দা লব ৱ মস্ত্‌
পৈরহন চাক ৱ গযল খ্‌ৱা
ৱ স্বরাহী দরদস্ত্‌ ।

নরগিসশ অর্বদা খু ৱ
লবশ অফসোস কুনা
নীম্‌শব দোশ ববালীনে
মন আমদ বনিশস্ত্‌ ।

সর ফরা গোশে মন আৱর্দ
ৱ বআৱাযে হযীঁ
গুফ্‌ৎ ঐ আশিকে শোরীদা
এ মন খ্‌ৱাবৎ হস্ত্‌ ।

আশিকেরা কি চুনীঁ
বাদা-এ-শবগীর দহন্দ
কাফিরে ইশ্‌ক্‌ বুঅদ
গর নবুদ বাদা পরস্ত্‌ ।

বরৌ ঐ যাহিদ ৱ বর
দুর্দ্‌কশাঁ খুর্দামগীর
কি দাদন্দ জুয ইঁ
তোহ্‌ফা রোযে অলস্ত্‌ ।

আঁ চি উ রেখ্‌তম ব
পৈমানা-এ-মা
অগর অয খুমরে বিহিশ্‌তস্ত
ৱ অয বাদা-এ-মস্ত্‌ ।

খন্দা-এ-জামে-ময় ৱ
যুল্‌ফে গিরহগীরে নিগার
ঐ বসা তোবা কি চুঁ ব
তোবা-এ-হাফিয বশিকস্ত্‌।

৮

শিগুফ্‌তা শুদ গুলে হম্‌রা
ৱ গশ্‌ৎ বুলবুল মস্ত
সদা এ সর খুশী ঐ
আশিকানে বাদা পরস্ত।

অসাসে তোবা কি দর
মহকমী চুঁ ৎংগ্‌নমুদ
ববীঁ কি জামে যজাযী
চি গুনা অশ বশিকস্ত।

ববালো পর মরৌ অয
রহ্‌ কি তীরে পুর তাবে
হৱা গিরফ্‌ৎ যমানে ৱলে
ব খাক নিশস্ত।

অয ই রৱাকে দো দর
চুঁ যরূরস্ত রহীল
রৱাকে তাকে মইশ্‌ৎ চি
সর বলন্দ ৱ চি পস্ত্‌।

ব 'হস্ত' ৱ 'নীস্ত' মরনূজাঁ
যমীর ৱ খুশবাশ
কি 'নীস্ত' হস্ত সর অনুজামে
হর কমাল কি হস্ত্‌।

শিকোহে আসিফি ব অস্‌পে
বাদ ব মস্তকে তয়্যুর
ব বাদ রফ্‌ৎ ব অয আঁ
খ্‌বাযা হেচ্‌ তরফ ন বস্ত্‌।

বয়ার বাদা কি দর
বারগাহে ইস্তগনা
চি পাসবাঁ ব চি সুলতাঁ চি
হোশিয়ার ব চি মস্ত্‌।

জবানে কিল্কে তু হাফিয
চি শুক্‌রে আঁ গোয়দ
কি তোহ্‌ফা-এ-শুখনশ
বুরন্দ দস্ত্‌ বদস্ত্‌॥

৯

গুল দর বর ব ময় দর কফ
ব মাশুকা ব কামস্ত্‌
সুলতানে জহানম ব
চুনীঁ রোয গুলামস্ত্‌।

গো শম্‌অ মআরদ দর ঈ
বয্‌ম্‌ কি ইমৃশব
দর মজলিসে মা মাহে
রূখে দোস্ত তমামস্ত্‌।

দর মযহবে মা বাদা
হালালস্ত ব লেকিন
বে রূ-এ-তু ঐ সৰ্বে
গুল অন্দাম হরামস্ত্‌।

গোশম হমা বর কৌলে নৈ
ৰ নগ্মা-এ-চংগ্অস্ত্
চশ্মম্ হমা বর লালে
লবো গৰ্দিশে জামস্ত্ ।

দর মজলিসে মা ইৎরৃ
মআমেয কি জঁা রা
হর লহ্যা য গেসুএতু
খুশ্বু-এ-মশামস্ত্ ।

অয চাশ্নী-এ-কন্দ মগো
হেচ্ ৰ য শক্কর
য আঁ রূ কি মরা বা লবে
শীরীনে তু কামস্ত্ ।

অয নংগে কি চি গোই কি
মরা নাম য নংগস্ত্
ৰ য নাম চি পুরসী কি
মরা নংগে য নামস্ত্ ।

ময় খ্ৰারা ৰ সরগশ্তা
ৰ রিন্দম ব নযরবায
ৰ আঁ কস কি চুঁ মা নীস্ত
দর ইঁ শহর কুদামস্ত্ ।

বা মোহৎসিবম ঐব্
মগোয়দ কি উ নেয
পৈৰস্তা চুঁ মা দর
তলবে ঐশে মুদামস্ত্ ।

তা গনৃজে গমত
দর দিলে মুকীমস্ত
পৈবস্তা মরা কুনৃজে
খরাবাৎ মকামস্ত্ ।

হাফিয মনশীঁ বেময়
ব মাশুকা যমানে
কি অয়.য়ামে গুলো য়াস্মীন
ব ঈদে সয়ামস্ত্ ॥

১০
সুব্হদম মুর্গে চমন বা গুলে
নো খাস্তা গুফ্ৎ
নায কম কুন কি দরীঁ বাগ
বসে চুঁ তু শিগুফ্ৎ ।

গুল ব খন্দীদ কি অয
রাস্ত ন রনৃজেম বলে
হেচ্ আশিক সুখনে তল্খ্
ব মাশুক নগুফ্ৎ ।

গর তমৃঅ দারী অয আঁ
জামে মুরস্সা ময়ে লাল
দুর্র্ ব য়াকৃৎ ব নৌকে
মিযায়ৎ বায়দ সুফ্ৎ ।

তা অবদ বু-এ-মহব্বৎ
ব মশামশ ন রসদ
হর কি খাকে দরে ময়খানা
ব রুখ্সারে ন রুফ্ৎ ।

দর গুলিস্তানে ইরম দোশ
চুঁ অয লুৎফে হবা
যুল্‌ফে সম্‌বুল য নসীমে
সহরী মী আশুফ্‌ৎ।

গুফ্‌তম ঐ মসনদে জম
জামে জহাঁ বীনৎ কু
গুফ্‌ৎ অফসোস কি আঁ
দৌলতে বেদার বখুফ্‌ৎ।

সুখনে ইশ্‌ক্‌ ন আনস্ত
কি আয়দ ব জুবাঁ
সাকিয়া ময় দহ্‌ ব কোতাহ্‌ কুন্‌
ই গুফ্‌তো সুনুফ্‌ৎ।

অশ্‌কে হাফিয খিরদো সব্‌র্‌
ব দরিয়া অন্দাখ্‌ৎ
চি কুনদ সোযে গমে ইশ্‌ক্‌
ন আরস্ত ন হুফ্‌ৎ॥

১১

এ হুদহুদে সবা ব সবা
মী ফরস্তমত
ব নিগর কি অয কুজা তা কুজা
মী ফরস্তমত।

হৈফস্ত তাইরেঁ চুঁ দর
খাকদানে দহর
য ইঁজা ব আশিয়ানে বফা
মী ফরস্তমত।

দর রাহে ইশ্‌ক্ মরহলা-এ
কুর্বো বুঅদ নীস্ত
মী বীনমত অয়াঁ ব দুআ
মী ফরস্তমত।

হর সুবহ্‌-ব-শাম কাফিলা
অয দুআ-এ-খৈর
দর সোহবতে শুমাল ব সবা
মী ফরস্তমত।

দর-রূ-এ-খুদ তফর্‌রূযে
সন্‌অ-এ-খুদা-বকুন
কি আইনা-এ-খুদা-এ নুমা
মী ফরস্তমত।

তা লশ্‌করে গমৎ ন কুনদ
মুল্কে দিল্ খরাব
জানে অযীযে খুদ ব ফিদা
মী ফরস্তমত।

হরদম গমে ফরস্ত মরা
ব বগো বনায
কি ঈঁ তোহ্‌ফা অয বরায়ে খুদা
মী ফরস্তমত।

ঐ গায়ব অয নযর কি শুদী
হমনশীনে দিল্
মী গোয়মৎ দু আ ব সনা
মী ফরস্তমত।

তা মুৎরিবা য শৌকে
মনৎ আগহী দহন্দ
কোলো গযল ব সায ব নবা
মী ফরস্তমত।

সাকী বয়া কি হাতিফে গৈবম
ব মুযদহা গুফ্‌ৎ
বা দর্দ সব্‌র্‌ কুন কি দবা
মী ফরস্তমত।

হাফিয সরোদে মজলিসে
মা যিক্‌রে খৈরতস্ত
তাজীল কুন কি অস্‌প ব কবা
মী ফরস্তমত॥

১২
সাল্‌হা দিল্‌ তলব জামে
জম অয মা মীকর্দ
ব আঁ চি খুদ দাশ্‌ৎ য
বেগানা তমন্না মীকর্দ।

গোহরে কি য সদফে
কোনো মকা বৈরূনস্ত
তলব অয গুম শুদগাঁ
লবে দরিয়া মীকর্দ।

মুশ্‌কিলে খেশ্‌বর পীরে মুগাঁ
বুর্‌দম দোশ
কি উ বতাইদে নযর
হল্লে মুঅম্‌মা মীকর্দ।

দীদমশ খুর্‌রমো খন্দাঁ
কদহে বাদা বদস্ত
ব অন্দর আঁ আইনা
সদ্‌গূনা তমাশা মীকর্দ ।

গুফ্‌তম ই জামে জহাঁবী
কে দাদ হকীম
গুফ্‌ৎ আঁ রোয কি ইঁ
গুম্‌বদে মীনা মীকর্দ ।

ফৈজে রুহুলকুদ্‌স্‌ অর
বায মদদ ফরমায়দ
দিগরাঁ হম বকুনন্দ আঁ
চিঁ মসীহা মীকর্দ ।

গুফ্‌ৎ আঁ য়ার কি য উ
গশ্‌ৎ সরে দার বলন্দ
জুর্মশ ইঁ বুদ কি অসরার
হুবেদা মীকর্দ ।

আঁ হমা শোব্‌দাহা
অক্‌ল্‌ কি মীকর্দ আঁজা
সামরী পেশে আসা ব
য়দে বৈযা মীকর্দ ।

গুফ্‌ৎমশ সিল্‌সিলাএ
যুল্‌ফে বুতাঁ দানী চীস্ত
গুফ্‌ৎ হাফিয গিলা অয
শবে য়ল্‌দা মীকর্দ ॥

১৩
গুলামে নর্গিসে মস্তেতু
তাজদারানন্দ
খরাবে বাদা-এ-লালা-এ-তু
হোশিয়ারানন্দ।

তুরা হয়া ৰ মরা আবেদীদ
শুদ গুম্‌মায
ৰরনা আশিক-ৰ-মাশুক
রাযদারানন্দ।

ব যেরে যুল্‌ফে দোতা চুঁ গুযর
কুনী বনিগার
কি অয য়মীন-ৰ-ইসারৎ
চিঁ বেকরারানন্দ।

নসীবে মাস্ত বিহিশ্‌ৎ ঐ
খুদাশনাস বৈরো
কি মুস্তহকে করামৎ
গুনহ গারানন্দ।

ন মন বর আঁ গুলে আরিয
গযল সরা এম ৰ বস
কি অন্দলীবে তু অয
হর তরফ হযারানন্দ।

তু দস্তগীর শব ঐ খিয্‌রে
পৈ খযস্তা কি মন
পিয়াদা মী রৰেম ৰ
হমরাহান সৰারানন্দ।

বয়া বমৈকদা ব চেহরা
অর্গ্বানী কুন
মরো ব স্থমিয়া কি আঁ জা
সিয়াহ্ কারানন্দ।

খলাসে হাফিয অয আঁ
যুল্‌ফে তাব মদার
কি বস্তগানে কামান্দে
তু রুস্তগারানন্দ।

১৪
দোশ দীদম কি মলায়ক
দরে ময়খানা যদন্দ
গিলে আদম ব সিরশ্‌তন্দ
ব বপৈমানা যদন্দ।

সাকিনানে হরমে সির্‌রে
অফাফে মলকুৎ
বা মনে রাহানশীঁ
বাদা-এ-মস্তানা যদন্দ।

আসমাঁ বারে অমানৎ
ন তবানস্ত কশীদ
কুর্‌রা-এ-ফাল বনামে
মনে দীবানা যদন্দ।

মা বা সদ খিরমনে পিন্দার
য রহ চুঁ ন রবেম
চুঁ রাহে আদমে খাকী
বেকে দানা যদন্দ।

আতিশে আঁ নীস্ত কি বর
শোলা-এ-অথন্দদ শমৃঅ
আতিশে আনস্ত কি দর
খিরমনে পরৰানা যদন্দ।

জংগে হফ্তাদ ৰ দো মিল্লৎ
মহরা উয্‌র্ ব নহ
চুঁ ন দীদন্দ হকীকৎ
রাহে অফসানা যদন্দ।

শুক্রে এযদ কি মিয়ানে মন
ৰ উ স্থলহফ্তদ
হুরীয়াঁ রক্স্ কুনাঁ
সাগরে শুক্রানা যদন্দ।

কস চুঁ হাফিয ন কুশীদ অয
রুখে অন্দেশা নকাব
তা সরে যুল্ফে অরূসানে
সুখুন শানা যদন্দ॥

১৫
দস্ত অয তলব ন দারম
তা কামে মন বর আয়দ
য়া জাঁ রসদ ব জানাঁ
য়া জাঁ যূ তন বর আয়দ।

ব কুশাএ তুরবতমরা
বাদ অয ৰফাৎ ৰ বনিগর
কয আতিশে দরূনম
দূদ অয কফন বর আয়দ।

বহুমাএ রুখ কি খন্ধে
বালা শবন্দ ব হৈ রাঁ।
কুশাএ লব কি ফরিয়াদ
অয মর্দো যন বর আয়দ।

জাঁ বর লবস্ত ব হসরৎ
দর দিল্ কি অয লবানশ
ন গিরফ্‌তা হেচ কামে
জাঁ অয বদন বর আয়দ।

গুফ্‌তম বখেশ কয বে বরগীর
দিল্ দিলম গুফ্‌ৎ
কারে কসেস্ৎ ইঁ
বা খেশ্‌তন বর আয়দ।

হর ইক শিকন য যুল্ফৎ
পঁজাহ শস্ত দারদ
চুঁ ইঁ দিলে শিকস্তা
বা আঁ শিকন বর আয়দ।

বর বুএ-আঁ কি দর বাগ
আয়দ গুলে চুঁ রু-এ-ৎ
আমদ নসীম ব হরদম
গির্দে চমন বর আয়দ।

বর খেয তা চমন্ রা
অয কামতো ময়ানৎ
হম্ সরো দর বর আয়ৎ
হম্ নাৎবান বরায়ৎ।

হরদম চু" বেৰফায়াঁ
নতৰাঁ গিরফ্‌ৎ বারে
মা এম ৰ আস্তানশ তা জাঁ
য তন বর আয়দ।

গোয়ন্দ কি যিকরে খৈরশ
খেলে ইশ্‌ক্‌বাযাঁ
হর জা কি নামে হাফিয
দর অন্‌জুমন বর আয়দ॥

১৬
ইশ্‌ক্‌ বাযী ৰ জৱানী
ৰ শরাবে লালা ফাম
মজলিসে ইন্‌স ৰ হরীফে
হমদম ৰ শুর্বে মুদাম।

সাকী-এ-শক্কর দহান
ৰ মুৎরিবে শীরী" সুখন
হম নশীনে নেক কিরদার
ৰ হরীফে নেক নাম।

শাহিদে দর লুৎফো পাকী
রশ্‌কে আবে যিন্দগী
দিল্‌বরে দর হুসনো খুবী
গৈরতে মাহে তমাম।

বাদা-এ-গুলরংগ ৰ তল্‌খ্‌ ৰ
অজব খশ্‌খ্‌ৰাঁরে সুবুক
নুক্লে অয লালে নিগার ৰ
নুক্লে অয য়াকুতে জাম।

বয্‌ম্‌ গাহে দিল্‌কশী চুঁ
কস্রে ফিরদোসে বরীঁ
গুল্‌শনে পীরা মনশ চুঁ
রোযা-এ দার-উস্‌সলাম ।

সফ নশীনাঁ নেক খ্‌ৱাহ
ৱ পেশ্‌কারাঁ বা অদব
দোস্তদারাঁ সাহিবে সিৱ্‌র্‌
ৱ হরীফাঁ দোস্তকাম ।

গম্‌যা-এ-সাকী বয়গ্‌মা এ
খিরদ আহিখ্‌তা তেগ
যুল্‌ফে দিলবর অয বরা এ
সৈদে দিল্‌ গুস্তার্‌দা দাম ।

হর কি ইঁ সোহবতে ন জোয়দ
খুশদিলী বরু-এ-হলাল
ৱ আঁ কি ইঁ ইশ্‌রৎ ন খ্‌ৱাহদ
যিন্দগী বরূ-এ-হয়াম ॥

১৭

মুয্‌দা-এ-বস্‌লে তু কু
কয সরে জাঁ বর খেযম
তাইরে কুদ্‌সম ৱ অয
দামে জহাঁ বর খেযম ।

ব ৱিলায়ে তু কি গর
বন্দা-এ-খেশম খানী
অয সরে খ্‌ৱাজগী-এ
কোনো মকাঁ বর খেযম ।

বর সরে তুরবতে মন
বা ময়-ব-মুৎরিব বনশীঁ
তা ববুএৎ য লহদ
রকৃস্ কুনাঁ বর খেযম।

খেয ব বালা ব নু মা
ঐ বুতে শীরী হরকাৎ
কি য সরে জান-ব-জহাঁ
দস্ত ফিশা বর খেযম।

গরচি পীরম তু শবে
তংগ্ দর আগোশম কশ
তা সহর গহ্ য কিনারে
তু জবাঁ বর খেযম।

রোযে মর্গম্ নফসে
মোহলতে দীদার বদহ
তা চুঁ হাফিয য সরে
জানো জহাঁ বর খেযম॥

১৮

সুব্হস্ত সাকিয়া কদহ
পুর শরাব কুন
দোরে ফলক দিরেগ
নদারদ শিতাবকুন।

য আঁা পেশতর কি আলমে
ফানী শব্দ খরাব
মারা য জামে বাদা-এ
গুলগুঁ খরাব কুন।

খুরশীদে ময় য মশরিকে
সাগর তুলূঅ করদ
গর বর্গে ঐশ মীতলবী
তর্কে খ্ৱাব কুন।

রোজে কি চর্খ্ অয
গিলে মা কুযাহ কুনদ
যিনূহার কাসা-এ-সরে-মা
পুর শরাব কুন।

মা মর্দে যুহদ-ৱ-তোবা
ৱ তামাৎ নীস্ত
বা মা ব জামে বাদা-এ-
সাকী খিতাব কুন।

কারে সৱাব বাদা
পরস্তী অস্ত হাফিয
বর খেয ৱ রূ-এ-অয্ম্
ব কারে সৱাব কুন॥

১৯

শাহে শমূশাদ কদাঁ
খুসরৱে শীরীঁ দহ্নাঁ
কি ব মিয্গান শিকন্দ্
কল্বে হমা সফ শিকনাঁ।

মস্ত বগুযশ্ৎ ৱ নযর বর
মনে দরৱেশ অন্দাখ্ৎ
গুফ্ৎ এ চশ্মো চরাগে
হমা শীরীঁ সুখনাঁ।

তা কে অয সীমো যরৎ
কীসা তিহি খ্বাহদ বুদ
বন্দা-এ-মন শব ব বর্খুর
য হমা সীম্ তনাঁ।

কমতর অয যর্রা নহ্ পস্ত
মশব মোহর ববর্য
তা ব খিলবৎগহে
খুরশীদ রসী চর্খ্ যনাঁ।

পীরে পৈমানা কশে মা
কি রবানশ খুশ বাদ
গুফ্ৎ পরহেয কুন অয
সোহবতে পৈমাঁ শিকনাঁ।

দামনে দোস্ত বদস্ত
আর ব য দুশ্মন
মর্দে য়য্দাঁ শব ব ঐমন
গুযর অয অহরমনা।

বর জহাঁ তকিয়া মকুন
বর কদহে ময় দারী
শাদী-এ-যুহ্রা জবীনাঁ
খুর ব নাযুক বদনাঁ।

বা সবা দর চমনে
লালা সহর মী গুফ্তম
কি শহীদান কে অন্দ্ ইঁ
হমা খুনীঁ কফনাঁ।

গুফ্ৎ হাফিয মন-ৰ-তু
মহরমে ইঁ রায ন এম
অৰ ময়ে লাল হিকায়ৎ
কুন ৰ শীরীঁ দহনাঁ॥

২০
ইঁ খিরকা কি মন দারম
দর রহনে শরাব ঔলা।
ব ইঁ দফ্তরে বে মানা
গর্কে ময়ে নাব ঔলা!

চুঁ উম্র্তবাহ্ করদম চন্দাঁ
কি নিগহ্ করদম
দর কুন্জ্-এ খরাবাতে
উফ্তাদা খরাব ঔলা।

মন হালে দিলে শৈদা
বা খল্ক্ ন খ্ৰাহম গুফ্ৎ
ইঁ কিস্‌সা অগর গোয়ম
বা চংগো রবাব ঔলা।

তা বে সরো পা বাশদ
ঔযাঅ-এ-ফলক য ইঁসা
দর সর হবসে সাকী
দর দস্ত শরাব ঔলা।

চুঁ মসলহৎ অন্দেশী
দুরস্ত দরবেশী
হম সীনা পুর আতিশ বে
হমদীদা পুর আব ঔলা।

চুঁ পীর শৰী হাফিয
অয মেকদা বৈরূঁ শৰ
রিন্দী ব হবস নাকী
দর অহদে শবাব ঔলা ॥

২১

দোশ রফ্তেম বদরে
ময়খানা খ্ৰাব আলূদা
খিরকা তরদামন
ৰ সজ্জাদা শরাব আলূদা।

আমদ অফ্সোস কুনাঁ
মুগবচ্চা বাদা ফরোশ
গুফ্ৎ বেদার শব ঐ
রহ্রৰে খরাব আলূদা।

গুস্ত্ ব শূ কুন ৰ আঁগহ
ব খরাবাৎ খিরাম
তা ন গর্দদ তুইঁ
দৈর খরাব আলূদা।

ব হৰাএ লবে শীরীঁ
দহনাঁ চন্দ কুনী
জোহরে রূহ ব য়াকূতে
মুযাব আলূদা।

ব তহারৎ গুঁযরা মন্যিলে
পীরী ব মকুন
খল্অতে শৈব ব তশরীফে
শবাব আলূদা।

আশ্নায়ানে রহে ইশ্ক্
দর ঈঁ বহরে অমীক
গৰ্কা গশ্তন্দ ৰ ন গশ্তন্দ
বআব আলূদা।

পাক ৰ সাফী শৰ ৰ অয
চহে তবীঅৎ বদর আই
কি সফাহে ন দহদ আতে
তরাব আলূদা।

গুফ্তম ঐ জ্বানে জহাঁ
দফতরে গুল এবে নীস্ত
কি শৰদ ৰকৃতে বহার অয
ময়ে নাব আলূদা।

গুফ্ৎ হাফিয বরৌ ৰ নুকৃতা
ব য়ারাঁ মফরোশ
আহ অয ঈ লুৎফ্নৰা-এ
ইতাব আলূদা॥

২২

রফ্তম ব বাগ তা কি
ব চুনেম সহর গুলে
আমদ বগোশ নাগহম
আৰাযে বুলবুলে।

মস্কী চুঁ মন ব ইশ্কে
গুলে গশ্তা মুব্তলা
ব অন্দর চমন ফগন্দা
ব ফরিয়াদে গুলগুলে।

মী গশ্তম অন্দর আঁ
চমন ব বাগ দম ব দম
মী করদম অন্দর আঁ
গুলো বুলবুল তঅম্মুলে।

চু কর্দ্ দর দিলম
অসর আবাযে অন্দলীব
গশ্তম চুনাঁ কি হেচ
ন মানদ তহম্মুলে।

বস গুল শিগুফ্তা মী শবদ
ব ইঁ বাগরা বলে
কস বে জফা-এ-খার
ন চীদস্ত অয উ গুলে।

গুল য়ারে খায় গশ্তা ব
বুলবুল করীনে ইশ্ক্
আঁ রা তগয়্যুরে
ন ইঁ রা তগয়্যুরে।

হাফিয মদার উম্মীদে-ফর্‌খ্
অয মদারে চর্খ্
দারদ হযার ঐব
ব নদারদ তফয্যুলে॥

২৩

যাহিদে খল্‌বৎ নশীঁ
দোশ বময়খানা শুদ
অয সরে পৈমা গুযশ্ৎ
বর সরে পৈমানা শুদ।

শাহিদে অহদে শবাব
আমদা বুদশ বখ্‌ৰাব
বায ব পীরানা সর আশিক
ৰ দীৰানা শুদ ।

মুগবচ্চা মী গুযশ্‌ৎ
রাহযানে অকলোদী
দর পয়ে আঁ আশ্‌না
অয হমা বেগানা শুদ ।

আতিশে রুখ্‌সারে গুল
খিরমনে বুলবুল ব সোখ্‌ৎ
চেহরা-এ-খঁন্দানে শমৃআ
আফতে পরৰানা শুদ ।

সুফী-এ মজলিস কি দী
জামো কদহ মী শিকস্ত
দোশ ব-ইক-জুর্‌রা-এ-ময়
আকিল ৰ ফরযানা শুদ ।

নর্গিসে বচকী সাকী বে খানদ
আয়তে অফসুঁ গরী
হল্কা-এ-ৰরাদে মা
গর্দিশে পৈমানা শুদ ।

মন্‌যিলে হাফিয কনূঁ
বারগহে কিব্রিইয়াস্ত্‌
দিল্‌ বরে দিলদার রফ্‌ৎ
জাঁ বরে জানানা শুদ ॥

২৪

দর খরাবাতে মুগাঁ
নূরে খুদা মীবীনেম
ব ঈঁ অজব বীঁ চি
নূরে য কুজা মীবীনেম।

জল্ৱা বর মন মফরোশ
ঐ মলিকুলহাজ কি তু
খানা মীবীনী ব মন
খানা-এ খুদা মীবীনেম।

খ্ৱাহম্ অয যুল্‌ফে
বুতাঁ নাফা কুশাঈ কর্দন
ফিক্‌রে দুরস্ত্ হমানা
কি খতা মীবীনেম।

সোযে দিল্ অশ্‌কে রৱাঁ
আহে সহর নালা-এ-শব
ঈঁ হমা অয অস্‌রে
লুৎফে শুমা মীবীনেম।

হরদম অয রূ-এ-তু
নক্‌শে যনদম রাহে খয়াল
বা কে গোয়ম কি দরীঁ
পর্দা চিহা মীবীনেম।

কস নদীদস্ত্ য মুশ্‌কে
খতন ব নাফা-এ-চীঁ
আঁ চি মন হর সহর
অয বাদে সবা মীবীনেম

দোস্তাঁ ঐবে-নযরবাযী-
এ-হাফিয মকুন
কি মন উরা অয
মুহব্বানে খুদা মীবীনেম ॥

২৫

স্বাদে দীদা-এ-মন শুদ
য আবে চশ্‌ম বিয়ায
হনোয চন্দ নিগারা
য মন কুনী ঐরায ।

বয়া কিনার বগীরেম
ব আস্তী বকুনেম
গুযশ্‌তা য়াদ চি আরী
মযা মযা মামায

চি তেযীস্ত্ বগম্‌যা-
এ-চশ্‌মে উঁ য়ারব
বুরীদ জামা-এ-তকবা
ব গম্‌যা চুঁ মিক্রায ।

চুঁ অক্‌সে যুল্‌ফো রুখৎ
দরমিয়ানে চশ্‌ম উফ্‌তাদ
গিরফ্‌ৎ দীদা-এ-মর্দম
অয আঁ স্বদো বিয়াজ ।

গযল বকাফিয়া-এ-যাদ
না আয়দ হাফিয
মগর হম অয তু
বআয়দ তবীয়তে ফয়য়ায ॥

২৬

গুফ্‌তম কেম দহানো
লবৎ কামরাঁ কুনন্দ
গুফ্‌তা বচশ্‌ম হরচি
তুগোঈ হমা কুনন্দ।

গুফ্‌তম খিরাযে মিস্‌র্
তলব মীকুনন্দ লবৎ
গুফ্‌তা দরীঁ মুআমলা
কমতর যিয়াঁ কুনন্দ।

গুফ্‌তম বনুক্‌তা-এ-দহনৎ
খুদ কি বুর্দ রাহ
গুফ্‌তা ঈঁ হিকায়তস্ত্‌ কি
বা নুক্‌তাদাঁ কুনন্দ।

গুফ্‌তম সনম পরস্ত্‌
মশৱ বা সমদ নশীঁ
গুফ্‌তা বকু-এ-ঈশ্‌ক্‌
হম ইঁ ব হম আঁ কুনন্দ।

গুফ্‌তম হৱা-এ-ময়কদা
গম মীবুর্দ য দিল্‌
গুফ্‌তা খুশ আঁ কসাঁ কি
দিলে শাদমাঁ কুনন্দ।

গুফ্‌তম শরাবো খিরকা
ন আইনে মযহবস্ত্‌
গুফ্‌তা ঈঁ অমল ব মযহবে
পীরে মুগাঁ কুনন্দ।

গুফ্তম য লালে নোশ
লবাঁ পীর্রা চি শৰদ
গুফ্তা ব বোসা-এ
শক্করীনশ জবাঁ কুনন্দ ।

গুফ্তম কি খ্ৰাজা কে
বসরে হুজ্লা মীরৰদ
গুফ্ৎ আঁ যমাঁ কি মুশ্তরী
ৰ মাহ করীঁ কুনন্দ ।

গুফ্তম দুআ-এ-দৌলতে
তু ৰির্দে হাফিযস্ত্
গুফ্ৎ ঈঁ দুআ মলায়কে
হফ্ৎ আস্মাঁ কুনন্দ ॥

২৭
সাকী হদীসে সরো
গুলো-লালা মীরৰদ
ৰ ঈঁ বহস বা সলাসা
গস্সালা মীরৰদ ।

ময় দহ্ কি নো অরুসে
চমন হদ্দে হুস্ন্ য়াফ্ৎ
কারে ঈঁ যমাঁ য সন্অতে
দল্লালা মীরৰদ ।

শক্কর শিকন শৰন্দ
হমা তুতীয়ানে হিন্দ
য ঈঁ কন্দে পারসী কি
ব বঙ্গালা মীরৰদ ।

বাদে বহার মীৰরযদ
অয বোস্তানে শাহ
ৰ য যালা বাদা দর
কদহে লালা মীরৰদ।

আঁ চশ্মে-যাদুৰানা
আবিদ ফরেব বীঁ
কশ কারৰানে সহর
বদুম্বালা মীরৰদ।

খী কর্দা মীখিরামদ
ৰ বর আরিযে সমন
অয শর্মে রূ-এ-উ অর্ক্
অয যালা মীরৰদ।

ঐমন মশৰ য ইশ্ক্-এ
দুনিয়া কি ঈঁ অযূয
মক্কারা মীনশীনদ
ৰ মুহ্তালা মীরৰদ।

চুঁ সামরী মবাশ কি
যর দাদ অয খরে
মুসা বহুশ্ৎ ব অয
পএ-গৌসালা মীরৰদ।

হাফিয য শৌকে মজলিসে
সুল্তাঁ গিয়াসুদ্দীন
খামশ মশব কি কারে
তু অয নালা মীরৰদ॥

কঁনূ কি দর চমন আমদ
গুল অয আদম বৰযূদ
বনফ্‌শা দর কাদমে-উ
নিহাদ সর বসযূদ ।

বনোশ যামে স্বুহী
ব নালা-ৰ-দফ-ৰ-চঙ্গ্‌
ববোস গবগবে সাকী
বনগ্‌মা-এ নৈ-ৰ-উদ ।

ব বাগ তযা কুন
আঈনে দীনে যরদুশ্‌ৎ
কঁনূ কি লালা বর
অফরোখ্‌ৎ অতিশে নমৃরূদ ।

য দস্তে শাহিদে সীমীঁ
ইযার ঈসাদম
শরাব নোশ ৰ রিহা কুন
কিস্‌সা-এ-আদ-ৰ-সমূদ ।

যহাঁ চুঁ খুল্‌দে বঁরী শুদ
বদৌরে সোসন-ৰ-গুল
ৰলে চি সূদ কি দর বে
ন মুমকিনস্ত্‌ খলূদ ।

শুদ অয ফরোগে রিয়াহীঁ
চুঁ আস্‌মাঁ গুলশন
য এমনে-অখ্‌তরে মৈমুন
ৰ তালেঅ মস্‌উদ ।

চু গুল সব্বার শব্বদ
বর হব্ব-এ-স্থলেমাঁ ব্বার
সহরগহ মুর্গ দর
আয়দ বনগ্মা-এ-দাউদ

বদোরে-গুল মনশীঁ বে
শরাব-ব্ব-শাহিদ-ব্ব-চঙ্গ্
কি হম্‌চু দৌরে-বকা
হফ্‌তা বুদ মাদুদ।

বয়ার যামে লবালব
বয়াদে আসিফে অহদ
ব্ব যেরে মুল্‌কে স্থলেমাঁ
ইমাদে দীঁ মহ্‌মুদ।

বুদ কি মজলিসে হাফিয
বৈমুনে তরবীয়তশ্
হর আঁ চি মী তলবদ
জমুলা বাশদশ মৌজ্বুদ॥

২৯
বুলবুলে বর্গে গুলে খুশরঙ্গ্
দর মিন্‌কার দাশ্‌ৎ
ব্ব অন্দর আঁ বর্গো নব্বা খুশ
নালহা-এ যার দাশ্‌ৎ।

গুফ্‌তমশ দর ঐন ফস্‌লে
ঈঁ নালা-ব্ব-ফরিয়াদ চীস্ত্
গুফ্‌ৎ মারা জল্‌ব্বা-এ-মাশুক
দরীঁ কার দাশ্‌ৎ।

য়ার গর ননিশস্ত্ বা মা
নীস্ত্ যা-এ-এতরায
পাদশাহে কামরাঁ বূদ
অয গদায়াঁ আর দাশ্ৎ

আরিফে কু সৈর কর্দ
অন্দর মকামে নেস্তী
মস্ত্ শুদ চুঁ মস্তে অয
আলমে অস্রার দাশ্ৎ।

দর নমী গীরদ নিরায-ৰ
ইজ্য-এ মা বা হুস্নে দোস্ত্
খুর্রম আঁ কি য নাযনীনাঁ
বখ্তে বরখুরদার দাশ্ৎ।

খেয তা বর কিল্কে আঁ
নকক্বাশ যাঁ অফশাঁ কুনেম
কীঁ হমা নক্শে অজব দর
গর্দিশে পরকার দাশ্ৎ।

গর মুরীদে রাহে ইশ্কী
ফিক্রে বদনামী মকুন
শৈখে সন্র্আঁ খিরকা রহ্নে
খানা-এ-খুম্মার দাশ্ৎ।

বক্তে আঁ শীরীঁ কলন্দর
খুশ কি দর অৎৰারে সৈর
যিক্রে তস্বীহে মলক দর
হল্কা-এ-যুন্নার দাশ্ৎ।

চশ্‌মে হাফিয যেরে বামে
কস্‌রে আঁ হুরী সিরশ্‌ৎ
শেৰা-এ-যিন্নাতে তয়রী
এ-তহতহা উল্লা নিহার দাশ্‌ৎ ॥

৩০

খুশ শিরায ৰ বযঅ
এ-বে মিসালশ
খুদাৰন্দা নিগহদার
অয যৰালশ।

য রুক্‌নাবাদে মা
সদ লৌহশ উল্লাহ
কি উম্রে খিয্‌র্‌
মীবখ্‌শদ যুলালশ।

মিয়ানে যাফরাবাদ
ৰ মুসল্লা
অবীর আমেয
মীআয়দ শুমালশ।

বশীরায আই ৰ
ফৈযে-রুহে-কুদ্‌স্‌
বখ্‌ৰা অয মর্দমে
সাহিব ফমালশ।

কে নামে কন্দে মিস্রী
বুর্দ আঁ যা
কি শীরীনাঁ নদাদন্দ
ইন্‌ফাঅলশ।

সবা য আঁ লুলী
এ শনৃগুলে সরমসৎ
চি দারী আগ্রহী
চুনস্ত হালশ।

মকুন বেদার অয ইঁ
খ্ৰাবম খুদারা
কি দারম হসরতে
খুশ খ্য়ালশ।

গর আঁ শীরীঁ পিসর
খুনম বরেযদ
দিলা চুঁ শীরে
মা দর কুন হলালশ।

চিরা হাফিয চু
মী তরসীদী অয হিয্ৰ্
ন কর্দী শুক্রে
অয়্য়ামে ৰিসালশ॥

৩১
দিগর য শাখে সৰ-এ-সহী
বুলবুলে সবুর
গুল বাঁগ যদ কি চশ্মে বদ
অয রু-এ-গুল বদ্দুর।

অয় গুল্ বশুক্রে আঁ কি
শিগুফ্তী বকামে দিল
বা বুলবুলানে বেদিলে শৈদা
মকুন গুরূর।

অয দস্তে গৈবতে তু
শিকায়ৎ নমী কুনম
তা নীস্ত্ গৈবতে
নদহদ লয্যতে হুযুর ।

যাহিদা গর বহুরো কস্থর
অস্ত্ উম্মীদবার
মারা শরাবখানা
কস্থরস্ত্ ব য়ার হুর ।

গর দীগরাঁ ব ঐশো-তরব
খুর্রমন্দ ব শাদ
মারা গমে নিগার বুদ
মায়া-এ-স্থরুর ।

ময় খুর বয় বঁঙ্গে চঙ্গ্
ব মখুর গুস্সা বর কসে
গোয়দ তুরা কি বাদা মখুর
গো হু উল্ গফুর ।

হাফিয শিকায়ৎ অয
গমে হিজ্রাঁ কি মীকুনী
দর হিজ্র্ বস্ল্ বাশদ
ব দর যুল্মস্ত নুর ॥

৩২

হাতি ফে অয গোশা-
এ-ময়খানা দোশ
গুফ্ৎ ববখ্শবদ
গুনাহ ময়বনোশ ।

অফ্‌বে ইলাহী
বকুনন্দ কারে খেশ
মুয্‌দা-এ-রহমত
বরসানদ সরোশ।

ই খির্দৈ খাম
বময়খানা বর
তা ময়ে লাল
আবর্দশ খুঁ বজোশ

গর্‌চে বিসালশ ন
ব কোশিশ দহন্দ
হর কদর অয় দিল
কি তবানী বকোশ।

অফ্‌বে খুদা বেশতর
অয জুর্মে মাস্ত্‌
নুকৃতা-এ-সরবস্‌তা
চি গৌঈ খমোশ।

গোশে মন ব হল্‌কা
এ-গেসু-এ-য়ার
রূ-এ-মন ব খাকে
দরে মরফরোশ।

রিন্দী-এ-হাফিয ন
গুনহেস্ত্‌ সৈব
বা করমে পাদশহে
ঐবপোশ॥

৩৩

সহর চু বুলবুলে বেদিল
দমে শুদম দর বাগ
কি তা চু বুলবুলে বেদিল
কুনম ইলাজে দিমাগ।

বচেহ্রা-এ-গুলে সুরী
নিগাহ মীর্কদম
কি বুদ দর শব তারে
বরৌশনী চু চিরাগ।

চুনাঁ বহুস্নো জবানী-এ-
খেশতন মগরূর
কি দাশ্ৎ অয দিলে বুলবুল
হযারগুনা ফরাগ।

কুশাদা নর্গিসে রানা
বহসদ অবে অয চশ্ম্
নিহাদা লালা-এ-হমরা
বজানো দিল সদ দাগ।

জুঁবা কশীদা চু তেগে
বসর য়নশ সোসন
দহাঁ কুশাদা শকায়ক
চু মর্দমানে নবাগ।

একে চু বাদা পরস্তাঁ
সুরাহী অন্দর দস্ত
একে চু সাকী-এ-মস্তাঁ
বকফ গিরফ্তা অয়াগ।

নিশাতো-ঐশে-জবানী
চু গুল গনীমৎ দার
কি হাফিয ববুদ বর
রস্থল গৈর বলাগ ॥

৩৪

হযার দুশ্‌মনম অর
মী কুনন্দ কসদে হলাক
গরম তু দোস্তী অয
দুশ্‌মনাঁ ন দদারম বাক।

মরা উম্মীদে ৰিসালে-তু
যিন্দা মীদারদ
বগরনা হরদমম অয
হিজ্‌রতস্ত বীমে হলাক।

নফস নফস অগর অয
বাদ নশুনূম বুয়ৎ
যমাঁ যমাঁ কুনম অয গম
চু গুল গরেবাঁ চাক।

রৰদ ৰখ্‌বার দো চশ্‌ম্‌
অয খয়ালে তু হেয়াৎ
বুদ সবুর দিল অন্দর
ফিরাকে তু হাশাক।

অগর তু যখ্‌ম্‌ যনী
বে কি দিগরে মরহম
ব গর তু যহ্‌র দহী
বে কি দিগরে তিরয়াক।

তুরা চুনাঁ কি তুই
হর নযর কুজা বীনদ
ব কদ্রে বীনশে খুদ
হর কসে কুনদ ইদ্রাক।

ইনাঁ ন পেচম অগর
মী যনী ব শমশীরেম
সুপর কুনম সর বদস্তৎ
নদারম অয ফিৎরাক।

ব চশ্মে খল্ক অযীয আঁ
গহে শবী হাফিয
কি বদরশ বনিহী
রূ-এ-মিস্কনৎ বর খাক॥

৩৫

রোযে বস্লে দোস্ত্ দারাঁ য়াদবাদ
য়াদ বাদ আঁ রোযগারাঁ য়াদবাদ

কামম অয তলখী-এ-গম চূঁ বহর গশ্ৎ
বাঁগে নোশে বাদাখারাঁ য়াদবাদ।

গরচি য়ারাঁ ফারিগন্দ অয য়াদে মন
অয মন ঐশাঁ রা হযারাঁ য়াদবাদ।

মব্তলা গশ্তম দরীঁ দাম-এ-বলা
কোশিশে আঁ হক গুযারাঁ য়াদবাদ।

গরচি সদ রুবদস্ত্ দর চশ্মম্ রবাঁ
জিন্দা রুবদ-এ বাগকারাঁ য়াদবাদ।

যআঁ সারে যুল্‌ফো রুখে গুল্‌ফামে উ
রোযো শব ঐ গুল্‌ইযারাঁ য়াদবাদ।

ঈঁ যমাঁ দর কস বফাদারী নমানদ
য আঁ বফাদারাঁ ব য়ারাঁ য়াদবাদ।

মন কি দর তদ্‌বীরে গম বেচারা অম
চারা-এ-আঁ গমগুসারাঁ য়াদবাদ।

রাযে হাফিয বাদ অয ঈঁ নাগুফ্‌তা বে
ঐ দরেগ অয রাযদারাঁ য়াদবাদ॥

৩৬

মুয্‌দা অয় দিল
মসীহা নফসে মীআয়দ
কি য অনফাসে খুশশ
বু-এ-কসে মীআয়দ।

অয গমো দর্দ মকুন
নালা ব ফরিয়াদ কি দোশ
যদাঅম ফালে ব
ফরিয়াদ রসে মীআয়দ।

য আতিশে বাদী
এ-ঐমন ন মনম্‌ খুর্‌রম কি বস
মুসা ই জা বা উম্মীদে
কব্‌সে মীআয়দ।

হেচকস নীস্ত্‌ কি দর
কু-এ-ৎ অশকারে নীস্ত্‌
হরকস ই জা বা উম্মীদে
হবসে মীআয়দ।

কস নদানস্ত্ কি মন্‌যিল
গহে মকসুদ কুজাস্ত্
ঈ কদর হস্ত্ কি
আৰাযে জরসে মীআয়দ।

জর্‌রা দহ কি বময়খানা
এ-অরবাব-এ-করম
হর হরীফে য পয়ে
মুল্‌তমসে মীআয়দ।

খবরে বুলবুলে ঈ বাগ
মপুরসীদ কি মন
নালা-এ-মী শন্‌ম
কয কফসে মীআয়দ।

য়ার দারদ সরে সৈদে
দিলে হাফিয য়ারাঁ
শাহবাযে বশিকারে
মগসে মীআয়দ॥

৩৭
ঐশম মুদামস্ত্
অয লালে দিলখাহ
কারম বকামস্ত্
অলহমদুল্লাহ।

অয় বখ্‌তে-সরকশ
তংগশ ববরকশ
কি জামে যরকশ
গহ লালে দিলখাহ।

মারা বমস্তী অফসানা
কর্দন্দ
পীরানে জাহিল শৈখানে
গুমরাহ ।

অয কৌলে যাহিদ
কর্দেম তৌবা
ৰ য ফালে আবিদ
অস্‌তকাফুরল্লাহ ।

জানা চি গোয়ম
শিরহে ফুরাকত
চশ্‌মে ৰ সদনম
জানে ৰ সদ আহ ।

কাফির মবীনাদ ঈঁ
গম কি দীদাস্ত্‌
'অয কামতে সর্ৰ
অয আরিযতে মাহ

অয সহ্‌রে আশিক
খুশতর ন বাশদ
সব্‌র্‌ অয খুদা খুৰাহ
সব্‌র্‌ অয খুদা খৰাহ ।

দিল্‌কে মুলম্মা
যুন্নারে বা হস্ত
সুফী নদানদ ঈঁ
রস্‌মো ঈঁ রাহ ।

শৌকে রুখৎ বুর্দ
অয য়াদে হাফিয
ৰির্দে শবানা
ৰির্সে সহরগাহ ॥

৩৮
গর যুল্‌ফে পরেশানৎ
দর দস্তে সবা উফ্‌তদ
হর জা কি দিলে বাশদ
বরবাদে হৰা উফ্‌তদ ।

মা কশ্‌তী-এ-সব্রে
খুদ দর বহরে গম আফ্‌গন্দম
তা আখির অযীঁ তুফাঁ
হর তখ্‌তা কুজা উফ্‌তদ ।

হর কস বতমন্না-এ-ফাল
অয রুখে তূ গীরদ
বর তখ্‌তা-এ-ফীরোযী
তা কুর্‌আ কিরা উফ্‌তদ ।

আঁ বাদা কি দিল্‌হারা
অয গম দহদ আযাদী
পুর খুনে জিগর গর্দদ
চুঁ জাম বমা উফ্‌তদ ।

গর যুল্‌ফে সিয়াহৎরা
মন মুশ্‌কে খতন গুফ্‌তম
দর তাব মশৰ জানাঁ দর
গুফ্‌তা খতা উফ্‌তদ ।

হালে দিলে হাফিয শুদ
অয দস্তে হৃযরত
চুঁ আশিকে সর গর্দাঁ
কয দোস্ত্ জুদা উফ্তদ

৩৯

ইশ্কে তু নিহালে হৈরৎ আমদ
ৰস্লে তু কমালে হৈরৎ আমদ।

বস গর্কা-এ-হালে ৰস্ল্ কি আখির
হম বাসরে হালে হৈরৎ আমদ

ন ৰস্ল্ বমানদ ৰ ন ৰাসিল
আঁ জা কি খয়ালে হৈরৎ আমদ।

আঁ দিল্ বনুমা কি দর রহে উ
বর চেহরা ন খালে হৈরৎ আমদ।

শুদ মহতরম অয কমালে ইয্যৎ
আঁ জা কি জলালে হৈরৎ আমদ।

সর তা কদম্ বজূদে হাফিয
দর ইশ্কে নিহালে হৈরৎ আমদ॥

৪০

নসীমে-সুব্হ সআদত
বগাঁ নিশাঁ কি তু দানী
খবর বকু-এ ফুলাঁ বর
বদাঁ জুবাঁ কি তু দানী।

তু পীকে হযরতে শাহী
মুরাদ ব দীদা বরাহত
করম নুমা ব বফরমা
খবর চুনাঁ কি তু দানী।

বগো কি জানে-যঈফম
য দস্‌ত রফ্‌ত খুদারা
য লালে-রূহে-ফযায়ত
ববখ্‌শ্‌ অযাঁ কি তু দানী।

মন ঈঁদো হর্ফ নবশ্‌তম
চুনাঁ কি গৈর নদানস্‌ত
তু হম য রূ-এ-করামত
চুনাঁ বখাঁ কি তু দানী।

খয়ালে-তেগে-তু বা মন
হদীসে-তশ্‌না ব-আবস্‌ত
অসীরে ইশ্‌ক চু ফর্দী
বকোশ চুনাঁ কি তু দানী।

উম্মীদে দর কমরে-যর
কশত চিগুনা ববদেম
দকীকা অস্‌ত নিগারা
দরাঁ মিয়াঁ কি তু দানী।

একেস্‌ত তুর্কী ব তাযী
দরীঁ মুআমলা হাফিয
হদীসে ইশ্‌ক বফঁকুন
বহর জুবাঁ কি তুঁ দানী॥

৪১

অয় কি দারম বখেশ মগরূরী
গর তুরা ইশ্‌ক্ নীস্ত্‌ মাযূরী।

গির্দে দীৱানগানে ইশ্‌ক্ মগর্দ
কি বঅক্লে অকীলা মশ্‌হুরী।

মস্তী-এ-ইশ্‌ক্ নীস্ত্‌ দর সরে তু
রৌ কি তু মস্তে আবে অঙ্গুরী।

রু-এ জর্দস্ত্‌ ৱ গাহে দর্দ আলুদ
আশিকাঁরা গৱাহে রনূজুরী।

বগুযর অয নঙ্গ-ৱ নামে খুদ হাফিয
সাগরে ময় তলব কি মখ্‌মুরী॥

৪২

বুতা বা মা গুযার ঈঁ কীনা দারী
কি হকে সোহ্‌বতে দৈরীনা দারী।

নসীহৎ গোশ কুন কীঁ দুর্‌র্‌ বসে বে
অয আঁ গৌহর কি গন্‌জীনা দারী।

ৱ লেকিন কে নুমাই বরিন্দাঁ
তু কি য খুরশীদো মহ আঈনা দারী।

বদে-রিন্দাঁ মগো ঐ শৈখ হুশদার
কি বা হুকমে খুদাএ কীনা দারী।

ন মী তরসী য আহে আতিশ নেম
তু দানী খিরকা-এ-পশমীনা দারী।

ব ফরিয়াদে খুমারে মুফলিসাঁ বস
খুদারা গর মেয় দোশীনা দারী।

ন দীদম খুশতর অয শেরে-তু হাফিয
ব কুর্‌রানে কি অন্দর সীনা দারী ॥

৪৩

সহরগাহে কি মখ্‌মূরে শবানা
গিরফ্‌তম বাদা বা চঙ্গো চগানা।

নিহাদম অক্‌ল্‌রা জাদে রহ অয মেয়
য শহরে হস্‌তীশ কর্দম্‌ রৱানা।

নিগায়ে ময়ফরোশম্‌ ইশ্‌ৱা দাদ
কি ঐমন গশ্‌তম্‌ অয মক্রে যমানা।

য সাকী-এ-কমাঁ অব্রূ শুনীদম
কি ঐ তীরে-মলামৎ রা নিশানা।

ন বন্দী য আঁ মিয়াঁ তর্‌ফে কমরৱার
অগর খুদ্‌রা ববীনী দর মিয়ানা।

বরৌ ঈঁ দাম বর মুর্গে দিগরনা
কি অন্‌কা রা দূরস্ত্‌ আশিয়ানা।

নদীমো-মুত্রিবো-সাকী হমা উস্ত্‌
খয়ালে-আবো গিল দর রহ বহানা।

কি বন্দদ তর্‌ফে-ৱস্‌ল্‌ অয হুস্‌নেশাহে
কি বা খুদ ইশ্‌ক্‌ ৱর্জদ জাৱেদানা।

বদহ কিশ্তী-এ-ময় তা খুশ্ বরআরেম
অয ঈঁ দরিয়া-এ-না পৈদা কিরানা।

সরা খালীস্ত্ অয বেগানা ময়নোশ
কি বুদ জুয তূ ঐ মর্দে য়গানা।

ৰজ্‌দে-মা যুঅম্মা য়েস্ত্ হাফিয
কি তহকীকশ্ ফস্যূনস্ত ৰ ফসানা॥

৪৪
দোস্তাঁ ৰকৃতে গুল আঁ
বে কি বইশ্রৎ কোশেম
স্থখনে পীরে মুগানস্ত্
বয়াঁ ময় নোশেম।

নীস্ত্ দর কস করম ৰ
বফ্তে তরব মীগুযরদ
চারা আনস্ত্ কি
সজ্জাদা বময় ফরোশেম।

খুশ হৰা-অস্ত্ ফরুখ
বখ্শ্ খুদায়া বফরস্ত্
নাজনীনে কি বরুয়শ
ময়ে গুলগুঁ নোশেম।

অর্গনূঁ সায ফলক
রহযনে অহ্লে হুনরস্ত্
চুঁ অযীঁ গুস্সা ননালেম
ৰ চিরা বখরোশেম।

গুল বজোশ আমদ
ব অয ময় ন যদেমশ আহে
লাজ্জিরম য
আতিশে হিরমানে হৰস মীজোশেম ।

মীকশেম অয কদহে
বাদা শরাবে মৌহুম
চশ্মে বদ দুর কি বে ময়
ৰ মুতরিব দর জোশেম।

হাফিয ই হালে অজব
বা কে গুফ্ত কি মা
বুলবুলাঁনেম কি দর
মোসমে গুল খামোশেম।

৪৫

(১)

অলা ঐ আহূ-এ-ৰহ্শী কুজাঈ
মরা বা তুস্ত্ বিস্য়ার আশ্নাঈ।

দো তনূহা ৰ দো সরগর্দানে বেকস
দো রাহ অন্দর কমীঁ অয পেশো অযপস।

বয়া তা হালে য়ক দীগর ববীনেম
যমানে পেশে-য়ক দীগর নশীনেম।

হদীসে-দর্দে-দুরী রা নখানেম
মুরাদে হম বজোয়েম অর তৰানেম।

কি মীবীনেম দরীঁ দশ্ৎ মশব্ৰশ
চরাগাহে নদারম খুর্‌রম ৰ খুশ।

মগর খিযরে মুবারক পৈ দর আয়দ
য ঐমন হিম্মতশ্ ঈঁ রহ্ সর আয়দ ॥

(২)

মগর ৰখ্তে আতা পরৰৰ্দন আমদ
কি ফালম লা তযরনী ফর্দন আমদ।

কি রোযে রাহ্রাবে দর সরযমিনে
হমি গুফ্ৎ ঈঁ মুঅম্মা বা করীনে।

কি অয় সালিক চি দর অম্বানা দারী
বয়া দামে বন্হ গর দানা দারী।

জবাবশ্ দার ৰ গুফ্ৎ দানা দারম
ৰলে সৈ মুর্গ মী বায়দ শিকারম।

বগুফ্তা চূঁ বদশ্ৎ আরী নিশানশ্
কি অয মা বে নিশানস্ত্ আশিয়ানশ্।

বগুফ্তা গর্চে ঈঁ অম্রে-মুহালস্ত্
ৰ লেকিন নাউম্মিদী হম ৰবালস্ত্ ॥

(৩)

নকর্দ আঁ হম্দমে দৈরীঁ মুদারা
মুসলমানাঁ মুসলমানাঁ খুদারা।

চুনাঁ পেরহন যদ তেগে জুদাই
কি গোঈ খুদ নবূদাস্ত্ আশ্নাঈ।

বরফ্ৎ ৰ তব্অ-এ-খুশবাশম হযীঁ কর্দ
বিরাদর বা বিরাদর চুনীঁ কর্দ।

অগর খিয্‌রে মুবারক পৈ তৰানদ
কি ঈঁ তন্‌হা বা তন্‌হা রসানদ ॥

(৪)

চুঁ আঁ সর্ৱে-রৱাঁ শুদ কারৱানী
বগুফ্‌তা সব্‌র্‌ কুন তা মী তৰানী।

মদহ্ জামে ময় ৰ পা-এ-গুল অয দস্ত্‌
ৰলে গাফিল মশৰ অয চর্খে বদমস্ত্‌।

লব সর চশ্‌মা ৰ বর তরফে জূএ।
নম অশ্‌কে ৰ বা খুদ গুফ্‌ৎগূএ।

ব য়াদে রফ্‌তগাঁ ৰ দোস্তদারাঁ
তৰাফুক কুন তূ বা অব্রে বহারাঁ।

চুঁ মন মাহে কিল্‌ক্‌ আরম বতহরীর
তূ অয নূর ৰ অলকলম মী পুরস তফসীর।

রৱাঁরা বাখিরদ দর হম শিরশ্‌তন্দ
ৰ য আঁ তুখ্‌মে কি হাসিল বূদ কিশ্‌তন্দ।

বয়াবর নক্‌হতে যআঁ তীবে উম্মীদ
মশামে জাঁ মুঅৎতর সায জাৰেদ।

কি ঈঁ নাফা য চীনে যুল্‌ফে হূরস্ত্‌
ন য আঁ আহূ কি অয মর্দুম নিথ্‌রস্ত ॥

৪৬

দর্দে ইশ্‌কে কশীদা
অম কি মপুরস

যহরে হিজরে চশীদা
অম কি মপুরস।

গশ্‌তা অম দর
জহান ব আখিরকার
দিল্‌বরে বরগুযীদা
অম কি মপুরস।

আঁ চুনাঁ দর হৰা
এ-খাকে দরশ
মীরৰন্দ আবে
দীদা-অম কি মপুরস

বে তুর দর কুল্‌বা
-এ গদাই-এ-খেশ
রঞ্জ্‌হা-এ-কশীদা
অম কি মপুরস।

মন বগোশে খুদ
অয দহানশ দোশ
সুখনানে শুনীদা
অম কি মপুরস।

সু-এ-মন লব চি
মীগুযী কি মীগোঈ
লবে লালে গুযীদা
অম কি মপুরস।

হম চু হাফিয গরীব
দর রহে ইশ্‌ক্‌

ব মকামে রসীদা
অম কি মপুরস ॥

৪৭

দমে বা গম বসব বুর্দন
জহাঁ য়কসর নমী অরযদ
ব ময় ফরোশ দিল্‌কে মা
কি য ঈঁ বেহ্‌তর নমী অরযদ ।

বকু-এ-ময়ফরোশানশ
ব জামে ময় বর নমী গীরন্দ
যহে সজ্‌জাদা-এ-তকৱা
কি য়ক সাগর নমী অরযদ ।

শিকোহে-তাজে-সুল্‌তানী
বীমে জাঁ দর উ দর্যস্ত্‌
কুলাহে দিল্‌কশস্ত্‌
অমা বদর্দে সর নমী অরযদ ।

রকীবম সর যনশ্‌হা কর্দ
কযীঁ বাব সর বর তাব
চি উফ্‌তাদ ঈঁ সরে মারা
কি খাকে দর নমী অরযদ ।

তুরা আঁ বে কি রু-এ-খুদ
য মুশ্‌তাকাঁ বপোশানী
কি সৌদা-এ জহাঁদারী
গমে লশ্‌কর নমী অরযদ ।

দয়ারো য়ার মর্হুম রা
মুকয়্যদ মীকুনন্দ বরনা

চি জা-এ-পারস ক ঈঁ
মেহনত জহাঁ য়কসর নমী অরযদ।

বস আসাঁ মীনমুদ অব্বল
গমে দরিয়া ব রু-এ-সুদ
গলৎ গুফ্তম কি হর মৌজশ
হসদ গৌহর নমী অরযদ।

ব রৌ গঞ্জে কনাঅৎ জু
কুঞ্জে আফিয়ত বনশীঁ
কি য়কদম তঙ্গ্দিল বুদন
ব বহ্রো বর নমী অরযদ।

চুঁ হাফিয দর কনাঅৎ কোশ
ব অয দুনিয়া-এ-দুঁ বগুযর
কি য়ক জো-এ-মঙ্গ্তে দো নাঁ
বসদ মন যর নমী অরযদ ॥

৪৮
সবা অগর গুযরে উফ্তদ
ব কিশ্বরে দোস্ত্
বয়ায় নফ্হ-অয গেসু-এ-
মুঅম্বরে দোস্ত্।

বজানে উ কি বশুক্রানা
জাঁ বর অফশানম
অগর বসু-এ-মন আরী
পয়া মে অয বরে দোস্ত্।

ব গর চুনাঁ চে দর আঁ হযরতৎ
ন বাশদ বার

বরাএ দীদা বয়াৰর গুবারে
অয দরে দোস্ত্

মনে গদা ৰ তম্‌মনা-এ-
ৰস্‌লে উ হেহাত
মগর বখ্‌ৰার ববীনম জমালো
মঁন্‌য্‌রে দোস্ত্ ।

দিলে সনোবরেম হমচু
বেদ লরযাঁস্ত্
য হসরতে কদো বালা-এ চুঁ
সনোবরে দোস্ত্ ।

অগরচে দোস্ত্ বচীযে
নমী খিরদ মারা
বআলমে নফরোশেম
ম-এ-অয-সরে দোস্ত্ ।

চি উয্‌র্‌হা য সগে কু-এ-তু
ত‌ৰানম খাস্ত্
অগর শবে বতৰানম
বুদ বর দরে দোস্ত্ ।

চি বাশদ অর শৰদ অয
কৈদে-গম দিলশ আযাদ
চু হস্ত্ হাফিয-এ মসকীন
গুলামো চাকরে দোস্ত ॥

৪৯

মরহবা তাইরে ফুরুখ রুখ
ফুরখন্দা পয়াম

খৈর মকদম চি খবর
য়ার কুজা রাহ কুদাম।

য়া রব ঈঁ কাফিলা রা
লুৎফে অযল বদর্কা বাদ
কি অয উঁ খসম বদাম
আয়দ ব মাশুকা বকাম।

মাজরা-এ-মন-ব মাশুক
মরা পায়াঁ নীস্ত্
হর চি আগায নদারদ
ন পযীরদ অঞ্জাম।

গুল য হদ বুর্দ তন্অম
য করম রুখ বনুমায়
সরো মী নাযদ ব খুশ নীস্ত্
খুদারা বখিরাম।

মুর্গে রুহম কি হমী যদ
য সরে সিদ্‌রা সফীর
আকবত দানা-এ-খালে তু
ফগন্দশ দর দাম।

যুল্‌ফে দিল্‌দার চু যুন্নার
হমী ফরমায়দ
বরো ঐ শৈখ কি শুদ
বর তনম্ ঈঁ খিরকা হরাম

হাফিয অর মীলে বার রু-এ-তু
দারদ শায়দ

জা-এ দর গোশা-এ-মহরাব
কুনন্দ অহলে কলাম ॥

৫০
গুফ্তম কি খতা করদী
ব তদ্‌বীর ন ই বুদ
গুফ্তা চি তবা কর্দ
কি তক্‌দীর চুনীঁ বুদ।

গুফ্তম কি খুদা দাদ
মুরাদত ব বিসালশ
গুফ্তা কি মুরাদম
ব বিসালশ ন হমী বুদ

গুফ্তম কি করীনে বদত
অফগন্দ বদীঁ রোয
গুফ্তা কি মরা বখ্তে
বদে খেশ করীঁ বুদ।

গুফ্তম য মন ঐ মাহ
চিরা মেহর বুরীদী
গুফ্তা কি ফলক বা মনে বদ
মেহর বকীঁ বুদ।

গুফ্তম কি বসে জামে তরব
খুরদী অযিঁ পেশ
গুফ্তা কি শিফা দর কদহে
বায পসীঁ বুদ।

গুফ্তম কি বসে খতে জফা
বর তু কশীদন্দ

গুফ্‌তা হমা আঁ বুদ
কি বর লোহে জবীঁ বুদ।

গুফ্‌তম কি ন বক্‌তে
সফরত বুদ চুনীঁ যুদ
গুফ্‌তা কি মগর
মস্‌লিহতে বক্‌ৎ চুনীঁ বুদ।

গুফ্‌তম কি হাফিয
ব চি ইল্লত গুদা দুর
গুফ্‌তা কি হমা বক্‌ৎ
মুরাদহিয়া ঈঁ বুদ॥

বাঘ ডেকেছিল

প্রায় কৈশোরের বন্ধু
সন্তোষকুমার ঘোষকে

জ্যোতি পাঠক তাড়া না দিলে এ-বই কবে বার হত কিংবা আদৌ বার হত কিনা সন্দেহ।

একদিক থেকে ভালোই হয়েছে। খালি গোলায় নতুন ফসল তোলার চাড় হবে। ভাবতে হবে, পদ্যের দিকে এতটা ঝুঁকে পড়াটা ঠিক হচ্ছে কিনা।

নাকি এর জন্যে দায়ী কলকাতার পা-খোঁড়া-করা রাস্তাঘাট? গৃহবন্দীর অন্তরীণ গতিবিধি?

নতুন ক'রে আবার রাস্তায় পড়ি-মরি ক'রে চলতে চলতে সে সব ভাবা যাবে।

ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫ সুভাষ মুখোপাধ্যায়

বাঘ ডেকেছিল

ছাদে কাটা ঘুড়ি
কাক চোখ রাখে
নিচে জলচুড়ি
ঝাঁঝরির ফাঁকে

দেখা দেয় ছিঁড়ে
কুয়াশার জাল
রাতের শিশিরে
গা-ধোয়া সকাল।

সারাটা শরীরে
আঁচড়ের দাগ
কাল রাত্তিরে
ডেকেছিল বাঘ।

টেবিলে গোলাপ।
বই এককোণে।
ব্যাং দেয় লাফ
স্মৃতির উঠোনে।

হাট ক'রে খোলা
দরজা কপাট।
তাকে আছে তোলা
সব পুজোপাঠ।

গরাদের ফাঁকে
কে মুখোশআঁটা
কালো ডোরাকাটা
গেরুয়া পোশাকে ?

ফুঁড়ে ও দেওয়াল
কানে যায় নি লো ?
রাত্তিরে কাল
—বাঘ ডেকেছিল ।

কেন যে

এ কী ঢং ।

এ আবার কী অলক্ষুণে হাওয়া
সারাক্ষণ যাওয়া যাওয়া যাওয়া

বন্ধ কর কান, বিধুমুখি
শুনিস্ নে ও-কথা
যেতে যেতে কেমন স্বখাতে
থেকেও তো যায়
যে নদী বহতা

তার চেয়ে বলা ভালো আসি—
কেন-যে, সে তুই
বিলক্ষণ
জানিস্ সর্বনাশী ॥

সেও ঠিক এমনি বৃষ্টি

গোঁফ ওঠে নি ; ডিং মেরেও
দরোজার ছিট্‌কিনিতে যে বয়সে পেঁাছোয় না হাত—
শরীর পায় না টের
রক্তের দোলায় দিনরাত্রির তফাত,
সকলের সমক্ষে ছেড়েও
অম্লানবদনে দিব্যি পরা যেত খালি গায়ে স্রেফ্ যৎসামান্য ইজের

সে সময়ে থেকে থেকে দমকা ছাঁটে
কানা ক'রে দিয়ে দৃষ্টি
হাটে মাঠে বাটে
অহর্নিশ একনাগাড়ে পড়েছিল মুষলধারায়
সেও ঠিক এমনি বৃষ্টি।

আর সেই জলবন্দী দ্বীপে
শানবাঁধানো ইঁদারায়
পা-টিপে পা-টিপে
হাতের নাগালে উঠে এসেছিল অন্ধকারে নির্বাসিত
বহুশ্রুত
কূপমণ্ডূক দুটো
ব্যাং।
বাইরের জগতে তারা ইচ্ছে করলে ড্যাডাং ড্যাডাং অনায়াসে দিতে পারত
লাফ—
কিন্তু কী আশ্চর্য, লাফ দিতে দেখি নি তো।

সামনের জিওল গাছে খালি চাপ চাপ
ঝুলত জমাট রক্ত
থুথ্‌থুরে বুড়োর মত পাকাপোক্ত
কোঁচকানো বাকলে।

বর্ষার কয়েকটা মাস দেখেছি যদ্দুর
চোখ তার ভ'রে উঠত জলে।

যাঁর কথা বলব ব'লে এ কবিতা লেখা
তিনি কিন্তু এতক্ষণ একা
এককোণে;
ফুটো ছাদ;
উনুন নেভানো।

শিকেয় মাটির হাঁড়িকুঁড়িগুলো খালি পেটে কেবলি দোল খায়।
চাল বাড়ন্ত; কাছে পিঠে থাকে বেশ ক'ঘর যজমানও।
উঠুক রোদ্দুর।

এরপর শুধু একটা দৃশ্য আছে মনে।
কী যে হতভম্ব হয়ে আধখোলা জানলায়
আমি গণেছিলাম প্রমাদ।

নখদন্তহীন সেই পুরুত ঠাকুর
অঙ্গুষ্ঠে জড়ানো পৈতে, উর্ধ্বমুখে নিক্ষিপ্ত তর্জনী
পড়লেন কি সব মন্ত্র (পাল্লা দিচ্ছে তার সঙ্গে মেঘের গুড়গুড়)
ওঁ স্বাহা ফট্ বলে গলবাদ্যে ফোটালেন ধ্বনি।

পৈতে ছিঁড়ল, মন্ত্র গেল বৃথা।
সেও ঠিক এমনি বৃষ্টি
ভাসল সৃষ্টি
সে বালক আজও ভোলে নি তা॥

ছাড়া ছাড়ি

কাল রাতে পেটে পড়েছিল বেশ
তার জের টেনে সকালে খোঁয়ারি।
এখন আমার এমন বয়েস
লোকে চায় আমি সবকিছু ছাড়ি।

রূপ রস থেকে গন্ধ স্পর্শ
একে একে সব। দীর্ঘ ফর্দ।
কিছুই না মেনে আমি অবশ্য
রাজী বিধিমতে হতে সোপর্দ।

মনে নেই রাতে ফিরেছি কী ক'রে।
টলতে টলতে? কী আশ্চর্য!
পাথরের খাঁজে পা দিয়ে শিখরে
ওঠাটা হাঁটুর হয় নি সহ্য।

যখন ক'জনে হয়ে গিয়ে বুঁদ
ভেতরে ঢুকছি সব গল্পের
খালি গেলাসের গায়ে বুদ্বুদ
চেষ্টা করেছে কায়কল্পের।

কী যে হয়েছিল জানিনা কখন
নিজের মধ্যে ছিলাম না ঠিক।
রসাতলে ডুবে গিয়েছিল মন
খোঁজার সূত্রে হারানো মানিক।

হয়ত তা নয়। হয়ত বা তাই।
নাগাল পাই না কোনো বস্তুর।
ছাড়তে চাই না, তবু ছাড়াটাই
শুনি এ খেলার নাকি দস্তুর॥

পায়াভারী

আদতে বইয়ের পোকা।

হোক যতই
ডাকসাইটে পণ্ডিত।

সর্বক্ষণ
মুখে বই
কী গ্রীষ্ম কী শীত।

সময়ের টাকা-আনা-পাই
ভর্তি করত তার জেব।
খরচ করত না অতএব
একটিও মুহূর্ত খামোখা।
দু মলাটে ঘাড় গুঁজে চর্বিতচর্বণ—

দিনকাল এইভাবে চলছিল।

লোকটা এ জগতে থাকে
জানত না কাকচিলও।
সে খবর রাখত শুধু প্রতিবেশী কয়েকটা ইঁদুর
থাকত তারা আলমারির তাকে
মহানন্দে বেঁধে ঘর, তৎসহ আঁতুড়।

ঐ গণ্ডমূর্খদেরই একজন কেউকেটা
অজ্ঞতাবশত ঝুটমুট
পায়ে করেছিল দন্তস্ফুট—

পণ্ডিতের পায়াভারী হওয়াতেই জানা গেল সেটা॥

একাকারে

এসো, এই ঝর্ণার সামনে—
নতজানু হয়ে
আমাদের দুহাত-এক-করা
অঞ্জলিতে
তোমার পানি আর আমার জল
জীবনের জন্যে
একসঙ্গে একাকারে ভ'রে নিই।

দেখ, জপমালা হাতে
তোমার মা আর আমার আম্মা
জগৎজোড়া সুখ
আর দুনিয়া জুড়ে শান্তির জন্যে
একাসনে
একাকারে প্রার্থনা করছেন।

শোনো
কোরাণের সুরার সঙ্গে
উপনিষদের মন্ত্র,
সকালে প্রভাতফেরির সঙ্গে
ভোরের আজান
একাকারে মিলিয়ে যাচ্ছে॥

দু ছত্র

কথা ছিল, যাবো
    আরো কিছুদিন পরে

গুছিয়ে গাছিয়ে,
    যেখানকার যা
        সেখানে তা রেখে,
            যাকে যা দেবার
                দিয়ে থুয়ে সব

হঠাৎ···
এসেছে জরুরি তলব।

মানে না শুভঙ্করীর আর্যা,

    কী কী এবং কে
        এসব অঙ্কে
            যে আদৌ নেই

ক্ষুদকুঁড়োকেই যে পরমান্ন
    ব'লে মেনে নেয়,
যৎসামান্য
    পেলেই যে খুশী
        যে সর্বত্র,
            তার জন্যেই

যাবার বেলায়
এই দু ছত্র॥

জরুরি ডাকে

কাল ছিল যাবার কথা।
হঠাৎ জরুরি ডাকে
আজই আমাকে চলে যেতে হচ্ছে।

একটু যে গুছিয়ে গাছিয়ে নেব—
যে যা পায়
তাকে তা দেওয়া,
ছেঁড়াগুলো সেলাই,
ফুটোগুলো রিপু
—তার আর সময় নেই।

আকাশে কি মেঘ আছে ?
হাতের চেটোয়
সূর্যকে আড়াল ক'রে দেখে নিই।

আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে
বেশ কয়েকটা মুখ

ওরা কেউ জানে না
আমার এই আচম্‌কা রওনা হওয়ার
খবর

বাঁধাধরা ছকটা যখন হঠাৎ
উল্টে যায়—
তাতেও বেশ একটা মজা হয় ॥

এককাঠি দুকাঠি

এক পা বাইরে
এক পা
মনের ভেতরে।
ডালে দোল খায়
আকাশকুসুম
শৃঙ্খলে বাঁধা
স্মৃতি যায় ঘুম
শেকড়ে

এক পা ওঠালে
এক পা
পেছনে ঠেলে।
এ যখন ছাড়ে
লাগে ওর টান
থেকে থেকে হলে
ওর উত্থান
এ পড়ে।

এক পা বাইরে।
এক পা
মনের ভেতরে।

এক পা বাড়ালে
এক পা
থাকবে আড়ালে
ও যখন ভয়ে
নিজেকে গোটাবে

এ তখন রাগ
ফোটাবে ফোলানো
কেশরে।

এক পা বাইরে।
এক পা
মনের ভেতরে॥

আরে ছো

কেটা এক চণ্ডীদাস ব'লে
কোথাকার কোন্ এক বোষ্টম
কবে কোন্ মান্ধাতা আমলে
বলেছে লাগিয়ে দম—

শুনহ মানুষ সত্য
সবার উপরে।

তুমি তাই বিশ্বাস করেছ।

আরে ছো!
এখানে আমার সঙ্গে
তুমি এসো এই মোড়ে

চেয়ে থাকো।
দাঁড়াও, এখুনি পড়বে
এ রাস্তায় আরও একটা লাশ।
ফেটে পড়বে জয়গর্বে
উন্মত্ত উল্লাস।

শুনতে পাবে প্রাতঃস্মরণীয়
সকলের কণ্ঠস্বর—

জয়হিন্দ্, জিন্দাবাদ যুগযুগজীও
বন্দেমাতরম আর
আল্লা হো আকবর।

শুনহ মানুষ সত্য
বলেছিল কোন এক হরিদাস
তুমিও তো বিশ্বাস করেছ!

আরে ছো!

তবুও যদি হত কোনো মাংসাশী ও মেছো
বেদব্যাস—
বোঝা যেত
ভাইয়ে ভাইয়ে যুদ্ধ্-টুদ্ধ্!
তা নয়, কে এক বুদ্ধ্…

আরে ছো!

মনে পড়ে কি

মনে পড়ে কি?
বলেছিলে যা
ঝড়ের মুখে
ভাঙা নৌকোর
নাগরদোলায়
দুলতে দুলতে!

মনে পড়ে কি ?
বলেছিলে যা
এক পৌষে
মাটির সরায়
রং পিটুলি
গুলতে গুলতে ?

মনে পড়ে কি ?
বলেছিলে যা
দারুণ ব্যথায়
ককিয়ে উঠে
বাঁধনগুলো
খুলতে খুলতে !

মনে পড়ে কি ?
বলেছিলে যা
বন্দীশালায়
বীরদর্পে
লাল পতাকা
তুলতে তুলতে ?

মনে পড়ে কি ?
মনে পড়ে কি
দেয়ালে লেখা
সে সব শপথ
নিশির ডাকে
ভুলতে ভুলতে !

দূরান্বয়

সাদা চুলে
দেখতে পাচ্ছি দরোজার
ঝন্‌কাঠে দাঁড়িয়ে—

টেবিলে পা তুলে
কোথাকার কে এক ছোকরা
তর্জনী নাড়িয়ে
সামনের দেয়ালকে বলছে,
'কে ওখানে বটো ?
হটো হটো হটো !'

বাইরে বেরিয়ে ভাবি
দেয়ালের কান নেই
শোনে না, ভাগ্যিস্‌ !
নাহলে মাথায় ভেঙে পড়ত ছাদ
শূন্যতাকে ভ'রে দিত
শুধুই রাবিশ।

ঘুরে ফের জানলায় আসি
মুখ বাড়িয়ে দেখি—
একি !
চোখে দিয়ে ঠুলি
ছোকরাটি সমানে বলছে
সেই এক বাঁধাবুলি
'হটো হটো হটো !'

ঘরের ভেতরে কোনো দৃশ্য নয়,
টেবিলে পা তুলে
ঝাপ্‌সা এক দূরের অন্বয়—
বহুকাল আগে তোলা
আমাদের যৌবনের ফটো ॥

ছড়াই

যাব কেবল চোঙা ফুঁকে
নুন দেব না জোঁকের মুখে
তাড়িয়ে দিয়ে মা-ছি
খাচ্ছি দুধের চাঁ-ছি
আমার নাম নিধিরাম শর্মা
ভারত এই অধীনের সৎমা ॥

হলে চোখোচোখি
বল্, 'জী আজ্ঞে।'
মোড় ঘুরল কি ?
যা পিছে লাগ্‌গে ॥

সরকারী এঁটোকাঁটার হিস্যা
পাবার জন্যে এ-ওকে ঈর্ষ্যা ॥

অবাক কাণ্ড ঘটে এমন যে !
কাঠের পুতুল পাথরে ব্রোঞ্জে ॥

হাত পেতে রাখো
কিছু পাবে না কো।
হাতে বাঁধো মুঠো—
একটা না, দুটো ॥

বেলা গেল নাকি ? ভুলেছি বলতে—
পাকানো হয় নি সকালে সল্‌তে ॥

ভোটকম্বল ভোটকম্বল
অষ্টরম্ভা জোঁট সম্বল।
নেভাবে আগুন কোন্ দমকল ?
ভোট কম বল্ ভোট কম বল্ ॥

ফয়েজ আহ্‌মদ ফয়েজের একটি কবিতা

তা হয় না

অত্যাচার শেখাবে ভক্তির রীত ?
তা হয় না।
বিগ্রহ দেখাবে ঈশ্বরের পথ ?
তা হয় না।
শরীরের শূলে-চড়ানো বাসনাগুলোর
হিসেব রাখছে
আমার কোতোয়াল—
ক্ষয়ক্ষতির খতিয়ান তা ব'লে
ওভাবে হয় না
প্রত্যেকটা রাত আর প্রত্যেকটা মুহূর্ত
যেন কেয়ামতের দিন—
এমন হয়ে থাকে
তাই ব'লে রাত পোহালে যে
প্রত্যেকটা সকালই হবে
শেষবিচারের দিন—
তা হয় না
হৃদয়রাজ্যে পুরুষকার আর অদৃষ্ট
দুইয়ের কারোই কিছু করার নেই
এখানে তাঁর ইচ্ছার আর মর্জির পরিমাপ
এভাবে হবে না।
যুগের করুণাধারা বয়ে চলেছে,
ঘূর্ণ্যমান সারা আশমান।
তুমি যে বলছ, যা হওয়ার সবই হয়ে গেছে—
তা হয় না॥

তখনও

সূর্য তখন বসেছিল পাটে
এ কথা তখনকারই—

ছেড়ে যেতে নাড়ি
উনিও তখন খাটে।

তখনও কে যেন বাড়াচ্ছে হাত
বলছে, এই যে
দিন—
একটা যাহোক তাহোক

মুখ ঢাকা ব'লে হয় না কো সাক্ষাৎ
দিন দিন ব'লে
তখনও বাজছে টিন
এদিকে তখন করতালে খোলে
'নেই যে'
উঠছে বোল

এই রকমের আবোল তাবোল
বলেছিল খুব চেনা এক শববাহক॥

তার কাছে

গৌরচন্দ্রিকা থেকে পরিশিষ্টে
ছুটিয়ে প্রাণান্ত পরিচ্ছেদে
ওপরে সোনার জলে
নামধাম লিখে
যথোচিত ঠাটবাটে

মর্কটের চামড়ার মলাটে
আষ্টেপৃষ্টে
যে আমাকে বাঁধে

বলো পাখি,
গিয়ে বলো,
রাধে রাধে রাধে

তার কাছে
না, আমি যাব না

নিজে হাতে বোনা
অঙ্গরাখা দিয়ে ঢেকে
দুপাশে ভরাট পরিপাটি
সাদাসিধে
শুধু দুটো বাটি
যাতে মেটে
একটিতে আমার তেষ্টা
অন্যটিতে ক্ষিধে
যার চেষ্টা
আমাকে সে বেঁধে রেখে দেয়
সোনার খাঁচায়
সারাক্ষণ আদরে
আহ্লাদে

বলো পাখি কৃষ্ণ কৃষ্ণ
গিয়ে বলো
রাধে রাধে রাধে

তার কাছে
না, আমি যাব না

-সমস্ত যন্ত্রণা
যে নিজের ক'রে নিতে জানে
হো হো ক'রে হেসে,
মরতে মরতে দুর্ভিক্ষে খরায় বানে
বাঁচে আর
বাঁচায় অক্লেশে

কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলো পাখি
গিয়ে বলো
রাধে রাধে রাধে

তার কাছে
মহানন্দে থাকি

কারণ, সে বেঁধে দিয়ে ছাড়ে
এবং যতটা পারে
ছেড়ে দিয়ে বাঁধে ॥

কখনও কখনও

চোখ পড়তেই উঠেছি বিষম আঁৎকে—

চারপায়ে খাড়া হয়ে দাঁতনাড়া
দিচ্ছে সমানে
ভুলে গিয়ে ডাক
ঘাড়ে গর্দানে
কোথাকার এক
পাজীর পা ঝাড়া কুকুর।

আরে দূর দূর !
পাশ দিয়ে চলে গেলেই তো হয়,
কিছু বলবে কি ?
দেখি !
ঝট ক'রে ব্যাটা ঘুরিয়ে ফেলেছে ঘাড় ।
বিচ্ছিরি এক ব্যাপার ।

এতটা রাস্তা এসে
ফিরে যাব নাকি শেষে ?
তাতেও তো আছে বিপদ ।
পেছন ফিরলে দিতে পারে ঘাড়ে লাফ—
কুকুরটা অতি নচ্ছার অতি বদ্ !

পূর্বে কখনও পড়িনি এমতাবস্থায় ।
কী যে করা যায়, কী যে করা যায় !
মনকে বোঝাই জীবনের সার ধৈর্য ।

সত্যিই শেষে এসে গেল পালাবার জো ।
না, মোটেই হঠকারিতায় নয়—
হঠাৎ একটা সময়,
পুরো রাস্তাটা ফাঁকা ক'রে দিয়ে
মাথার উপরে ভেঙে পড়েছিল
আহা, কী মিষ্টি
কুকুর তাড়ানো বৃষ্টি ।

বুড়ি ছুঁয়ে

যে দেয়ালে বুড়ি দিত এতদিন ঘুঁটে
ভদ্রলোকের বেটারা সেখানে জুটে

তাতে নানা রং ফলিয়ে গিয়েছে লিখে
বুড়ি জানে না কো কারা কোন্ দল কী কে

একই দেয়ালের ভাগ ক'রে দুই পিঠে
দুদলেই যায় দুদলের ঢাক পিটে

ওরা বলে, মুখে ধরব দুধের বাটি
ভাই, আমাদের ওঠাও আরেক কাঠি

এরা বলে, আরে ! চুপচাপ ব'সে থাকো
কলেকৌশলে গরিবি হটাই, দেখ—

ভদ্রলোকের এক কথা খালি শুনে
মাজা প'ড়ে গেল দিন গুনে দিন গুনে

বুড়ি ভাবে হাতে নিয়ে গোবরের ঝুড়ি
আজাদীর হল ক' বছর ? দুই কুড়ি !

এক দেয়ালেই পিঠোপিঠি থেকে দু'য়ে
বুড়িকে সরায়, থাকে তবু বুড়ি ছুঁয়ে ॥

পালানো

গিয়েছিল
　　এই ফিরল।

দেখ, কিরকম খাড়া ক'রে আছে নাক?
দেমাক বুঝেছ
　　দেমাক!
নিজেকে ও ভাবে খুব তালেবর—
　　তাই না?

সামনে একটা আয়না
　　ধরলেই ব্যাটা (আসলে তো কেঁচো)
　　　　বনে যাবে বালখিল্য।

গিয়েছিল
　　এই ফিরল।

এসে বসতে না বসতে—
　　ভাঁজে মতলব যাওয়ার
　　　ঘরে ওর মন রয় না।
যেতে তৎপর,
　　ওদিকে আবার
　　　শানে পা ঘষ্‌টে ঘষ্‌টে
ফিরতেও ত্বর সয় না।
　　হেঁটেই বেড়াত, আজকাল খুব উড়ছে—
　　　নুড়ো জ্বালো ওর পুচ্ছে।
হ্যাঁ, তুমি ভায়া যা বলেছ তা ঠিক—
　　ভ্যালা পদাতিক !
　　　(শুনলে না চটে)
　　　　ভ্যালা পদাতিকই বটে !
　　　　　এসেই আবার গেছে সে কেন্দুবিল্ব।

গিয়েছিল।
এই ফিরল।

ধর্ বুড়োটাকে
ভালো ক'রে ঠ্যাং চেপে
কেবলি সে ক্ষেপে ক্ষেপে
স'রে পড়তে না পারে।
বুঁজিয়ে চোখের পাতা
গোঁজ্ তুলো ওর নাকে।
ও কিন্তু সব দেখছে চোখের আড়ে।
একি আমাদের সেই মুখপোড়া, হ্যাঁ লো!

ধরেছিল
তবু পালালো॥

খালি পুতুল

মৃত শহরটাতে জমবে খাসা
বুড়ো শকুনদের মচ্ছব

তাই আহ্লাদে আটখানা হয়ে
এ পাড়ায় উড়ে এসে
ফাঁকফোঁকরে চোখ রেখে
তারা বসল :

বাঁধা ছক মতোই ঠিকঠাক
সব চলছে

নুন খাইয়ে খাইয়ে
তেষ্টায়

কিছু লোকের ছাতি ফাটিয়ে
আর বাদবাকিদের
ধুনোর গন্ধে নাচিয়ে
মাথাগুলো খালি ক'রে
স্বয়ংচালিত পুতুল বানিয়ে
ধর্মের কল বাতাসে নাড়ার ভঙ্গিতে
কামানবন্দুক গোলাগুলি দিয়ে
মোক্ষম মোক্ষম জায়গায়
ওদের বসিয়ে দেওয়া হল

বাজি মাৎ ক'রে
কলের পুতুলগুলোর
দম যেই ফুরিয়ে যাবে

শকুনিরা ঠিক তখনই
বাইরে বেরিয়ে এসে

মৃত শহর জুড়ে
দাঁত আর নখের খেলায়
বুড়ো হাড়ে দেখাবে ভেল্‌কি

তারপরই গুড়ুম গুড়ুম শব্দে
আগুনের ঘেরা টোপে
ফাটতে লাগল কানের পর্দা
কেবল এক হাতে বাজছিল না ব'লে

ডাইনের সঙ্গে বাঁয়ের সহযোগে
হাততালি দেবার
আর একই সঙ্গে ডুগিতবলায়
বোল ফোটাবার কাজে

হিংস্থটে লোকেরও অভাব হল না।
এরপর হঠাৎ যে কী হল
দু দণ্ডেই সব চুপ।

খেল্ যেই খতম
বুড়ো শকুনেরা আর সেখানে থাকে?

দেখা গেল লড়াইয়ের জায়গায়
মুণ্ডু একদিকে ধড় একদিকে হয়ে
দাঁতমুখ খিঁচিয়ে
প'ড়ে আছে মানুষের পোশাক-পরা
একরাশ পুতুল

মৃত শহরের মানুষগুলোর জন্যে
গলা ছেড়ে যারা কাঁদতে যাচ্ছিল
পুতুলগুলোকে দেখে
তাদের গলায় কান্না আট্‌কে গেল॥

একটু আধটু

খড় খড়িয়ে
খড় খড়িয়ে
ঘুরে বেড়াই
গ্যাব্‌দা গোব্‌দা
রং-চটা এক
কাঠের লাট্টু।
এই রয়েছি, পরক্ষণেই চলে গেলাম
কোথায় গেলাম? কোথায় গেলাম?

কী যেন নাম ?
দাঁড়ান ভাবি—
টিম বাক্‌টু ।

আমি একজন আদ্‌মি রইস্‌ ।
রাস্তা মোকাম
সড়ক সরাই ।
আমিই সওয়ার
আমিই সহিস
থাকার মধ্যে একটা শুধু
ছোট্ট-টাট্টু ।

চাবুক হাতে তারই পিঠে
তামাম মুলুক দাব্‌ড়ে বেড়াই
কোথায় তেতো কোথায় মিঠে
যার কাছে যা আছে তাতে
ভাগ বসাতে
জিভের আগায় চেখে দেখতে
খুব বেশি নয়—
একটু আধটু ॥

অর্থাৎ

মাননীয় সভাপতি, ভাইবন্ধুগণ,
সভাস্থ আবালবৃদ্ধবনিতা সবাই,
উপস্থিত বাবা-দাদা এবং মা-বোন,
আগে তো শুনুন, পরে করবেন জবাই

আমাকে যে অর্থে মন্ত্রী হয়েছে বানানো
তার উৎস, পরিণাম, ব্যুৎপত্তিই বা কিবা
এ সকল আপনাদের বৃথাই জানানো—
সাধারণে ধরে অসাধারণ প্রতিভা।

পূর্ববর্তী বক্তারা তো বলেছেন সবি
আমার বলবার কথা নেইকো বিশেষ
কেবল কথায় আর ভোলে না কো ভবী
গন্ধ দিয়ে বোঝে লোকে সরেস নিরেস।

তবু যদি চলে যাই বিনাবাক্যব্যয়ে
কেউ কিছু ভাবতে পারে, দেখায়ও খারাপ।
অতএব শুধু ক'টি জরুরি বিষয়ে
আপনাদের সামনে খুলব খাপ।

লোকে যাকে অর্থ বলে তা কি সত্যিকার?
নাকি এও সেই বস্তু—সর্পে রজ্জু ভ্রম!
ওল্টালেই দেখা যাবে সব ফক্কিকার—
বাষ্প হয়ে উড়ে যায় জল যেরকম।

অর্থ বানানোর কাজে চাই পাকা হাত
আপনারাই পারেন রুখতে মন্ত্রীর পালট—
এ জনসেবককে মনে রাখবেন। অর্থাৎ
অনর্থ ঘটায় না যেন ভুল বাক্সে ভোট।

ভোটপর্ব চুকে গেলে, চেয়েছেন যা যা
দেব সব। মাটি থেকে নিতে হবে খুঁটে।
চাখবেন কী? আপনারাই তো রাজা।
দেয়ালের লেখা ঢেকে অতঃপর দেওয়া যাবে যত ইচ্ছে ঘুঁটে।

সেকেলে

১

গায়ে ফিন্‌ফিনে সূক্ষ্ম বস্ত্র,
দুহাতের বাজুবন্ধ সোনার
চূড়া ক'রে বাঁধা তেলচিক্কণ
সুবাসিত কেশে দোলে ফুলহার।

যেন নবশশিকলা ঠিকরানো
তালপাতা গোঁজা কর্ণলতায়—
বঙ্গবারাঙ্গনার এ সাজ
যেই দেখে তার মাথা ঘুরে যায়॥

—অজ্ঞাতনামা, সদুক্তিকর্ণামৃত

২

স্তনযুগলের গা ছুঁয়ে
সূত্রহার,
বক্ষে আর্দ্রচন্দন।

খোলা বাহুমূলে
আড়চোখে বারে বারে
চায় সীঁথি-ঢাকা গুণ্ঠন।

অঙ্গে অগুরু,
শ্যামল গায়ের রঙে
দূর্বাও মানে হার।

গৌড়ের যত
রমণী দেখতে পাবে
একই বেশ সব্বার॥

—রাজশেখর

শহুরে চালচলন ছেড়ে, সই
হাঁটো এখানে সরল ঋজু পায়।
ডাইনী ব'লে মোড়ল দেয় সাজা
একটুও আড়চোখে যে মেয়ে চায়॥
—গোবর্ধনাচার্য

ও আমার বঙ্গ

মাথা রেখে আকাশের নীল গায়
পার হয়ে সাগর তরঙ্গ
মেলেছে ধবল পাখা কাঞ্চনজঙ্ঘায়
আমাদেরি প্রাণের বিহঙ্গ।

ও আমার স্বপ্নের,
বিভব ও রত্নের,
জীবন ও জন্মের,
আদরের, যত্নের
আমার চোখের মণি বঙ্গ।

অরণ্য নদীমালা নির্ঝর
ধ্বস নামে, বান ডাকে, ওঠে ঝড়
সুন্দর ভীষণ ভয়ঙ্কর
দিবস রজনী ঋতুরঙ্গ।

ও আমার স্বপ্নের,
বিভব ও রত্নের,
জীবন ও জন্মের,
আদরের, যত্নের
আমার চোখের মণি বঙ্গ।

দুটি পাতা, মাঝখানে কুঁড়ি এক
দূরকে নিকট করা তার ডাক
রাখীবাঁধা ভূভারতে পোঁছাক
জয় ক'রে বাধা দুর্লঙ্ঘ্য।

ও আমার স্বপ্নের,
বিভব ও রত্নের,
জীবন ও জন্মের,
আদরের, যত্নের
আমার চোখের মণি বঙ্গ

মুইন বিসেস্থ

প্রীতিভাজনেষু,—
মনে পড়ে বিসেস্থ-কে? মুইন বিসেস্থ?
বয়সে আমার চেয়ে ছোট ছিল। বেশ কয়েক বছরের ছোট।
বেনারসে যেতে যেতে, কাগজে দেখলাম তার মৃত্যুর খবর।
আর ফোটো।
সতেরো বছর আগে প্রথম আলাপ। এশীয়-আফ্রিকী
লেখকেরা মিলেছিল সে-বছর শহর বৈরুতে। বাস্তবিকই
অনিন্দ্যসুন্দর ছিল সে-সময়ে জাঁকজমকে ভরা সে বন্দর
দু'ধারে গিজগিজ করছে হোটেল টুরিস্ট ব্যাঙ্ক বারবনিতা নাইটক্লাব
ক্যাসিনো গুপ্তচর।
ফেলিস্তিন থেকে তার ঢের আগে এসেছিল ছিন্নমূল শরণার্থী।
আকাশ বাতাস ভারী করেছিল বুকফাটা দীর্ঘশ্বাস আর আর্তি।
মনে গেঁথে গিয়েছিল দেশ ছেড়ে আরেকবার দেশ হারানোর
সেই ছবি

স্বদেশে অজ্ঞাতবাসে থাকা এক ফেলিস্তিনী কবি
তখনও জানি না নাম, দেখা হল তার সঙ্গে নিজারের ফ্ল্যাটে
বৃষ্টি না পড়লেও, ছিল আকাশ ঘোলাটে।
শান্ত কণ্ঠ। স্বপ্নমাখা চোখে শোনাল সে ব্যথায় বিধুর
যে কবিতা, আজও আছে কানে লেগে। মরুভূমি, দুরন্ত দুপুর,
কুয়ো থেকে জল তুলছে আরব্য মেয়েরা ; বেদুইন, উট
চোখ থেকে মুছে গেছে সে মুহূর্তে শহর বৈরুত
শিয়রে দাঁড়িয়ে থাকা লেবানন, পদতলে ভূমধ্যসাগর

জন্মভূমি ছেড়ে, যখন পালানো ছাড়া থাকে নি কো কোনো গত্যন্তর
তার সঙ্গে ফের দেখা। সেবার লেনিনগ্রাদে। দল বেঁধে যাচ্ছিলাম -
মিহাইলভ্‌স্কায়া। পুশকিনের জন্মোৎসবে। জানা হল নাম।
ভেতরে আগুন জ্বলছে। আরও তাতে ঢালছে মদ। চায় জ্বেলে দিক
দাবাগ্নি তা।
হয়েছে অসংখ্যবার এরপর দেখা। কিন্তু বন্ধ ঘরে শান্ত স্বরে
আর কখনও শোনায়নি কবিতা।
আমারই চোখের সামনে পেকে গেল ওর চুল, বদলে গেল গলা
শব্দগুলো ফাটতে লাগল ; একেকটা যেন কামানের গোলা।
সাতপুরুষের ভিটে কেড়ে নিয়ে কুকুরের মতন তাড়ালে
কী হয় বুকের মধ্যে, কী জোটে কপালে
আমরা জানি না ?

এখন শুধুই স্মৃতি। মানুষ বাঁচে না স্মৃতি বিনা।
তিন বছর, হ্যাঁ তো, ঠিক তিন বছর আগে
বৈরুত তখন আর সে বৈরুত নেই। ভেঙে গেছে শহর দুভাগে
খৃস্টানে ও অখৃস্টানে। বিমান বন্দর থেকে সাঁজোয়া গাড়িতে
পৌঁছে দিল কেন্দ্রস্থলে অবিশ্বাস্য হোটেলের ভুতুড়ে বাড়িতে।
বন্ধ হয়ে গেছে সব পুরনো দরজা।
চা-খানায় কেউ নেই, যাকে দেখ তারই মুখে রমজানের রোজা।
মুইনের ফ্ল্যাট ছিল গলিস্য গলিতে। সুন্দর সাজানো।

যখন একটু রাত, গুটি গুটি অন্ধকারে সে-ফ্ল্যাটে কে এসেছিল, জানো ?
ইয়েসার আরাফাত।
জমাট আড্ডায় কেটে গিয়েছিল, কোথা দিয়ে প্রায় সারা রাত।
গুলি চলছে মধ্যে মধ্যে, আগুনের গোলা পড়ছে ভূমধ্যসাগরে।
আমরা ফিরেছি দেশে। কিছুদিন যেতে না যেতেই ফের সে হল হা-ঘরে
সুন্দর সুদৃশ্য ফ্ল্যাট, কবিতার পাণ্ডুলিপি, সমস্ত স্মারক উপহার,
নির্বাসনে একমনে দুজনের সাজানো সংসার
মুহূর্তে সবকিছু ফেলে পালিয়ে গেল সে কোনোক্রমে, ওপারে তিউনিসে।
তারপর আলজিয়ার্সে দেখা ; বলল, এসো পরের বার নতুন আপিসে।
হয়নি যাওয়া। চোখ তুলে যখনি চেয়েছি তার মুখে
মনে হত, সমস্ত সময় তার হৃত দেশ আছে জুড়ে কুরে-কুরে-খাওয়া তার বুকে।
কী ক'রে সে মারা গেল স্পষ্ট নয়। শূন্য পথে উড়ে যেতে যেতে মুক্ত পাখি ?
নাকি একা লণ্ডনের কোনো এক রুদ্ধ কক্ষে, মধুর স্বপ্নের মধ্যে নির্জন একাকী ?
তার দেশ ফিরে পাবে হৃত মাটি, তার জন্যে তোলা রইল সিংহাসন,
রাজার কিংখাব—
সকলেই সবকিছু পাবে। আমরা ? দেখা হলে কার সঙ্গে ঝগড়া করব ?
পরক্ষণে কার সঙ্গে ভাব ?

প্রকৃতি-পুরুষ

ঘর বার সমান রে বন্ধু
আমার ঘর-বার সমান।
পায়ের নিচে একটুক মাটি
পেলাম না তার সন্ধান।

আমার সেই পোষা পাখি
আকাশের নীল রঙে আঁকি
যত্নে বুকে ক'রে রাখি
তবু কেন সে করে আনচান।

জলে জন্ম জলেই মৃত্যু
মধ্যে খালি ঢেউয়ের নৃত্য
গতি ছাড়া আর সব অনিত্য
হয় ভাটি আর নয় উজান।

প্রকৃতি বিনে পুরুষ তো নেই
দ্বন্দ্ব যা তা দেহ মনেই
দুনিয়াটাও তো দুই নিয়েই
এক আমাকে জল মাটিতে দুখান করে এই দোটান।

টানা ভগতের প্রার্থনা

১

মাটির পেট থেকে সবকথা
আজও বার করা যায় নি
আরও কত পাথরের হাতিয়ার
হাড়ের অলঙ্কার আর মাটির তৈজস
মুখের আরও কত কথা
খোদাই করা আরও কত অক্ষর
অন্ধকার থেকে আলোয় আসার অপেক্ষায়।
ছুঁচে সুতো পরাতে পারি না
তা আমি অত দূরেরটা
কেমন ক'রে দেখব ?

তোমার জন্যে আমার ঝুলিতে তোলা ছিল
কয়েকটা গল্প
বার করতে গিয়ে দেখি
কারো শেষ কারো গোড়া, কারো পাশ কারো মধ্যেটা

ছিঁড়ে গিয়ে, এটার সঙ্গে ওটা জুড়ে গিয়ে
সব বেশ মজার চেহারা হয়েছে
আমারই গল্প
কিন্তু তাতে সময়ের হাত পড়ায়
আর আমার থাকে নি।

২

গুরুজনেরা বন্দেমাতরম ব'লে হাত কপালে ঠেকিয়ে
তিনটে রং
কলাপাতায় সিঁদুর চন্দন বুলিয়ে
আমাদের জন্য রেখে গিয়েছিলেন।
আগুনের তাপে
তিনকে এক ক'রে আমরা পেলাম
টক টকে লাল—

আমাদের ধমনীতে বহমান যে রক্ত
তার সঙ্গে মিলিয়ে গিয়ে
সেই রঙে আমরা ছুপিয়ে নিয়েছিলাম
আসমুদ্র হিমাচলের আকাশে তোলা
আমাদের নিশান।

ভাই, ও ভাই!
তোমরা কি সেসব ভুলে গিয়েছ?
তিনকে এক করেছিল যে ইংরেজ
তাকে যে চক্রান্তকারীরা
পাহাড়ের চূড়া থেকে খাদের মধ্যে
ঠেলে দিয়েছিল
নব কলেবরে আবার সে
উঠে আসবে।

ভাই, ও ভাই !
তোমরা কি তাকে ভুলে গিয়েছ ?

নোংরা হাতের টানাটানিতে
আর ক্রমাগত
হাত বদলের ঠেলায়—
রক্তের সঙ্গে মিলিয়ে, দেখ
বাজে রঙের মেশালে আর সাত নকলে
আমাদের সে নিশানের
সে রং আর নেই
ফিকে তো বটেই, তা ছাড়া কী জানো ?
রোদে একটু পুড়লে
জলে একটু ভিজলেই উঠে যাচ্ছে।

মাটি থেকে তুলে তিনটে রং
গনগনে আঁচে জ্বাল দিলেই
টকটকে লাল হবে।
ভাই, ও ভাই !

৩
কাল আমার কী হয়েছিল জানিনা
ঘুমের মধ্যে
আমি কেবলই চমকে চমকে উঠেছিলাম

দূর থেকে আমার খুব আপনার কেউ
যেন পাল্কি-বেহারাদের গলায়
ঘোর অন্ধকারের মধ্যে
জল কাদায় ছপ ছপ করে হাঁটতে হাঁটতে
সুর করে বলছিল

ওঃ এই বাঘটার কী বড় বড় থাবা
এই, খবরদার
ইস, এ কোথায় এলাম রে বাবা
এই, খবরদার
অন্ধকার কী ঘুরঘুটি রে দাদা
ধাকু নাবড়, খবরদার
চোরের মায়ের খুব ফুর্তি রে দাদা
হাঁই দাব্‌ড়ে হুকুমদাব্‌ড়ে
শূন্য হাতে দশহাত দুগ্‌গা
হেঁইয়ানাবড় ধাকুনাবড়
গড়গড়িয়ে খালে পড়্‌গা
এই, খবরদার !

৪

যখন হাঁটবে
খুব পা টিপে টিপে
এখানে পেছল হয়ে আছে
ওখানটাতে গর্ত —

যখন হাঁটবে
খুব পা টিপে টিপে
পা টিপে টিপে ।

সময়টা পড়েছে বড় খারাপ ।
কালো চশমা দিয়ে চোখ
বাঁদুরে টুপিতে কান
যে পারছে সেই ঢেকে রাখছে ।
হাত নাড়াতে নাড়াতে ড্যানা দুটো
খসিয়ে ফেললেও কেউ দেখে না,
চেঁচাতে চেঁচাতে গলা ফাটিয়ে ফেললেও
কেউ শোনে না ।

'নিজের কথা কী আর বলব।
দাড়ি কামাই, চুল আঁচড়াই,
চোখের কোলের কালি মুছি—
সমস্তই বিনা আয়নায়।
এখন আর আমাকে তাই নিজের মুখদর্শন
করতে হয় না।
সরতে সরতে আজ আমি সব কিছুর বাইরে।

সন্ধ্যের পর শহরময় আলো নিভে গেলে,
অন্ধকারের কালো পর্দায়
তবু আমি একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে
জবাকুসুমসঙ্কাশং সেই মহাদ্যুতিকে খুঁজি
শক্তিকে যে বেঁধে রেখেছে
অঙ্গারের মধ্যে।

আমি কান খাড়া করে রেখেছি—
শিখরভূম থেকে কখন ভেসে আসে
টানা-ভগৎদের প্রার্থনা :

টান বাবা টান। কাঁধে চড়া ভূতেদের
ঠ্যাং ধ'রে টান। টান টোন টান
টান বাবা টান। চোখ-ট্যারা ভূতেদের
চুল ধ'রে টান। টান টোন টোন টান
টান বাবা টান। কেটে পড়া ভূতেদের
নড়া ধ'রে আন। টান টোন টান

তোমরা কি শুনতে পাচ্ছ ?
ভাই, ও ভাই।

চর্যাপদ

স্নেহের
জয়শ্রী-নুবুকে

চর্যাপদ

এবং

চর্যার পদানুসরণে

তর্জমার পেছনে

অনুবাদ যে তাতে সন্দেহ নেই। তবে বাংলা থেকে বাংলায়—পুরনো থেকে নতুনে। হাজার বছর পরেও কি আজকের বাংলাকে সেদিনের বাংলায় তর্জমা করে দিতে হবে? রবীন্দ্রনাথের বাংলা হয়ত এই পরিবর্তনের গতিবেগকে অনেকদিন অবধি ধরে রাখতে পারবে। তাও চিরদিন নয়।

ভবিষ্যৎ নিয়ে আন্দাজে ঢিল না ছুঁড়ে চর্যাপদ অনুবাদ প্রসঙ্গে আসি।

সাহিত্যের ছাত্র না হওয়ায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'বৌদ্ধগান ও দোহা' পড়েছিলাম ওপরসাভাবে।

'প্রাচীন সাহিত্য' পত্রিকা থেকে একবার ধরে বসল কয়েকটা চর্যাগীত তর্জমা ক'রে দিতে হবে। নিজেকে ধ'রে-বেঁধে কাজে বসাতে বেশ কষ্ট হয়েছিল। কোনোরকমে কেঁদে-ককিয়ে তো করলাম। কিন্তু সেই থেকেই একটা মৌতাত জন্মে গেল—পুরোটা করলে কেমন হয়? তার জন্যে দফায় দফায় বসেছি। কিন্তু কিছুতেই বাগে আনতে পারিনি। শেষ পর্যন্ত হার মেনে হাল ছেড়ে দিয়েছি।

ভেতরটা মাঝে মাঝেই খুঁচিয়েছে। ইচ্ছেটা মন থেকে কখনই একেবারে ঝেড়ে ফেলতে পারিনি।

এমনিভাবে বেশ কয়েক বছর কেটে গেছে। বছর দেড়েক আগে হঠাৎ একবার ভাগ্যচক্রে একটা বই হাতে এসে গেল—সুমঙ্গল রাণার 'চর্যাগীতি পঞ্চাশিকা'। পড়তে পড়তে মস্কো গেলাম। তখনই আবার পুরনো ইচ্ছেটা মনের মধ্যে নড়েচড়ে উঠল।

সে-কথা আমার তরুণ বন্ধু ভারততত্ত্ববিদ্ সের্গেই সেরেব্রিয়ানিকে বলতে তো সে লাফিয়ে উঠল। বলল, 'আমার কাছে পের্ কৃভের্নে-র অনুবাদ করা "অ্যান অ্যান্থলজি অব্ বুদ্ধিস্ট তান্ত্রিক সংস্" আছে। আপনার কাজে লাগবে'।

নরওয়ের অ্যাকাডেমি অব সায়েন্স অ্যাণ্ড লেটার্স থেকে প্রকাশিত ঢাউস দুটো থান ইঁট নিয়ে পরদিনই সের্গেই হাজির।

ব্যস, তখনই আদাজল খেয়ে অনুবাদের কাজে লেগে গেলাম। সুকুমার সেন আর শহীদুল্লাকে ঐ বইতেই পেলাম। সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আর সুমঙ্গল রাণা।

যাঁর সঙ্গে যখন মন সায় দিয়েছে অনুবাদে তাঁকেই অনুসরণ করেছি। যেহেতু জ্ঞানগম্যি কম, তাই বিচারে হয়ত ভুলও হয়ে থাকতে পারে।

তবু এ কাজে কেন হাত দিয়েছিলাম, সেটা একটু খুলে বলা দরকার।

চর্যার যে ভাষা, বাংলা ছাড়াও ওড়িয়া, হিন্দি, মৈথিলিও তার দাবিদার। আমার মতো গোলা লোকের এ কাজিয়ায় মাথা গলানো সাজে না। তবে কারো পক্ষে কোনো ওকালতিতে না গিয়েও একথা অবশ্যই বলা যায় যে, একই গর্ভে জন্ম ব'লে আদিপর্বের ভাষায় আকৃতির মিল থাকতেই পারে। পণ্ডিতেরা আরও বলেন কেবল কয়েকটা শব্দ আর দু-চারটে অকুস্থল দেখিয়ে কোনো ভাষায় কারো দাবি ধোপে টেঁকানো যায় না।

মুখের মিল দেখিয়ে এক্ষেত্রে একতরফা ডিগ্রি পাওয়া যায় না। দেখতে হবে মনের মিল কতটা। নইলে সাদৃশ্যের অভাব সত্ত্বেও সংস্কৃত রচনায় কেমন ক'রে বাঙালীর পাঁচ আঙুলের ছাপ টের পাওয়া যায়? বাঙালীর সঙ্গে চর্যাগীতির যে মিল তা শুধু মুখের কথায় নয়—বাঁচার ধরনে, জল, মাটি, হাওয়ায়, ধ্যান-ধারণায়, মনের গড়নে, প্রবাদ-প্রবচনেও।

হয়ত সেই কারণেই প্রথম পরিচয়েই চর্যাগীতিতে আমি অনুভব করেছি নাড়ির টান।

'এলাম আমি কোথা থেকে'—এ প্রশ্ন ভাষার ক্ষেত্রেও না উঠে পারে না। রামগতি ন্যায়রত্নমশাই বাংলা ভাষার ইতিহাসকে যে কালে শ'তিনেক বছর উজিয়ে নিয়ে গেলেন, সে সময়ের বর্ণনা দিতে গিয়ে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মন্তব্য করেছিলেন : এ সত্ত্বেও গত খ্রীস্টাব্দের ৮০ কোটায় লোকের ধারণা ছিল—বাংলা একটা নতুন ভাষা, তাতে সব ভাব প্রকাশ করা যায় না, চিন্তা ক'রে নতুন বিষয় লেখা যায় না। লিখতে গেলে হয় ইংরিজি নয় সংস্কৃত ছাঁচে নতুন কথা গড়তে হয়, বড় কটমট হয়।

সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, চর্যাগীতি আবিষ্কার ক'রে যিনি নিজেই বাংলা ভাষাকে পেছনে আরও পাঁচশো বছর পার ক'রে দিয়েছিলেন, লোকের ধারণা বিষয়ে তাঁর সেই মন্তব্য এ শতাব্দীর ৮০ কোটাতেও প্রায় অবিকল খাটে।

চর্যাগীতি প্রসঙ্গে হরপ্রসাদ সন্ধ্যাভাষার কথা তুলেছেন। 'বুঝ জন, যে জানে

সন্ধান' অর্থে কথাটা হয়তো 'সন্ধ্যা' না হয়ে 'সন্ধা' হওয়াই উচিত। এমন সব কথা যার বাইরে এক ভেতরে আর-এক। সাঁটে কিংবা ঠারে-ঠারে বলা। তবে হরপ্রসাদের 'আলো-আঁধারি'র অর্থটাও কি একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায়? বরং চর্যাগীতির এই আলো-আঁধারির দিকটাই আমায় বেশি ক'রে টেনেছে। মনশ্চক্ষের চেয়েও চর্মচক্ষু দিয়ে দেখবার চেষ্টা আমি বেশি করেছি। ধ্যান-জ্ঞান আর সাধন-ভজনের রাজ্যে আমি অন্তেবাসী। পণ্ডিতদের টীকাভাষ্য এড়িয়ে বেহেড অন্ত্যজদের পাড়ায় আমি কোনো গূঢ়তত্ত্বে নয়, শুধু জীবনরসে মজেছি।

বাংলাভাষার সে ছিল এক আলো-আঁধারি যুগ। প্রতিবেশী নবজাতক আরও অনেক ভাষার সঙ্গে সহোদরত্ব তার সারা গায়ে প্রকট। এক থেকে অনেক হওয়ার লক্ষণগুলো তখনও খুব স্পষ্ট।

তবু চর্যার ভাষাকে সেকালের সদ্যোজাত বাংলা বলে একদৃষ্টেই চিনতে পেরেছিলেন ১৯১৬ সালে নেপালে এ-পুঁথির আবিষ্কর্তা মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। তাঁর যে চিনতে ভুল হয়নি, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় আর সুকুমার সেনের মতন বাঘা বাঘা ভাষাচার্যের চুলচেরা বিচারে তা প্রমাণ হয়েছে।

প্রায় হাজার বছর আগের ভাষাকে আজকের মুখের কথায় ঢেলে সাজতে গিয়ে আমাকে খুব বেশি কাঠখড় পোড়াতে হয়নি। চেষ্টা করেছি ছায়ার মতন পায়ে পায়ে চলতে। নিহিতার্থ বা পরমার্থের পথ বড় একটা মাড়াইনি। প্রাতিভাসিকের গতিতেই নিজেকে বেঁধেছি।

চর্যার গানে সেকালের যে জীবনচিত্র, তা থেকে আজও আমরা খুব দূরে নেই।

ডোম-চাঁড়াল শবর-শুঁড়ি জেলেমালোর বাস বামুনপাড়ার বাইরে। তারা কেউ থাকে জঙ্গলবুড়িতে। ঘরের পাশে কাপাসক্ষেত। চাষ হয় ধানপান আর কাপাস তুলোর। কেউ তুলো ধোনে, তাঁত বোনে। মাদুর আর চাঙাড়ি বানায়। নৌকো বায়, মাছ ধরে। কাপালিরা নাচে গায়। বাজিকররা দেখায় দড়ির খেলা। ব্যাধেরা শিকারে গিয়ে বন বেড় দেয়। ঘাই-হরিণীর টোপে হরিণ গাঁথে। হাতি ধরা আর হাতি পোষা হত। মাহুত হাতি চালাত।

নদনদীর দেশ। ডাঙায় চাকাঅলা গাড়ি। জলে পাল তোলে, লগি ঠেলে, গুণ টানে নৌকার মাঝি। ঘাটে থাকে পারানীর নৌকো। কুড়িতে বুড়িতে ভাড়া গুনতে হয়। ফাঁকি দিলে কাছা খুলে তল্লাস করে।

কাঠ চেরাই ক'রে পাটা জুড়ে টানা দিয়ে সাঁকো তৈরি হয়।

বাড়িতে থাকত হাঁড়ি, কেঁড়ে, ঘড়া, গাড়ু। ফাল, কুড়ুল, টাঙি, খোন্তা। বাজানো হত জয়ঢাক, মাদল, ডুগডুগি, কাঁসর, করতাল, বাঁশি, একতারা।

শুঁড়িখানাগুলো মার্কামারা। দেখলেই চেনা যায়। শুঁড়িবউ সার দিয়ে সাজিয়ে রাখে চৌষট্টি ঘড়া মদের পসরা। ভাঁড়ে ভাঁড়ে লাগানো সরু নল। খদ্দের একবার ঢুকলে আর সহজে বেরোয় না।

কাংনিদানার ফসল উঠলে ঘরে ঘরে তৈরি হবে পচাইনাচ-গান, হৈ হল্লায় সারা গ্রাম মেতে উঠবে।

ঘরে ব'সে খেলা বলতে নয়-বল। সেকালের দাবাখেলায় ফড়ের অভাব হত না।

বেশ ধুমধড়াক্কা হতো বিয়েতে। লোকে ভোজ খেত। যৌতুক দিত। মেয়েরা বাসর জাগত। বিধবাবিয়েরও চলন ছিল। বামুন চাঁড়ালেও বিয়ে হত। জাতি-ভেদ সত্ত্বেও ডোমনীর ঘরে অভিসার ঘটত ব্রাহ্মণবটুর। হত প্রণয়, মান-অভিমান, ঈর্ষ্যা। সেই সঙ্গে অবৈধ প্রেম।

ভাত তো ছিলই। গোয়ালে গাই। নদী-নালায় মাছ। হাঁড়িতে ভাত না থাকলে বাউণ্ডুলেদের ঘর সংসারে নিত্য-উপোষী থাকতে হত।

বাড়িতে শ্বশুর-শাশুড়ি, বউ, ননদ। শালী। আঁতুড়ঘর। চাবিতালা। গায়ে গায়ে চালাঘর।

মেয়েরা সাজত। হাতে কাঁকন। গলায় মুক্তোহার, কানে কুণ্ডল। হাতে আরশি। খাটে পা এলিয়ে খেত পান-কর্পূর। শবরীর মাথায় ময়ূরপুচ্ছ, গলায় গুঞ্জার মালা।

কাপালিক দিগম্বরদের গলায় হাড়ের মালা, কানে কুণ্ডল, হাতে ডমরু, পায়ে বাজন-নূপুর।

বড়লোকের ঘরে কুলবিগ্রহ শাস্ত্রপুঁথি ইষ্টমালা মন্ত্রতন্ত্র ধ্যান-আহ্নিক। সেই সঙ্গে বিষয়-সম্পত্তির দলিলপাট্টা, সোনারূপো, চাষের বলদ। তিনবেলা দোহনযোগ্য দুধেলা গাই।

ছিল চোর-ডাকাত। অগ্নিকাণ্ড। রাস্তাঘাটে আদায় হত শুল্ক। ছিল থানাকাছারি, ঘুষখোর দারোগাপুলিশ।

বিদ্বান পণ্ডিতদের সম্মান ছিল। তাদের জন্যে বারনারী। বাঈজীরা গাইত অশ্লীল কামচণ্ডালী গান।

চর্যাগানের মধুর বোলে ফুটে ওঠা এ আমার আবাল্যের নদীমাতৃক চেনা জগৎ।

কবে শুরু আর কবে শেষ হয়েছিল চর্যাগান রচনা? পদকর্তাই বা ঠিক কারা?

এসব নিয়ে আজও স্থির সিদ্ধান্ত হয়নি।

একজনের কি একাধিক নাম? কোন্‌টি স্বনাম, কোন্‌টি বেনাম? কে কত আগে, কে কত পরে? কে আজন্ম এখানে, কে এসেছে বাইরে থেকে এখানে, নাকি গেছে এখান থেকে বাইরে?

এসব তদন্ত করা যাঁদের সাজে তাঁরা করবেন। আমার মত আনাড়ির ও-কাজ নয়।

পদকর্তারা যে সাধকগোষ্ঠী হোন—বৌদ্ধ বা তান্ত্রিক, সহজযানী বা বজ্রযানী—ভক্তদের জ্ঞানচক্ষু ফোটাতে গিয়ে জীবনকে যে রঙেরসে ফুটিয়ে তুলেছেন, তার তুলনা নেই। জোর দিয়েই একথা বলা যায়, জন্ম যে-কুলেই হোক—তাঁরা ছিলেন সেকালের খেটে-খাওয়া ইতরজনের কাছের মানুষ।

কোন্‌টা কার নাম আর কোন্‌টা উপনাম, তাই বা কিভাবে সাব্যস্ত হবে?

নামগুলো থেকে আন্দাজে ঢিল ছুঁড়ে সেকালের জনসমাজকে নিশানায় আনতে ভালো লাগে।

প্রাচীন ছবিতে লুইপাদকে মাছের সঙ্গে ভালো করেই জড়ানো হয়েছে। 'লুই'য়ের উৎসে 'রুই' থাকতেই পারে। 'রুই' থেকে 'রুইদাস'ই বা কী এমন দূর? রুইদাস তো চর্মকার। ভাবতে ভালো লাগে—কেউ তৈলকার, কেউ গাড়ুলি (ভেড়ার লোমে যারা কম্বল বোনে), কেউ ডোম, শবর বা ব্যাধ, কেউ তাঁতী, কেউ কুকুরপালক।

আমার কাছে পদকর্তাদের গানই যথেষ্ট। নামে এসব টিপছাপ থাকা না থাকায় কিছু যায় আসে না।

বাংলা কবিতার গোড়া বাঁধা হয়েছিল বাস্তব জীবনের মধ্যে। শ্রমজীবী মানুষের সঙ্গে তার ছিল নাড়ির যোগ। চর্যাগানই তার জলজ্যান্ত প্রমাণ।

আধুনিক বাংলা কবিতা সেই পদকর্তাদেরই উত্তরশরিক।

আমার এই অনুবাদের কাজে আর ভূমিকা লেখায়—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, মুহম্মদ শহীদুল্লা, সুকুমার সেন, শশিভূষণ দাশগুপ্ত,

প্রবোধচন্দ্র বাগচী, নীহাররঞ্জন রায়, পের্ কৃভের্নে—অল্পবিস্তর এঁদের সবার কাছেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আমি ঋণী। কিন্তু অনুবাদের ক্ষেত্রে সর্বত্র শুধুই একজনকে আমি অনুসরণ করিনি। যেখানে যাঁকে মনে ধরেছে তাঁর সঙ্গ নিয়েছি। কোথাও নিজেই দিয়েছি অন্ধকারে ঝাঁপ।

সুমঙ্গল রাণা-র 'চর্যাগীতি পঞ্চাশিকা' হঠাৎ হাতে এসে গিয়েছিল। কিন্তু সেই বই থেকেই আমি রসদ পেয়েছি সবচেয়ে বেশি। অবশেষে জানাই এই সানন্দ স্বীকৃতি।

এ বই প্রকাশের ঝুঁকি যাঁর কাঁধে চাপিয়েছি, সেই জ্যোতি পাঠক সাহিত্য-রসিক এবং দিলদরাজ। আশা করছি, পাঠকদের সাহায্য পেলে সে বোঝার ভার কিছুটা হালকা হবে।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

চর্যা ১

লুইপাদ

রাগ পটমঞ্জরী

কাআ তরুবর পঞ্চ বি ডাল।
চঞ্চল চীএ পইঠো কাল ॥
দিঢ় করিঅ মহাসুহ পরিমাণ।
লুই ভণই গুরু পুচ্ছিঅ জাণ ॥
সঅল স(মা)হিঅ কাহি করিঅই।
সুখ দুখেতেঁ নিচিত মরিঅই ॥
এড়িএউ ছান্দক বান্ধ করণক পাটের আস।
সুনুপাখ ভিতি লাহু রে পাস ॥
ভণই লুই আম্‌হে সাণে দিঠা।
ধমণ চমণ বেণি পাণ্ডি বইঠা ॥

চর্যার পদানুসরণে ১

শরীর বৃক্ষে পাঁচখানি ডাল
মন চঞ্চল, ঢুকে আছে কাল।
পাও যাতে মহাসুখ ঠিক বুঝে
লুই বলে, নাও সদ্‌গুরু খুঁজে।
সুখ দুঃখের সংসারে যবে
মৃত্যুই ধ্রুব, সমাধি কী হবে?
কপাটে ছন্দ বন্ধন থুয়ে
থাক শূন্যের পাখা পাশ ছুঁয়ে।
লুই বলে, ধ্যানে পাই দর্শন
পেতে দুই পিঁড়ি ধমন চমন ॥

চর্যা ২

কুক্কুরীপাদ

রাগ গবড়া

দুলি দুহি পিটা ধরণ ন জাই।
রুখের তেন্তলী কুম্ভীরে খাঅ॥
আঙ্গন ঘরপণ সুন ভো বিআতী।
কানেট চৌরি নিল অধরাতী॥
সুসুরা নিদ গেল বহুড়ী জাগঅ।
কানেট চোরে নিল কা গই মাগঅ॥
দিবসই বহুড়ী কাড়ই ডরে ভাঅ।
রাতি ভইলে কামরু জাঅ॥
অইসন চর্য্যা কুক্কুরীপাএঁ গাইড়।
কোড়ি মঝেঁ একু হিঅহিঁ সমাইড়॥

চর্যার পদানুসরণে ২

কাছিম দোয়ালে উপ্‌চিয়ে পড়ে কেঁড়ে
গাছের তেঁতুল কুমিরেই খায় পেড়ে।
শোন্ বউ, তোর উঠোনেই ঘরদোর
মাঝরাতে কানি নিয়ে গেল কোন্ চোর।
শাশুড়ি ঘুমোয়, বধূ ঠায় জেগে আছে
চোরে নিল কানি, গিয়ে চায় কার কাছে?
দিনমানে বধূ কাকের ভয়েই চুপ
রাতে কিন্তু সে চ'লে যায় কামরূপ।
কুক্কুরীপাদ গান গায়, তার মানে
কোটির মধ্যে একজনই শুধু জানে॥

চর্যা ৩

বিরুবাপাদ

রাগ গবড়া

এক সে শুণ্ডিনী দুই ঘরে সান্ধঅ।
চীঅণ বাকলঅ বারুণী বান্ধঅ॥
সহজে থির করী বারুণী সান্ধে।
জেঁ অজরামর হোই দিঢ় কান্ধ॥
দশমি দুআরত চিহ্ন দেখিআ।
আইল গরাহক অপণে বহিআ॥
চউশঠী ঘড়িয়ে দেল পসারা।
পইঠেল গরাহক নাহি নিসারা॥
এক ঘড়ুলী সরুই নাল।
ভণন্তি বিরুআ থির করি চাল॥

চর্যার পদানুসরণে ৩

এক শুঁড়িবউ সেঁধায় দু ঘরে
পাকায় বারুণী চিকন বাকড়ে।
সহজে এমন টান ক'রে বাঁধে
অজর অমর হয় দৃঢ় কাঁধে।
দশমী দুয়ারে নিশানা থাকায়
তা দেখে গ্রাহক নিজে এসে যায়।
চৌষট্টিটা ঘড়া সারে সার
যে ঢোকে সে মোটে বেরোয় না আর।
ছোট এক ঘটি, তাতে সরু নল
বিরূপা বলছে, থাকো অবিচল॥

চর্যা ৪

গুণ্ডরীপাদ

রাগ অরু

তিঅড্ডা চাপী জোইনি দে অঙ্কবালী।
কমল কুলিশ ঘাণ্ট করহুঁ বিআলী॥
জোইনি তঁই বিনু খনহিঁ ন জীবমি।
তো মুহ চুম্বী কমলরস পীবমি॥
খেঁপহু জোইনি লেপ ন জাঅ।
মণিকুলে বহিআ ওড়িআণে সমাঅ॥
সাসু ঘরেঁ ঘালি কোঞ্চা তাল।
চান্দ সুজ বেণি পখা ফাল॥
ভণই গুণ্ডরী অহ্মে কুন্দুরে বীরা।
নরঅ নারী মঝেঁ উভিল চীরা॥

চর্যার পদানুসরণে ৪

কোলে নে যোগিনি, ত্রিভঙ্গে ধর সেঁটে
দিন গেল স্রেফ কমলকুলিশ ঘেঁটে।
ক্ষণ মাত্রও বাঁচব না তুই বিনে
ও-মুখকমলে মধু মেলে চুম্বনে।
ছুঁড়ে দিলেও সে গায়ে মাখে নাকো মোটে
মণিমূল বেয়ে উষ্ণীষে ঠেলে ওঠে।
দমঘরে ঢুকে তালাচাবি তুমি আঁটো
চাঁদসূর্যের দুই পক্ষকে কাটো।
গুণ্ডরী বলে, আমি কন্দরবীর
নরনারী মাঝে ধারণ করেছি চীর॥

চর্যা ৫

চাটিল্লপাদ

রাগ গুর্জরী

ভবণই গহণ গম্ভীর বেগেঁ বাহী।
দুআন্তে চিখিল মাঝেঁ ন থাহী॥
ধামার্থে চাটিল সাঙ্কম গঢ়ই।
পারগামি লোঅ নিভর তরই॥
ফাড্ডিঅ মোহতরু পাটি জোড়িঅ।
অদঅদিটি টাঙ্গী নিবাণে কোরিঅ॥
সাঙ্কমত চড়িলে দাহিণ বাম মা হোহী।
নিয়ড়ী বোহি দূর মা জাহী॥
জই তুম্হে লোঅ হে হোইব পারগামী।
পুচ্ছতু চাটিল অনুত্তরসামী॥

চর্যার পদানুসরণে ৫

বেগে বয়ে যায় ভবনদী গম্ভীর
মাঝে থই নেই, কাদামাখা দুই তীর।
ধর্মের সাঁকো চাটিল দিয়েছে গ'ড়ে
পারাপার হয় লোকে তাতে ভর ক'রে।
মোহতরু ফেড়ে পাটাগুলো সব জোড়ো
অদ্বয় টাঙি নির্বাণে হোক দড়ো।
সাঁকোয় চ'ড়লে ডানবাঁ হ'য়ো না যেন
যেয়ো না কো দূরে, নিকটেই বোধি জেনো।
চাটিল হলেন সবচেয়ে বড় সাঁই
যারা পার হবে চ'লে যাও তাঁর ঠাঁই॥

ভুসুকুপাদ

রাগ পটমঞ্জরী

কাহেরে ঘিনি মেলি আচ্ছহু কীস।
বেটিল হাক পড়অ চৌদীস॥
অপণা মাংসেঁ হরিণা বৈরী।
খনহ ন ছাড়অ ভুসুকু অহেরি॥
তিণ ন চ্ছুপই হরিণা পিবই ন পানী।
হরিণা হরিণীর নিলঅ ণ জানী॥
হরিণী বোলঅ সুণ হরিণা তো।
এ বণ চ্ছাড়ী হোহু ভান্তো॥
তরংগতে হরিণার খুর ন দীসঅ।
ভুসুকু ভণই মূঢ় হিঅহি ণ পইসই॥

চর্যার পদানুসরণে ৬

কাকে নিয়ে কিসে আছো কাকে ছেড়ে
শোনো হাঁক পড়ে চৌদিক বেড়ে।
হরিণের নিজ মাংস বৈরী
পিছনে নাছোড় ভুসুকু আহেরী।
ছোঁয় না হরিণ—না জল, না তৃণ
হরিণীর ডেরা জানে না হরিণও।
হরিণী বলছে : ও হরিণ, শোন্—
ভুল ক'রে ছেড়ে যাস্‌নে এ বন।
ছুটল সে, দেখা গেল না কো খুরও
ভুসুকু বলছে বুঝবে না মূঢ়॥

চর্যা ৭

কাহ্নুপাদ

রাগ পটমঞ্জরী

আলিএঁ কালিএঁ বাট রুন্ধেলা।
তা দেখি কাহ্নু বিমন ভইলা॥
কাহ্নু কহিঁ গই করিব নিবাস।
জো মনগোঅর সো উআস॥
তে তিনি তে তিনি তিনি হো ভিন্না।
ভণই কাহ্নু ভব পরিচ্ছিন্না॥
জে জে আইলা তে তে গেলা।
অবণাগবণে কাহ্নু বিমন ভইলা॥
হেরি সে কাহ্নি নিঅড়ি জিনউর বট্টই
ভণই কাহ্নু মো হিঅহি ন পইসই॥

চর্যার পদানুসরণে ৭

পথ রুখে দেয় আল ও আঁধার
দেখে কাহ্নুর মন হল ভার।
কাহ্নু কোথায় গিয়ে বাঁধে ঘর
সেও দূরস্থ যে মনোগোচর।
যে তিন সে তিন তিনই ভিন্ন
ভবসংসার কী বিচ্ছিন্ন।
যারা এসেছিল চলে গেছে ফের
কাহ্নুর কাছে সেটা দুঃখের।
সামনেই চোখে পড়ে জিনপুর
হৃদয়ে পশে না তবু কাহ্নুর॥

চর্যা ৮

কম্বলাম্বরপাদ

রাগ দেবক্রী

সোনে ভরিতী করুণা নাবী।
রূপা থোই নাহিক ঠাবী॥
বাহতু কামলি গঅণ উবেসেঁ।
গেলী জাম বহু উই কইসেঁ।
খুন্টি উপাড়ী মেলিলি কাচ্ছি।
বাহতু কামলি সদ্‌গুরু পুচ্ছি॥
মাঙ্গত চড়্‌হিলে চউদিস চাহঅ।
কেডুআল নাহি কেঁ কি বাহবকে পারঅ॥
বাম দাহিণ চাপী মিলি মিলি মাঙ্গা।
বাটত মিলিল মহাসুহ সাঙ্গা॥

চর্যার পদানুসরণে ৮

করুণার তরী ভরেছি সোনায়
রুপো রাখবার ঠাঁই সেই নায়।
বাও রে, কামলি, ঊর্ধ্ব গগনে
যে জন্ম গেল, ফেরে সে কেমনে?
খুঁটি উপ্‌ড়াও, কাছি যেন খোলে
নৌকা বাও হে, জয়গুরু ব'লে।
মাস্তলে চ'ড়ে দেখ চারি ধার
কে পারে বাইতে না থাকলে দাঁড়।
বামডান মেপে বুঝে তরঙ্গ
পথে মেলে মহাসুখের সঙ্গ॥

চর্যা ৯

কাহ্নুপাদ

রাগ পটমঞ্জরী

এবংকার দৃঢ় বাখোড় মোড্ডিউ।
বিবিহ বিআপক বান্ধন তোড়িউ॥
কাহ্নু বিলসঅ আসবমাতা।
সহজ নলিনীবন পইসি নিবিতা॥
জিম জিম করিণা করিণিরেঁ রিসঅ।
তিম তিম তথতা মঅগল বরিসঅ॥
ছড়গই সঅল সহাবে সুধ।
ভাবাভাব বলাগ ন ছুধ॥
দশবলরঅণ হরিঅ দশ দিসেঁ।
(অ)বিদ্যাকরিকুঁ দম অকিলেসেঁ॥

চর্যার পদানুসরণে ৯

এ-রূপের কড়া বল্কল ছুলে
বিবিধ ব্যাপক বন্ধন খুলে।
মাতাল কাহ্নু টলমল পায়
সহজ পদ্মবনে ঢুকে যায়।
করিণীর টানে করী বাঁধা পড়ে
বিগলিত মদমত্ততা ঝরে।
ষড়্গতি সব সাফসুফ ধোয়া
অচ্ছুত নয় হওয়া বা না-হওয়া।
হৃত দশবলমণি দশদিকে
বাঁধো অক্লেশে মায়াহস্তিকে॥

চর্যা ১০

কাহ্নুপাদ

রাগ দেশাখ

নগর বাহিরি রে ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ।
ছোই ছোই জাহ সো বাহ্ম নাড়িআ॥
আলো ডোম্বি তোএ সম করিব ম সাঙ্গ।
নিঘিণ কাহ্ন কাপালি জোই লাংগ॥
এক সো পদুমা চৌষঠ্‌ঠী পাখুড়ী।
তহিঁ চড়ি নাচঅ ডোম্বী বাপুড়ী॥
হা লো ডোম্বি তো পুছমি সদভাবে।
আইসসি জাসি ডোম্বি কাহরি নাবেঁ॥
তান্তি বিকণঅ ডোম্বি অবর না চাংগেড়া।
তোহোর অন্তরে ছাড়ি নড়পেড়া॥
তু লো ডোম্বী হাঁউ কপালী।
তোহোর অন্তরে মোএ ঘেণিলি হাড়ের মালী॥
সরবর ভাঞ্জিঅ ডোম্বী খাঅ মোলাণ।
মারমি ডোম্বি লেমি পরাণ॥

চর্যার পদানুসরণে ১০

নগর ছাড়িয়ে, ও ডোম্‌নি, তোর কুঁড়ে
ন্যাড়া বামুনটা ছুঁয়ে তোকে যায় দূরে।
ওলো, তোর সাথে হতে চাই আমি লগ্ন
নির্ঘৃণ কাহ্নু কাপালিক যোগী নগ্ন।
যে চৌষট্টি পাপ্‌ড়ি পদ্মে আছে
তা'তে চ'ড়ে বাছা ডোম্‌নি কেমন নাচে।
সদ্‌ভাবে তো'কে করি আমি জিজ্ঞাসা

কার নৌকোয় তোর অত যাওয়াআসা ?
বেচিস্ তো তাঁত, চাঙাড়ি তো নয় আর
আমিও করেছি নট সাজা পরিহার
আমি কাপালিক, তুই হলি ডোমবালা
তোর জন্যেই পরেছি হাড়ের মালা।
জল ভেঙে বটে মৃণাল তো তুই খাস
মারব ডোম্‌নি, কেড়ে নেব তোর শ্বাস ॥

চর্যা ১১

কৃষ্ণাচার্যপাদ

রাগ পটমঞ্জরী

নাড়ি শক্তি দিঢ় ধরিঅ খট্টে।
অনহা ডমরু বাজই বীরনাদে ॥
কাহ্ন কপালী যোগী পইঠ অচারে।
দেহ নঅরী বিহরই একাকারেঁ ॥
আলি কালি ঘণ্টা নেউর চরণে।
রবি শশী কুণ্ডল কিউ আভরণে ॥
রাগ দেষ মোহ লাইঅ ছার।
পরম মোখ লবএ মুত্তাহার ॥
মারিঅ শাসু নণন্দ ঘরে শালী।
মাঅ মারিআ কাহ্ন ভইল কবালী ॥

চর্যার পদানুসরণে ১১

নাড়িশক্তিকে টেনে মেলে ধ'রে
বাজে অনাহত ডমরু সজোরে।

দেহনগরীতে ঢুকে যথাচারে
কাহ্নু কপালী ঘোরে একাকারে।
চরণে নূপুর স্বরব্যঞ্জন
রবিশশী তাঁর কর্ণাভরণ।
রাগদ্বেষমোহ পুড়ে ছারখার
পরম মোক্ষ মুক্তোর হার।
শাশুড়িকে মেরে ননদের ঘরে
কাহ্নু কপালী হয়, মায়া মরে॥

চর্যা ১২

কৃষ্ণপাদ

রাগ ভৈরবী

করুণা পিহাড়ি খেলহুঁ নঅবল।
সদ্‌গুরু বোহেঁ জিতেল ভববল॥
ফীটউ দুআ মাদেসি রে ঠাকুর।
উআরি উএসেঁ কাহ্ন ণিঅড জিনউর॥
পহিলেঁ তোড়িআ বড়িআ মারিউ।
গঅবরেঁ তোড়িআ পাঞ্চজনা ঘালিউ॥
মতিএঁ ঠাকুরক পরিণিবিতা।
অবশ করিআ ভববল জিতা॥
ভণই কাহ্নু আহ্মে ভাল দান দেহুঁ।
চউষঠ্‌ঠি কোঠা গুণিআ লেহুঁ॥

চর্যার পদানুসরণে ১২

করুণার ছকে খেলি নববল
গুরুর মন্ত্রে জিতি ভববল।

দুই সরাতেই মাৎ যে, ঠাকুর—
ফড়ে বলে : কানু, কাছে জিনপুর।
ব'ড়ে মেরে করি পয়লা সূচনা।
হয়েছে ঘায়েল গজে পাঁচজনা।
কোণঠাসা হয়ে ঠাকুর বিকল
মন্ত্রীর জোরে জিতি ভববল।
কানু বলে, আমি ভালো দান দিই
চৌষট্টিটা ঘর গুণে নিই॥

চর্যা ১৩

কৃষ্ণাচার্যপাদ

রাগ কামোদ

তিশরণ ণাবী কিঅ অঠকমারী।
নিঅ দেহ করুণা শূণমে হেরী॥
তরিত্তা ভবজলধি জিম করি মাঅ সুইনা।
মঝ বেণী তরঙ্গম মুনিআ॥
পঞ্চ তথাগত কিঅ কেডুআল।
বাহঅ কাঅ কাহ্নিল মাআজাল॥
গন্ধ পরস রস জইসোঁ তইসোঁ।
নিংদ বিহুনে সুইনা জইসো॥
চিঅ কন্নহার সুণত মাঙ্গে।
চলিল কাহ্ন মহাসুহ সাঙ্গে॥

চর্যার পদানুসরণে ১৩

আটটি কামরা ত্রিশরণ নায়
শূন্যে করুণা দেখে নিজ কায়।

পেরোয় জলধি স্বপ্নের ঘোরে
মাঝগাঙে কিবা ঢেউ ওঠে পড়ে
কানু, হোক পাঁচ তথাগত দাঁড়
কায়া বেয়ে হও মায়াজাল পার।
গন্ধ স্পর্শ রস যথাযথ
জেগে থেকে দেখা স্বপ্নের মত।
শূন্যমার্গে মন ধরে হাল
কানু চায় মহাসুখের নাগাল॥

চর্যা ১৪

ডোম্বীপাদ

ধনসী রাগ

গঙ্গা জউনা মাঝেঁ রে বহই নাঈ।
তহিঁ বুড়িলি মাতঙ্গী যোইআ লীলে পার করেই॥
বাহতু ডোম্বী বাহ লো ডোম্বী বাটত ভইল উছারা।
সদ্‌গুরু পাঅপসাএ জাইব পুণু জিণউরা॥
পাঞ্চ কেডুআল পড়ন্তে মাঙ্গে পিঠত কাচ্ছী বান্ধি।
গঅণ দুখোলেঁ সিঞ্চহু পাণী ন পইসই সান্ধি॥
চান্দ সূজ্জ দুই চকা সিঠি সংহার পুলিন্দা।
বাম দাহিণ দুই মাগ ন চেবই বাহতু ছন্দা॥
কবড়ী ন লেই বোড়ী ন লেই সুচ্ছড়ে পার করেই।
জো রথে চড়িলা বাহবা ণ জা(ন)ই কুলেঁ কূল বুড়ই॥

চর্যার পদানুসরণে ১৪

গঙ্গা ও যমুনার মাঝখানে
ব'য়ে চলে এক নদী।

হেলায় করবে পার সে যোগীকে
ডোবে সেইখানে যদি।
বাও রে ডোম্‌নি, পথে হল দেরি
যেতে হবে ঢের দূর।
সদ্‌গুরুপাদ প্রসাদে যাই রে
পুনরায় জিনপুর।
পিঠে বাঁধা কাছি, তালে তালে ঠিক
পড়ে দাঁড় পাঁচখানি।
গগনের দুই খোল ছেঁচে চলো
যেন সেঁধায় না পানি।
চাঁদ ও সূর্য দুই চাকা; মাস্তলে
সৃষ্টি ও সংহার।
বামেদক্ষিণে না চেয়ে, ডোম্‌নি
অনায়াসে করো পার।
পারাণীর কড়ি নেয় না সে বুড়ি
হেসেখেলে পার করে।
যে আরোহী রথ বাইতে জানে না
ডাঙাতে সে ঘুরে মরে॥

চর্যা ১৫

শান্তিপাদ

রাগ রামক্রী

সঅসম্বেঅণ সরুঅবিআরেঁ অলকৃখ লক্‌খণ ন জাই।
জে জে উজ্‌বাটে গেলা অনাবাটা ভইলা সোই॥
কুলেঁ কুল মা হোই রে মূঢ়া উজ্‌বাট সংসারা।
বাল ভিণ একু বাকু ণ ভূলহ রাজপথ কন্ধারা॥

মাআ মোহ সমুদা রে অন্ত ন বুঝসি থাহা।
আগে নাব ন ভেলা দীসঅ ভন্তি ন পুচ্ছসি নাহা॥
সুনা পান্তর উহ ন দীসই ভান্তি ন বাসসি জান্তে।
এষা অটমহাসিদ্ধি সিঝই উজ্বাট জাঅন্তে॥
বাম দাহিণ দো বাটা চ্ছাড়ী শান্তি বুলথেউ সংকেলিউ।
ঘাট ন গুমা খড়তড়ি ণ হোই আখি বুজিঅ বাট জাইউ

চর্যার পদানুসরণে ১৫

স্বসংবেদ্য স্বরূপ বিচারে
পড়ে না লক্ষ্যে মোটে অলক্ষ্য
যারা গেছে ঋজু পথে একবার
ফেরেনি কখনও, লভেছে মোক্ষ।
সংসারে ঋজুপথ থাকতেও
কূলে কূলে কোন্ মূর্খ বেড়ায়
একতিল বাঁকা পথে ঘুরিস্‌নে
চল রাজপথে কনকধারায়।
মায়া ও মোহের মহাসমুদ্রে
বুঝিস্ নে কোথা অন্ত বা শুরু
সামনে না দেখে নৌকো বা ভেলা
সুধালে সে ভ্রম ভেঙে দেন গুরু।
পাড়ি দিতে যেন যাস্‌নে কো ভুলে
দিশা না পেলেও ধূ-ধূ প্রান্তরে
এখানে অষ্ট মহাসিদ্ধির
দেখা পাবি গেলে ঋজুপথ ধ'রে।
বামদক্ষিণ দু পথ এড়িয়ে
সাধকেরা যেন চোখ বুজে হাঁটে
না ঘাঁটি-গুল্ম, না ডাঙা-ডহর—
শান্তি একথা বলেছেন সাঁটে॥

চর্যা ১৬

মহীধরপাদ

রাগ ভৈরবী

তিনিএঁ পাটেঁ লাগেলি রে অণহ কসণ ঘন গাজই।
তা সুনি মার ভয়ঙ্কর রে বিসঅমণ্ডল সঅল ভাজই॥
মাতেল চীঅগএন্দা ধাবই।
নিরন্তর গঅণন্ত তুসেঁ ঘোলই॥
পাপ পুণ্য বেণি তোড়িঅ সিকল মোড়িঅ খম্ভাঠাণা।
গঅণ টাকলি লাগি রে চিত্ত পইঠ নিবাণা॥
মহারসপানে মাতেল রে তিহুঅন সএল উএখী।
পঞ্চবিসঅনায়ক রে বিপখ কোবী ন দেখি॥
খররবিকিরণ সন্তাপেঁ রে গঅণাঙ্গণ গই পইঠা।
ভণন্তি মহিত্তা মই এথু বুড়ন্তে কিম্পি ন দিঠা॥

চর্যার পদানুসরণে ১৬

ত্রিপাটে লাগল অনাহত ধ্বনি
ঘনকালো মেঘ সে কী গর্জায়
তা শুনে বিষয়মণ্ডল সব
কী ভয়ঙ্কর মারে ভেঙে যায়।
ধায় গজেন্দ্র মাতাল চিত্ত
দিগন্তে তুঁষ ঘোলায় নিত্য।
পাপপুণ্যের বেণী ছিঁড়ে দিয়ে
ভেঙে শৃঙ্খল স্তম্ভস্থানের
চিত্ত করেছে নির্বাণ লাভ
দিয়ে টকাটক গগনকে বেড়।
মহারসপানে হয়ে সে মাতাল
করে উপেক্ষা গোটা ত্রিভুবন

নায়ক পঞ্চবিষয়ের বটে,
কোনো বিপক্ষ দেখে না নয়ন।
খররৌদ্রের নিদারুণ তাপে
মন্দাকিনীতে সে দিয়েছে ঝাঁপ
বলে মহীধর, ডুবে এইখানে
চোখে তো পড়ে না কই কোনো ছাপ॥

চর্যা ১৭

বীণাপাদ

রাগ পটমঞ্জরী

সুজ লাউ সসি লাগেলি তান্তী।
অণহা দাণ্ডী একি কিঅত অবধূতী॥
বাজই আলো সহি হেরুঅবীণা।
সুনতান্তিধনি বিলসই রুণা॥
আলি কালি বেণি সারি সুণিআ।
গঅবর সমরস সান্ধি গুণিআ॥
জবে করহা করহকলে চাপিউ।
বতিশ তান্তি ধনি সঅল বিআপিউ॥
নাচন্তি বাজিল গান্তি দেবী।
বুদ্ধ নাটক বিসমা হোই॥

চর্যার পদানুসরণে ১৭

লাউতে সূর্য, তন্ত্রীতে চাঁদ যুতি
অনাহত গ্রীবা, চাকী হয় অবধূতি

হেরুকের বীণা, ওলো সখি, শোন্‌
মিলায় শূন্যে সে অনুরণন।
স্বরের পর্দা স্বরে ব্যঞ্জনে
সন্ধিতে গজ সমরস গোণে।
ঘাটে ঘাটে যেই টিপে দেয় কর
বত্রিশ তারে মূর্ছিত স্বর।
নাচেন ঠাকুর, দেবী গান গীত
বুদ্ধনাটক হয় বিপরীত ॥

চর্যা ১৮

কৃষ্ণবজ্রপাদ

রাগ গউড়া

তিনি ভুঅণ মই বাহিঅ হেলেঁ।
হাঁউ সুতেলি মহাসুহ লীলেঁ ॥
কইসণি হালো ডোম্বী তোহোরি ভাভরিআলী ।
অন্তে কুলিণজণ মাঝেঁ কাবালী ॥
তঁইলো ডোম্বী সঅল বিটালিউ।
কাজণ কারণ সসহর টালিউ ॥
কেহো কেহো তোহোরে বিরুআ বোলই।
বিদুজণ লোঅ তোরেঁ কণ্ঠ ন মেলঈ ॥
কাহ্নে গাই তু কামচণ্ডালী।
ডোম্বি ত আগলি নাহি চ্ছিণালী ॥

•

চর্যার পদানুসরণে ১৮

হেলাভরে আমি বাই ত্রিভুবন
মহাসুখনীড়ে আমার শয়ন।

লো ডোম্‌নি, তোর এ কী চতুরালি
বাইরে কুলীন, ভেতরে কপালী।
সব কিছু তুই করলি নষ্ট
ছিল চাঁদ, সেও অযথা ভ্রষ্ট।
কেউ কেউ তোর বিরুদ্ধে বলে
গুণীদের বাহুমালা তোর গলে।
কাহ্নু গাইছে কামচণ্ডালী
ডোম্‌নীর বাড়া নেই কো ছিনালী॥

চর্যা ১৯

কৃষ্ণপাদ

রাগ ভৈরবী

ভবনির্ব্বাণে পড়হ মাদলা।
মণ পবণ বেণি করণ্ড কশালা॥
জঅ জঅ দুন্দুহিসাদ উছলিআঁ।
কাহ্ন ডোম্বী বিবাহে চলিআ॥
ডোম্বী বিবাহিআ অহারিউ জাম
জউতুকে কিঅ আণুতু ধাম॥
অহণিসি সুরঅপসঙ্গে জাঅ।
জোইণিজালে রঅণি পোহাঅ॥
ডোম্বীএর সঙ্গে জো জোই রত্তো
খণহ ন ছাড়অ সহজ উন্মত্তো॥

চর্যার পদানুসরণে ১৯

ভব নির্বাণে ঢোল পাখোয়াজ
মন ও পবন বাঁশী আর ঝাঁঝ।

দামামায় বাজে জয়-হে জয়-হে
কাহ্নু ডোম্‌নি চলেছে বিবাহে।
ডোম্‌নিকে পেয়ে মিটেছে জন্ম
যৌতুকে দেয় পরম ধর্ম।
দিবানিশি যায় সুরতক্রিয়ায়
যোগিনীর দলে রজনী পোহায়।
যে যোগীর মন ডোম্‌নিতে মজে
ক্ষণেক ছাড়ে না, মাতে সে সহজে॥

চর্যা ২০

রাগ পটমঞ্জরী

হাঁউ নিরাসী খমণভতারে।
মোহোর বিগোআ কহণ ন জাই॥
ফেটলিউ গো মাএ অন্তউরি চাহি।
জা এথু চাহাম সো এথু নাহি॥
পহিল বিআণ মোর বাসনপূড়া।
নাড়ি বিআরন্তে সেব বাপুড়া॥
জাণ জৌবণ মোর ভইলেসি পূরা।
মূল নখলি বাপ সংঘারা॥
ভণতি কুক্কুরীপা এ ভব থিরা।
জো এথু বুঝএঁ সো এথু বীরা॥

চর্যার পদানুসরণে ২০

আমি থাকি পথে, স্বামী ক্ষপণক
কী সুখ আমার, কওয়া যায় না কো

চাই যে আঁতুড়, করেছি খালাস
মন রে, পাবি না এখানে যা চাস।
প্রথমে বিয়াই আমার বাসনা
নাড়ি কেটে দিতে তাও রইল না।
গিয়েছে জীবন যৌবন ভ'রে
বাপকে মেরেছি যে ছিল শিকড়ে।
কুক্কুরী বলে, সংসার স্থির
একথা যে বোঝে জানবে সে বীর ॥

চর্যা ২১

ভুসুকুপাদ

রাগ বরাড়ী

নিসি অন্ধারী মুসাঅ চারা।
অমিঅ ভখঅ মুসা করঅ আহারা ॥
মার রে জোইআ মুসা পবণা।
জেঁণ তুটঅ অবণা গবণা ॥
ভববিন্দারঅ মুসা খণঅ গাতী।
চঞ্চল মুসা কলিআঁ নাশক থাতী ॥
কাল মুসা উহ ণ বাণ।
গঅণে উঠি চরঅ অমণ ধাণ ॥
তব সে মুসা উঞ্চল পাঞ্চল।
সদ্‌গুরু বোহে করহ সো নিচ্চল ॥
জবেঁ মুসাএর চার তুটঅ।
ভুসুকু ভণঅ তবেঁ বান্ধন ফিটঅ ॥

মূষিক আঁধার রাত্রিতে ঘোরে
আহারে অমৃত ভক্ষণ করে।
মারো রে, যোগীরা, মূষিক পবন
যেন টুটে যায় গমনাগমন।
গর্ত খোঁড়ে সে ইহলোক ফুঁড়ে
চাপল্যে নাশ করে অঙ্কুরে।
কালো সে মূষিক বর্ণ বিহনে
আমনের ক্ষেতে সে চরে গগনে।
থামে না কো তার হাঁচর পাঁচর
গুরুর মন্ত্রে না হলে নিথর।
ভুসুকু বলেন, কাটে বন্ধন
যবে মূষিকের থামে বিচরণ॥

চর্যা ২২

সরহপাদ

রাগ গুঞ্জরী

অপণে রচি রচি ভবনির্বাণা।
মিছেঁ লোঅ বন্ধাবএ অপণা॥
অম্হে ন জানহুঁ অচিন্ত জোই।
জাম মরণ ভব কইসণ হোই॥
জইসো জাম মরণ বি তইসো।
জীবন্তে মঅলেঁ ণাহি বিশেসো॥
জা এথু জাম মরণে বিসঙ্কা।
সো করউ রস রসানেরে কঙ্খা॥

জে সচরাচর তিঅস ভমন্তি।
তে অজরামর কিম্পি ন হোন্তি॥
জামে কাম কি কামে জাম।
সরহ ভণতি অচিন্ত সো ধাম॥

চর্যার পদানুসরণে ২২

ভবনির্বাণ মনে মনে এঁকে
মিছে লোকে বাঁধে নিজেই নিজেকে।
অচিন্ত্যযোগি! জানা আছে বাকি
জন্মই বা কী, মৃত্যুই বা কী।
যেমন জন্ম, তেমনি মরণও
জীবিতে ও মৃতে ভেদ নেই কোনো।
যে ডরায় হেথা জন্মে মরণে
মন দেয় যেন রসে রসায়নে।
চরাচর নিয়ে ত্রিদশ সফর
ক'রেও হয় না অজর অমর।
জন্মে কাজ, না কাজেই জন্ম
সরহ বলেন, গূঢ় সে ধর্ম॥

চর্যা ২৩

ভুসুকুপাদ

রাগ বড়ারী

জই তুম্হে ভুসুকু অহেরি জাইবেঁ মারিহসি পঞ্চজণা।
নলিনীবন পইসন্তে হোহিসি একুমনা॥
জীবন্তে ভেলা বিহণি মএল রঅণি।
হণ বিণু মাঁসে ভুসুকু পদ্মবণ পইসহিণি॥

মাআজাল পসরি উরে বধেলি মাআহরিণী ।
সদ্‌গুরু বোহেঁ বুঝি রে কাহ্ন কদিনি ॥

চর্যার পদানুসরণে ২৩

ও ভুসুকু, তুমি শিকারে যাবে তো
মেরে এনো পাঁচ জনা
পদ্মের বনে ঢুকবে যখন
হ'য়ো অনন্যমনা ।
প্রাণ পেয়ে বেঁচে উঠেছে প্রভাতে
রজনীতে গেছে ম'রে
মাংস না নিয়ে পদ্মের বনে
ভুসুকু যায় কী ক'রে ।
মায়ার জালটি পেতে দিয়ে হল
মায়াহরিণীকে বাঁধা
বোঝা যাবে সদ্‌গুরুর বাক্যে
কাহিনীর সেই ধাঁধা ॥

চর্যা ২৬

শান্তিপাদ

রাগ শীবরী

তুলা ধুণি ধুণি আঁসু রে আঁসু ।
আঁসু ধুণি ধুণি ণিরবর সেসু ॥
তউসে হেরুঅ ণ পাবিঅই ।
সান্তি ভণই কিণ স ভাবিঅই ॥
তুলা ধুণি ধুণি সুনে অহারিউ ।
শূণ লইআঁ অপণা চটারিউ ॥

বহল বাট দুই মার ন দিশঅ।
শান্তি ভণই বালাগ ন পইসঅ॥
কাজ ন কারণ জ এহু জুগতি।
সঅসঁবেঅণ বোলথি সান্তি॥

চর্যার পদানুসরণে ২৬

তুলো ধুনে ধুনে আঁশ ক'রে থুই
আঁশ ধুনে শেষে রয় না কিছুই।
ওতে হেরুকের পাবি নে হদিশ
শান্তি বলেন, কেন বা ভাবিস।
তুলো ধুনে ভরি শূন্যের খাঁই
নিজেই আবার নিজেকে খোয়াই।
শান্তি বলেন, যায় না বালকে।
পথে দুপ্রান্ত পড়ে না যে চোখে।
এমন কাজ যা হয় অকারণ
শান্তি বলে, তা স্বসংবেদন॥

চর্যা ২৭

ভুসুকুপাদ

রাগ কামোদ

অধরাতি ভর কমল বিকসিউ।
বতিস জোইণী তসু অঙ্গ উহ্লসিউঃ॥
চালিঅ ষষহর মাগে অবধূই।
রঅণহু ষহজে কহেই॥
চালিঅ ষষহর গউ ণিবাণেঁ।

কমলিনি কমল বহই পণালেঁ ॥
বিরমানন্দ বিলক্ষণ সুধ।
জো এথু বুঝই সো এথু বুধ ॥
ভুসুকু ভণই মই বুঝিঅ মেলেঁ
সহজানন্দ মহাসুহ লীলেঁ ॥

চর্যার পদানুসরণে ২৭

মাঝরাতে মেলে শতদল চোখ
বত্রিশ নাড়ি অঙ্গে পুলক।
চাঁদ চলে অবধূতির মার্গে
সহজ মেলায় রত্ন ভাগ্যে
শশধর পায় নির্বাণে ঠাঁই
কমলিনী মধু মৃণালে বহায়।
বিরামের সুখ পরম শুদ্ধ
এ কথা যে বোঝে সেই তো বুদ্ধ।
আছে মহাসুখ বুঝেছি মিলনে
এ সহজ কথা ভুসুকুপা ভণে ॥

চর্যা ২৮

শবরপাদ

রাগ বলাড্ডি

উঁচা উঁচা পাবত তহিঁ বসই সবরী বালী।
মোরঙ্গি পীচ্ছ পরহিণ সবরী গিবত গুঞ্জরী মালী ॥
উমত সবরো পাগল সবরো মা কর গুলী
গুহাড়া তোহৌরি।

ণিঅ ঘরিণী নামে সহজ স্থন্দারী ॥
নানা তরুবর মৌলিল রে গঅণত লাগেলী ডালী ।
একেলী সবরী এ বণ হিণ্ডই কর্ণকুণ্ডল বজ্রধারী ॥
তিঅ ধাউ খাট পাড়িলা সবরো মহাস্থহে সেজ্জি ছাইলী ।
সবরো ভুজঙ্গ নৈরামণি দারী পেহ্ম রাতি পোহাইলী ॥
হিআ তাঁবোলা মহাস্থহে কাপুর খাই ।
স্থন নৈরামণি কণ্ঠে লইআ মহাস্থহে রাতি পোহাই ॥
গুরুবাক পুঞ্চআ বিন্ধ ণিঅমণ বাণেঁ ।
একে শরসন্ধানেঁ বিন্ধহ বিন্ধহ পরমণিবাণেঁ ॥
উমত সবরো গরুআ রোষে ।
গিরিবরসিহরসন্ধি পইসন্তে সবরো লোড়িব কইসে ॥

চর্যার পদানুসরণে ২৮

উঁচু উঁচু সব পর্বত। থাকে সেখানে শবরীবালা
সাজে ময়ূরের পঙ্খে ; গলায় পরে গুঞ্জার মালা।
মত্ত শবর, করিস্ নে গোল রে পাগল, পায়ে ধরি
নিজের ঘরণী, লোকে নামে চেনে সে সহজ স্থন্দরী।
কত কত গাছ আকাশের গায় মুকুলিত সব শাখা
শবরীর কানে বজ্রের দুল হেঁটে যায় একা একা।
কী স্থখে বিছায় শয্যা শবর ত্রিধাতুর খাট পাতে
নইরমণী ও শবর নাগর সারা রাত প্রেমে মাতে।
হৃদয়ের পান কর্পূর দিয়ে খেতে ভালো লাগে ওর
কণ্ঠে শূন্য নইরমণীকে নিয়ে রাত হয় ভোর।
গুরুবাক্যকে পুচ্ছ বানিয়ে নিজ মনে বেঁধো বাণ
শরসন্ধানে বেঁধো এক বারে পরম সে নির্বাণ।
প্রচণ্ড রাগে অন্ধ শবর চারিদিকে গলিঘুঁজি
গিরিশিখরের সন্ধিতে ঢুকে তাকে কোথায় যে খুঁজি ॥

চর্যা ২৯

লুইপাদ

রাগ পটমঞ্জরী

ভাব ন হোই অভাব ণ জাই ।
আইস সংবোহেঁ কো পতি আই ॥
লুই ভণই বট দুলকৃখ বিণাণা ।
তিঅ ধাএ বিলসই উহ লাগে ণা ॥
জাহের বাণচিহ্নরূব ণ জাণী ।
সো কইসে আগম বেএঁ বখাণী ॥
কাহেরে কিস ভণি মই দিবি পিরিচ্ছা ।
উদকচান্দ জিম সাচ ন মিচ্ছা ॥
লুই ভণই মই ভাইব কিস ।
জা লই অচ্ছম তাহের উহ ণ দিস ॥

চর্যার পদানুসরণে ২৯

অভাব যায় না, মেলে না ভাবের খই
এরকম সংবোধে কোথা প্রত্যয় ।
বিজ্ঞান দুর্লক্ষ্য, বলেন লুই—
ত্রিধাতুতে ম'জে দিশা পাবি নে কো তুই
বর্ণ-চিহ্ন-রূপ অজ্ঞাত যার
আগমে বা বেদে কী ব্যাখ্যা পাবে তার ।
কাকে কী জবাব দেব বলো দেখি
যথা, জলে চাঁদ—সত্যি না মেকি ।
লুই বলে, আর ভাবাভাবি কিসে
যা নিয়ে রয়েছি পাই না কো দিশে ॥

চর্যা ৩০

ভুসুকুপাদ

রাগ মল্লারী

করুণা মেহ নিরন্তর ফারআ।
ভাবাভাব দ্বন্দল দলিআ॥
উইত্তা গঅণ মাঝেঁ অদভুআ।
পেখ রে ভুসুকু সহজ সরুআ॥
জাসু সুনন্তে তুট্টই ইন্দিআল।
নিহুরে ণিঅমন ণ দে উলাস॥
বিসঅ বিশুদ্ধেঁ মই বুজ্ঝিঅ আনন্দে।
গঅণহ জিম উজোলি চান্দে॥
এ তৈলোএ এ ত বিসারা।
জোই ভুসুকু ফেটই অন্ধকারা॥

চর্যার পদানুসরণে ৩০

করুণার মেঘ দেখা দেয় অবিরত
ভাব অভাবের ঘুচিয়ে দ্বন্দ্ব যত।
গগনের মাঝে অদ্ভুতভাবে ওঠে
ভুসুকু দেখ রে, সহজ স্বরূপ ফোটে।
যা শুনে ইন্দ্রজাল যায় ছিঁড়ে খুঁড়ে
জাগে উল্লাস মনের অন্তঃপুরে।
শুদ্ধ বিষয় বুঝি আনন্দ দিয়ে
গগনে যেমন চাঁদ থাকে উজলিয়ে।
ঐ ত্রৈলোক্যে জেনে রাখো এই সার
যোগী ভুসুকুই সরায় অন্ধকার॥

চর্যা ৩১

আর্যদেবপাদ

রাগ পটমঞ্জরী

জহি মণ ইন্দিঅ পবণ হোই ণঠা।
ণ জানমি অপা কহি গই পইঠা॥
অকট করুণাডমরুলি বাজঅ।
আজদেব নিরালে রাজই॥
চান্দেরে চান্দকান্তি জিম পতিভাসঅ।
চিঅ বিকরণে তহি টলি পইসই॥
ছাড়িঅ ভয় ঘিণ লোআচার।
চাহন্তে চাহন্তে সুন বিআর॥
আজদেবেঁ সঅল বিহরিউ।
ভয় ঘিণ দুর নিবারিউ॥

চর্যার পদানুসরণে ৩১

মন ইন্দ্রিয় পবনে নষ্ট হলে
আত্মা জানি না ঠাঁই নেবে কার কোলে।
করুণাডমরু বাজে অদ্ভুত স্বরে
আজদেব নিরালম্বে বিরাজ করে।
চাঁদনিকে দেখি, সে তো চাঁদ আছে ব'লে
মন না থাকলে সেখানেই পড়ি ট'লে।
ছেড়েছি সকল লোকাচার ঘৃণা ভয়
চেয়ে চেঁয়ে করি শূন্যকে নির্ণয়।
আজদেব যান সমস্ত ঠাঁই যেই
দেখা যায়, ভয় ঘৃণা ব'লে কিছু নেই॥

চর্যা ৩২

সরহপাদ

রাগ দেশাখ

নাদ ন বিন্দু ন রবি ন শশিমণ্ডল।
চিঅরাঅ সহাবে মুকল ॥
উজু রে উজু ছাড়ি মা লেহু রে বঙ্ক।
নিঅহি বোহি মা জাহু রে লাঙ্ক ॥
হাথেরে কাঙ্কণ মা লেউ দাপণ।
অপণে অপা বুঝ তু নিঅমণ ॥
পার উআরেঁ সোই গজিই।
দুজ্জণ সাঙ্গেঁ অবসরি জাই ॥
বাম দাহিণ জো খাল বিখলা।
সরহ ভণই বাপা উজুবাট ভাইলা।

চর্যার পদানুসরণে ৩২

নাদবিন্দু বা চন্দ্রসূর্য কোনোটাই নয়
চিত্তরাজের স্বভাবমুক্ত, বাঁধন না সয়।
ঋজু পথ ছেড়ে কখনই বাঁকা পথ নিতে নেই
লঙ্কায় তুই যাস্‌নে, রয়েছে বোধি নিকটেই।
হাতের বাজুতে কাঁকন, কী হবে নিয়ে দর্পণ
আপনাকে খুঁজে পাবার জন্যে বোঝো নিজ মন
পরপারে যদি যেতে হয় তবে তার পিছে ধাও
যার সাথে থাকে দুর্জন, জেনো, সে হয় উধাও।
নদীনালাখাল আছে বিস্তর বামে দক্ষিণে
সরহ বলেন, চলে যা রে বাপু ঋজুপথ চিনে ॥

চর্যা ৩৩

ঢেণ্ঢণপাদ

রাগ পটমঞ্জরী

টালত মোর ঘর নাহি পড়বেষী।
হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী ॥
বেঙ্গ সংসার বড়্হিল জাঅ।
দুহিল দুধু কি বেণ্টে ষামাঅ ॥
বলদ বিআএল গবিআ বাঁঝে।
পিটা দুহিএ এ তিনা সাঁঝে ॥
জো সো বুধী সোধ নিবুধী।
জো ষো চৌর সোই সাধী ॥
নিতে নিতে ষিআলা ষিহে ষম জুঝঅ
ঢেণ্ঢণপাএর গীত বিচরিলে বুঝঅ ॥

চর্যার পদানুসরণে ৩৩

টিলায় আমার ঘর। নেই কোনো
প্রতিবেশী আশেপাশে
হাঁড়িতে নেই কো ভাত; অতিথিরা
তবুও নিত্য আসে।
সাপ খেয়ে খেয়ে রাখে না, তবুও
ব্যাঙ সংখ্যায় বাড়ে—
একবার দোয়া হয়ে গেলে দুধ
বাঁটে কি ফিরতে পারে?
বলদের পেট থেকে পড়া সেই
গাভীটি বন্ধ্যা বটে

নিয়মিত তিন সন্ধ্যাই তার
দুধ দোয়া হয় ঘটে।
যে বুদ্ধিমান সেই নির্বোধ
বুঝো এটা অন্তরে
আসলে যে সাধু লোকে ভুল বুঝে
তাকে চোর ব'লে ধরে।
শেয়াল যেমন সিংহের সাথে
দৈনন্দিন যোঝে
ঢেণ্টণপা-র গীতের অর্থ
খুব কম লোকই বোঝে॥

চর্যা ৩৪

দারিকপাদ

রাগ বরাড়ী

স্থনকরুণরি অভিনচারেঁ কাঅবাকৃচিএ।
বিলসই দারিক গঅণত পারিমকুলেঁ॥
অলকৃখলকৃখণচিত্তা মহাস্থহেঁ।
বিলসই দারিক গঅণত পারিমকুলেঁ॥
কিন্তো মন্তে কিন্তো তন্তে কিন্তো রে ঝাণবখানে।
অপইঠানমহাস্থহলীলেঁ দুলখ পরমনিবাণে॥
দুঃখেঁ স্থখেঁ একু করিআ ভুঞ্জই ইন্দীজানী।
স্বপরাপর ন চেবই দারিক সঅলানুত্তরমাণী॥
রাআ রাআ রাআ রে অবর রাঅ মোহেরে বাধা।
লুইপাঅপসাএঁ দারিক দ্বাদশ ভুঅণেঁ লধা॥

শূন্য করুণা কায়বাক্‌মনে
মেনে নিয়ে একাকারে
বেড়ান দারিক গগনের কূল
পার হয়ে পরপারে।
লক্ষণ দেখে অলক্ষ্যকেও
চেতনা ধরতে পারে
বেড়ান দারিক গগনের কূল
পার হয়ে পরপারে।
কী হবে মন্ত্রে, কী হবে তন্ত্রে
ধ্যানে আর ব্যাখ্যানে
মহাসুখ পেলে তবে অধিকার
জন্মায় নির্বাণে।
সুখদুঃখকে এক ক'রে জ্ঞানী
ভোগ করে ইন্দ্রিয়
দারিকের কাছে নিজ পর নেই
সকলি অদ্বিতীয়।
রাজা রাজা রাজা ! আর সব রাজা
মোহে আবদ্ধ, তাই
লুইয়ের প্রসাদে দ্বাদশ ভুবনে
দারিক পেয়েছে ঠাঁই ॥

চর্যা ৩৫

ভাদেপাদ

রাগ মল্লারী

এতকাল হাঁউ অচ্ছিলোঁ স্বমোহেঁ।
এবেঁ মই বুঝিল সদ্গুরু বোহেঁ॥
এবেঁ চিঅরাঅ মকুঁ ণঠা।
গঅণসমুদে টলিআ পইঠা॥
পেখমি দহ দিহ সর্ব্বই শূন।
চিঅ বিহুন্নে পাপ ন পুন্ন॥
বাজুলে দিল মো লকৃখ ভণিআ।
মই অহারিল গঅণত পসিআ॥
ভাদে ভণই অভাগে লইআ।
চিঅরাঅ মই অহার কএলা॥

চর্যার পদানুসরণে ৩৫

ছিলাম নিজের মোহে এতকাল
গুরুর মন্ত্রে হল সে খেয়াল।
নষ্ট চিত্তরাজ্য এখন
সমুদ্রে ঢ'লে পড়েছে গগন।
দশদিকে দেখি সকলি শূন্য
মন বিনে নেই পাপ বা পুণ্য।
রাউল লক্ষ্য দিয়েছেন ব'লে
গগনে তৃষ্ণা মিটিয়েছি জলে।
ভদ্রপা বলে অখণ্ডাকার
চিত্তরাজকে করেছি আহার॥

চর্যা ৩৬

কৃষ্ণাচর্যাপাদ

রাগ পটমঞ্জরী

সুণ বাহ তথতা পহারী।
মোহভাণ্ডার লই সঅলা অহারী॥
ঘুমই ণ চেবই সপরবিভাগা।
সহজনিদালু কাহ্নিলা লাঙ্গা॥
চেঅণ ন বেঅন ভর নিদ গেলা।
সঅল সুফল করি সুহে সুতেলা॥
স্বপণে মই দেখিল তিহুবণ সুণ।
ঘোরিঅ অবণাগমণ বিহুন॥
শাখি করিব জালন্ধরিপাএ।
পাখি ণ রাহঅ মোরি পাণ্ডিআচাএ॥

চর্যার পদানুসরণে ৩৬

তথতা চড়াও শূন্যের ঘরে
মোহভাণ্ডার সব লুট করে।
ঘুমোলে কেই বা আপন কে কর
নগ্ন কাহ্নু সহজে অঘোর।
নিদ্রায় হয়ে বেহুঁশ অসাড়
পায় সফলতা সুখশয্যার।
স্বপ্নে ত্রিলোক দেখি করে ধূ ধূ
আনাগোনা নেই, ঘুরছেই শুধু।
সাক্ষী আমার জালন্ধরিপা
পণ্ডিত যারা সবাই খাপ্পা॥

চর্যা ৩৭

তাড়কপাদ

রাগ কামোদ

অপণে নাহিঁ সো কাহেরি শঙ্কা।
তা মহামুদেরী টুটি গেলি কংখা॥
অনুভব সহজ মা ভোল রে জোই।
চৌকোটি বিমুকা জইসো তইসো হোই॥
জইসনে অছিলে স তইসন অচ্ছ।
সহজ পিথক জোই ভান্তি মা হো বাস॥
বাণ্ডকুরুণ্ড সন্তারে জাণী।
বাক্‌পথাতীত কাঁহি বখাণী॥
ভণই তাড়ক এথু নাহিঁ অবকাশ।
জো বুঝই তা গলেঁ গলপাস॥

চর্যার পদানুসরণে ৩৭

নিজের মধ্যে নিজেই তো নেই,
ভয় কাকে আর
আকাঙ্ক্ষা সব টুটে গেল তাই
মহামুদ্রার।
সহজের অনুভব যেন যোগী
ভুলো না কদাচ
চতুষ্কোটির মত বিমুক্ত
হয়ে তুমি বাঁচো।
একদিন তুমি যা ছিলে, এখনও
আছ ঠিক তাই

ভুলেও কখনও সহজের পথ
না যেন হারায়।
পেরোবার আগে দেখে নেবে কড়ি
আছে কিনা ট্যাঁকে
কী ক'রে বোঝাব বাক্যপথের
অতীতে যা থাকে।
তাড়ক বলেন, এইখানে নেই
কোনো অবকাশ
এ কথা যে বোঝে, গলায় পরানো
থাকে তার ফাঁস ॥

চর্যা ৩৮

সরহপাদ

রাগ ভৈরবী

কাঅ ণাবড়ি খাণ্টি মণ কেড়ুয়াল।
সদ্‌গুরুবঅণে ধর পতবাল ॥
চীঅ থির করি ধরহু রে নাই।
অন উপায়ে পার ণ জাই ॥
নৌ বাহী নৌকা টানঅ গুণে।
মেলি মেল সহজে জাউ ণ আণেঁ ॥
বাট অভঅ খাণ্টবি বলআ।
ভব উলোলেঁ বিষঅ বোলিআ ॥
কুল লই খর সোন্তে উজাঅ।
সরহ ভণই গঅণেঁ সমাঅ ॥

চর্যার পদানুসরণে ৩৮

শরীর নৌকো, বৈঠা তো মন
ধরো হাল, মানো গুরুর বচন।
মন বেঁধে পাড়ি দাও নৌকায়
পেরোবার নেই অন্য উপায়।
গুণ টেনে চলে পাকা মাঝি ও যে
সাথী ছাড়া যাওয়া যায় না সহজে
ডাকাত পড়ার পথে আছে ভয়
ভবসমুদ্রে পাবে সব লয়।
সরহ বলেন, বাও হে উজানে।
কূল ঘেঁষে খরস্রোতে আশমানে॥

চর্যা ৩৯

সরহপাদ

রাগ মালশী

সুইণা হ অবিদার অরে নিঅমন তোহোর দোসে।
গুরুবঅণবিহারেঁ রে থাকিব তই ঘুণ্ড কইসে॥
অকট হূঁ ভবই গঅণা।
বঙ্গে জায়া নিলেসি পরে ভাগেল তোহোর বিণাণা॥
অদভুঅ ভবমোহ রে দিসই পর অপ্পণা।
এ জগ জলবিম্বাকারে সহজেঁ সুণ অপণা॥
অমিআ অচ্ছন্তেঁ বিস গিলেসি রে চিঅ পরবস অপা।
ঘরেঁ পরেক বুঝ্ঝিলে রে খাইব মই দুঠ কুণ্ডবাঁ॥
সরহ ভণন্তি বর সুণ গোহালী কি মো দুঠ বলন্দেঁ।
একেলে জগ নাশিঅ রে বিহরহুঁ সুচ্ছন্দে॥

নিজের দোষেই স্বপ্নে, ও মন,
হলি অবিদ্যারত
মিথ্যে না ঘুরে ঠিক পথে চল্
গুরুর বচন মতো।
ও রে ও আকাট, এ ভবচক্রে
খালি তোর আসাযাওয়া
ভেঙে গেল তোর অবিদ্যাদোষ
নিতেই বঙ্গে জায়া।
ভবমোহবশে আপন ও পর
একেবারে দৃশ্যত
সহজে আত্মা শূন্য, জগৎ
জলবিম্বের মতো।
অমৃত থাকতে গিলিস যে বিষ
পরবশে রেখে মন
ঘর পর ভুলে দুষ্টু কুটুম
করি আমি ভক্ষণ।
শূন্য গোয়াল ঢের ভালো, নেই
দুষ্টু গরুর সাধ
জগৎ ঘুচিয়ে একা খাসা আছি,
বলেন সরহপাদ ॥

চর্যা ৪০

কাহ্নুপাদ

রাগ মালসী গবুড়া

জো মণগোঅর আলাজালা।
আগম পোথী ইষ্টামালা॥
ভণ কইসেঁ সহজ বোল বা জাঅ।
কাঅ বাক্ চিঅ জস্ু ণ সমাঅ॥
আলে গুরু উএসই সীস।
বাক্পথাতীত কাহিব কীস॥
জে তই বোলী তে ত বিটাল।
গুরু বোব সে সীসা কাল॥
ভণই কাহ্নু জিণরঅণ বিকসই সা।
কালেঁ বোব সংবোহিঅ জইসা॥

চর্যার পদানুসরণে ৪০

মন যা দেখছে, সে মায়ার খেলা
শাস্ত্র ও পুঁথি মিথ্যার মালা।
কী ক'রে বোঝাব সহজ কেমন
এক নয় যার কায়বাক্মন।
গুরু শিষ্যকে কী ক'রে বোঝায়
কথায় যদি তা ধরাই না যায়।
বিটলেরা সব ব'কে যায় মেলা
গুরুদেব বোবা, শিষ্যেরা কালা।
কানু বলে, জিনরত্ন কেমন ?
বোবাকে বোঝায় কালায় যেমন

চর্যা ৪১

ভুসুকুপাদ

রাগ কহ্নু গুঞ্জরী

আইএ অণুঅনা এ জগ রে ভাংতিএঁ সো পড়িহাই।
রাজসাপ দেখি জো চমকিই সাঁচে কি তাক বোড়ো খাই ॥
অকট জোইআ রে মা কর হথা লোহ্না।
অইস সভাবেঁ জই জগ বুঝসি তুটই বাষণা তোরা ॥
মরুমরীচি গন্ধনইরী দাপণপতিবিম্বু জইসা।
বাতাবত্তেঁ সো দিঢ় ভইআ অপেঁ পাথর জইসা ॥
বান্ধিসুআ জিম কেলি করই খেলই বহুবিহ খেলা।
বালুআতেলেঁ সসর সিংগে আকাশ ফুলিলা ॥
রাউতু ভণই কট ভুসুকু ভণই কট সঅলা অইস সহাব ॥
জই তো মূঢ়া অচ্ছসি ভান্তী পুচ্ছতু সদ্‌গুরুপাব ॥

চর্যার পদানুসরণে ৪১

আদৌ না-হওয়া এ জগৎ ধরা পড়ে
ভ্রান্তিতে আগাগোড়া
রজ্জুকে সাপ ভেবে যে ডরায় তাকে
খায় সত্যি কি বোড়া ?
ও আকাট যোগি, হয় না কো যেন মোটে
হাত দুটো তোর নুলো
এমন স্বভাবে জগৎ বুঝলে পরে
টুটবে বাসনগুলো।
মরীচিকা, গন্ধর্বনগরী আর
দর্পণে পড়া ছায়া

জল ঠেসে ঠেসে যে রকম প্রস্তর
দেখায় ঘূর্ণী হাওয়া।
বন্ধ্যাপুত্র দেখায় খেলার ছলে
কত কী যে ভোজবাজি
বালি থেকে তেল, শশকশৃঙ্গ,
আকাশকুসুমরাজি।
রাউতু বলেন, ভুসুকু বলেন—এই
স্বভাবেই সব থাকে
ভ্রান্তি ঘটলে গুরুর কাছে যা, মূঢ়,
জিজ্ঞাসা কর তাঁকে॥

চর্যা ৪২

কাহ্নুপাদ

রাগ কামোদ

চিঅ সহজে শূণ সংপুন্না।
কান্ধবিয়োএঁ মা হোহি বিসন্না॥
ভণ কইসে কাহ্নু নাহি।
ফরই অনুদিন তৈলোএ পমাই॥
মূঢ়া দিঠ নাঠ দেখি কাঅর।
ভাগ তরঙ্গ কি সোষই সাঅর॥
মূঢ়া অচ্ছন্তে লোঅ ন পেখই।
দুধ মাঝেঁ লড় অচ্ছন্তে ন দেখই॥
ভব জাই ণ আবই এথু কোই।
আইস ভাবে বিলসই কাহ্নিল জোই॥

চর্যার পদানুসরণে ৪২

সহজে চিত্ত শূন্যে পূর্ণ রাখো
কানুর বিয়োগে বিষণ্ণ হয়ো না কো।
কানু কানু করো, বলো কানু নেই কিসে
অনুদিন ফুটে ওঠে ত্রৈলোক্যে সে।
মূঢ়রা কাতর দৃশ্যেরা লোপ পেলে
ভাঙা তরঙ্গ সাগর কি শুষে ফেলে ?
জগৎ রয়েছে দেখে না মূর্খ লোকে
দুধে থাকে মাটা, পড়ে না তা কারো চোখে।
সংসারে কেউ আসে না, না কেউ যাবে
কাহ্নিল যোগী লীলা করে এইভাবে।

চর্যা ৪৩

ভুসুকুপাদ

রাগ বঙ্গাল

সহজ মহাতরু ফরিঅ এ তেলোএ।
খসমসভাবে রে বাণ মুকা কোএ॥
জিম জলে পাণিআ টলিআ ভেড় ন জাঅ।
তিম মণরঅনা রে সমরসে গঅণ সমাঅ॥
জাসু নাহি অপ্পা তাসু পরেলা কাহি।
আই অনুঅণা রে জামমরণ ভাব নাহি॥
ভুসুকু ভণই কট রাউতু ভণই কট সঅলা এহ সহাব।
জাই ণ আবই রে ণ তহিঁ ভাবাভাব॥

চর্যার পদানুসরণে ৪৩

সহজের মহাতরু তার ডাল
ছড়ায় ত্রিলোক জুড়ে
শূন্য স্বভাবে জ্যামুক্ত ক'রে
ও কে দেয় বাণ ছুঁড়ে।
হয় না কো কিছুমাত্র প্রভেদ
জলে যদি জল পশে
গগনের মাঝে মনোরত্নও
মিশে যায় সমরসে।
'এ আমার' এই বোধ যার নেই
কেবা পর তার কাছে
না-হওয়ার কিবা জন্মমৃত্যু
কী ক'রেই বা সে বাঁচে।
ভুসুকু বলেন, রাউতু বলেন—
সবারই স্বভাব এই
এখানে কেউই আসে না, যায় না
থাকা বা না-থাকা নেই।

চর্যা ৪৪

কঙ্কণপাদ

রাগ মল্লারী

সুনে সুন মিলিঅ জবেঁ।
সঅল ধাম উইআ তবেঁ॥
আছহুঁ চউ খণ সংবোহী।
মাঝ নিরোহেঁ অণুঅর বোহী॥

বিন্দু ণাদ ণ হিঅ্ঁ পইঠা।
আণ চাহন্তে আণ বিণঠা ॥
জথাঁ আইলেঁসি তথা জান।
মাঝঁ থাকী সঅল বিহাণ ॥
ভণই কঙ্কণ কলঅল সাদেঁ।
সর্ব্ব বিচুরিল তথতা নাদেঁ ॥

চর্যার পদানুসরণে ৪৪

শূন্যে শূন্য যেই মিলে যায়
সকল ধর্ম এসে দেখা দেয়।
আমি থাকি চউখণ সংবোধে
উত্তম বোধি মাঝের নিরোধে।
পশে না হৃদয়ে বিন্দু বা নাদ
এক চেয়ে আর হয় বরবাদ।
কোথা থেকে এলে ভালো ক'রে জানো
মাঝখানে থেকে সব কিছু হানো।
কঙ্কণ বলে কলোকলো ছাঁদে—
খ'সে যায় সব তথতার নাদে ॥

চর্যা ৪৫

কাহ্নুপাদ

রাগ মল্লারী

মণ তরু পাঞ্চ ইন্দি তসু সাহা।
আসা বহল পাত ফলবাহা ॥

বরগুরুবঅণ কুঠারেঁ ছিজঅ ।
কাহ্ন ভণই তরু পুণ ন উইজঅ ॥
বাঢ়ই সো তরু সুভাসুভ পাণী ।
ছেবই বিদুজন গুরু পরিমাণী ॥
জো তরু ছেব ভেবউ ন জাণই ।
সড়ি পড়িআঁ রে মূঢ় তা ভব মাণই ॥
সুণ তরুবর গঅণ কুঠার ।
ছেবহ সো তরু মূল ন ডাল ॥

চর্যার পদানুসরণে ৪৫

পাঁচ ডাল পাঁচ ইন্দ্রিয় আর তরু হল মন
তাতে অজস্র পাতা আর ফল আশার বাহন ।
ছেদন করুক সদ্‌গুরুবচন কুঠার
কাহ্ন বলেন, তরু যেন পুনঃ জন্মে না আর ।
শুভ ও অশুভ জলসেচে সেই তরু বেড়ে ওঠে
গুরুর কথায় বিদ্বৎজন তাকে কাটে কোটে ।
তরুছেদনের নিগূঢ় উপায় জানা নেই যার
পা পিছ্‌লে প'ড়ে শেষে সেই মূঢ় মানে সংসার
শূন্যই সেই তরুবর আর গগন কুড়াল
কেটে ফেলো তাকে শিকড়সুদ্ধ শুধু নয় ডাল ॥

চর্যা ৪৬

জয়নন্দীপাদ

রাগ শবরী

পেখু সুঅণে অদশে জইসা ।
অন্তরালে মোহ তইসা ॥

মোহবিমুক্কা জই মণা।
তবেঁ তুটই অবণাগমণা॥
ন উ দাঢ়ই ন উ তিমই চ্ছিজ্জই।
পেখ লোঅ মোহে বলি বলি বাঝই॥
ছাআ মাআ কাঅ সমাণা।
বেণি পাখেঁ সোই বিণাণা॥
চিঅ তথতাস্বভাবে ষোহই।
ভণই জঅনন্দি ফুড়ণ ণ হোই॥

চর্যার পদানুসরণে ৪৬

স্বপ্নে বা দর্পণে সবে দেখে
তেমনি অন্তরালে মোহ থাকে।
মোহবিমুক্ত হয় যেই মন
থেমে যায় ভবে গমনাগমন।
পোড়ে না, ডোবে না, কাটা পড়ে না সে
লোকে তবু বাঁধা পড়ে মোহপাশে।
ছায়া মায়া কায়া সকলি সমান
যা দুদিক দেখে, তাই বিজ্ঞান।
যথার্থভাবে সাফ করো মন—
জয়নন্দীর স্পষ্ট ভাষণ॥

চর্যা ৪৭

ধামপাদ

রাগ গুঞ্জরী

কমলকুলিশ মাঝেঁ ভইঅ মিথলী।
সমতাজোএঁ জলিঅ চণ্ডালী॥
ডাহ ডোম্বীঘরে লাগেলি আগি।
সসহর লই সিঞ্চহুঁ পাণী॥
ন উ খরজালা ধুম ন দিশই।
মেরুশিখর লই গঅণ পইসই॥
দাঢ়ই হরিহর বাহ্ম ভড়া।
ফীটা হই নবগুণ শাসন পড়া॥
ভণই ধাম ফুড় লেহু রে জাণী।
পঞ্চ নালেঁ উঠে গেল পাণী॥

চর্যার পদানুসরণে ৪৭

কমল কুলিশ মাঝে আছে ম'রে
সমতার যোগে চণ্ডালী পোড়ে।
জ্বলে ডোম্‌নীর চালাঘরখানি
নিয়ে শশধর ঢালো তাতে পানি।
ধোঁয়া কই, নেই জ্বালাও তেমন
মেরুচূড়া দিয়ে পশেছে গগন।
পোড়ে হরি হর ব্রহ্মা ভট্ট
পুড়ে ছাই হল শাসনপট্ট।
ভালো ক'রে জেনে নাও, ধাম বলে—
পানি সোজা উঠে গেছে পাঁচ নলে॥

চর্যা ৪৯

ভুসুকুপাদ

রাগ মল্লারী

বাজণাব পাড়ী পঁউআ খালেঁ বাহিউ।
অদঅ দঙ্গালে দেশ লুড়িউ ॥
আজি ভুসুকু বঙ্গালী ভইলী।
ণিঅ ঘরিণী চণ্ডালী লেলী ॥
দহিঅ পঞ্চপাটণ ইংদিবিসআ ণঠা।
ণ জানমি চিঅ মোর কহিঁ গই পইঠা ॥
সোণ রুঅ মোর কিম্পি ণ থাকিউ।
নিঅপরিবারে মহাসুহে থাকিউ ॥
চউকোড়ি ভণ্ডার মোর লইআ সেস।
জীবন্তে মইলেঁ নাহি বিশেষ ॥

চর্যার পদানুসরণে ৪৯

পদ্মায় পাড়ি দেয় রে বাজরা
দেশ লোটে ক্রুর দাঙ্গাবাজরা।
ভুসুকু আজকে হলি রে বাঙালী
এনে তুলেছিস ঘরে চণ্ডালী।
পঞ্চপাটনে ইন্দ্রিয় ছাই
জানি না চিত্ত কোথা পাবে ঠাঁই।
সোনারুপো কিছু থাকে নি আমার
আছি মহাসুখে, নিজ সংসার।
ভাঁড়ারের চার কোটি সব ফাঁক
জীবিতে বা মৃতে নেই কো ফারাক ॥

চর্যা ৫০

শবরপাদ

রাগ রামক্রী

গঅণত গঅণত তইলা বাড়ী হেঞ্চে কুরাড়ী।
কণ্ঠে নৈরামণি বালি জাগন্তে উপাড়ী ॥
ছাড়ু ছাড় মাআ মোহা বিষম দুন্দোলী।
মহাসুহে বিলসন্তি শবরো লইআ সুণমেহেলী ॥
হেরি সে মেরি তইলা বাড়ী খসমে সমতুলা।
ষুকড় এবে রে কপাসু ফুটিলা ॥
তইলা বাড়ির পাসেঁর জোহ্ণা বাড়ী উএলা।
ফিটেলি অন্ধারি রে আকাশ ফুলিআ ॥
কঙ্গুচিনা পাকেলা রে শবরা শবরি মাতেলা।
অণুদিন শবরো কিম্পি ন চেবই মহাসুহেঁ ভোলা ॥
চারি বাসেঁ গড়িলা রেঁ দিআঁ চঞ্চালী।
তহিঁ তোলি শবরো ডাহ কএলা কান্দই সগুণশিআলী॥
মারিল ভবমত্তা রে দহদিহে দিধলি বলী।
হের সে সবরো নিরেবণ ভইলা ফিটিলি ষবরালী ॥

চর্যার পদানুসরণে ৫০

হৃদয় কুঠারে জঙ্গলবুড়ি
দিগন্তে ছায়
কণ্ঠে নৈরমণী বালা জেগে
জড় উপ্‌ড়ায়।
ছেড়েছুড়ে দাও মায়া ও মোহের
দ্বন্দ্ব বিষম।

মেয়ে নিয়ে সুখে শূন্যে শবর
করে সঙ্গম
আকাশতুল্য জঙ্গলবুড়ি
সেথা করি বাস।
দেখ, এ সময় কী সুন্দর যে
ফুটেছে কাপাস।
জঙ্গলবুড়ি। তার পাশে হল
জ্যোৎস্না উদয়।
পালালো আঁধার, আকাশ তখন
ফুলে ফুলময়।
শবর শবরী মাতোয়ারা, যবে
চিনাধান পাকে।
বেহুঁশ শবর মহাসুখে খালি
চুর হয়ে থাকে।
চারখানি বাঁশে খাটিয়া বানিয়ে
তোলা হল কাঁধে।
শবর পুড়লে চিতায়, শেয়াল
শকুনেরা কাঁদে।
ভবমত্ততা সারা হল, দিয়ে
দশদিকে বলি।
শবরের যেই নির্বাণ হল
ফুরালো সকলি॥

জঙ্গলবুড়ি—জঙ্গল কেটে আবাদযোগ্য জমি।
(বঙ্গীয় শব্দকোষ—হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়)

অমরু শতক

অনুবাদকের কথা

‘অমরু শতক’কে যদি ‘গাথাসপ্তশতী’র সমসাময়িক ব’লে ধরা যায়, তাহলে তো এতে মেলে হাজার দুই বছর আগেকার অতিক্রান্ত জীবন। তবু মনে হয়, মানুষের মন যেন আজও তেমনিই থেকে গেছে। জীবননিষ্ঠ ব’লেই বোধহয় অমরুর এই কবিতাশতক আমাদের হৃদয়ে এত নাড়া দেবার ক্ষমতা রাখে।

সংস্কৃতে আমি অল্প জলের পুঁটি। ফলে তর্জমায় আমাকে অনেকটাই পরনির্ভর হতে হয়েছে। সংস্কৃতে তেমন দখল থাকলে অনুবাদে আরও স্বচ্ছন্দ হতে পারতাম। আমার এই সীমাবদ্ধতার কথা মনে রেখে আশা করি আমার সম্ভাব্য বোঝার ভুলগুলো পাঠকেরা নিজ গুণে ক্ষমা ক’রে নেবেন। সেকালের কথা একালের ভাষায় ধরতে গিয়ে হয়ত কিছুটা লঘুগুরুর সীমালঙ্ঘনও ঘটে থাকবে। সে ত্রুটি অক্ষমতা আর অনিচ্ছাপ্রসূত। কবি অমরু কে ছিলেন, তিনিই রচয়িতা না সংকলক—এসব নিয়ে নানা মুনির নানা মত।

তবে অমরু যেই হোন কিংবা এসব শ্লোক যিনি বা যাঁরাই রচনা ক’রে থাকুন—তিনি বা তাঁরা যে অসাধারণ কবি ছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

সংস্কৃতে এই ধরনের শ্লোককে বলে ‘মুক্তক’। অর্থাৎ, প্রত্যেকটিই পুরোপুরি স্বাধীন। একটির সঙ্গে আরেকটির কোনো যোগ নেই।

শ্লোকগুলো যে প্রত্যেকটি পৃথক, শুধু এটা বোঝাবার জন্যেই অনুবাদে একটি ক’রে শিরোনাম জোড়া হয়েছে। পাঠকেরা স্বচ্ছন্দে তা অগ্রাহ্য করতে পারেন।

এসব কবিতাকে নিছক শৃঙ্গার রসের খোপে ফেলার যে ঝোঁক দেখা যায়, আমার তাতে বিন্দুমাত্র সায় নেই। লেবেল এঁটে কবিতার এই জাত মারার আমি ঘোরতর বিরোধী।

সুন্দর চিত্রণের জন্যে শিল্পী রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সেইসঙ্গে এ বই প্রকাশের ঝুঁকি নিয়ে আমার একান্ত স্নেহের স্বপ্না ও প্রিয়ব্রত দেব আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে বেঁধেছে।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়
৩/১২/৮৭

শ্রীদুর্গা সহায়

জ্যা-বদ্ধ বাণ টান ক'রে ধরা
হাতের পৃষ্ঠে
সূর্যরশ্মি মুখ দেখে নখদর্পণে যাঁর,
ফুল কানে ভেবে লুব্ধ ভ্রমরা
যাঁর কটাক্ষ,
সেই মা-দুর্গা গ্রহণ করেন যেন রক্ষার ভার॥ ১ ॥

দারুণ অগ্নিবাণে

হাতে ঠেকে ওঠে আঁচলে, পা ধ'রে
চুল ছেড়ে দিয়ে,
তবু তা পড়ে নি ত্রিপুরের মেয়েগুলোর নজরে,
বুকে জড়ালেও সাশ্রু পদ্মনেত্রে
দিয়েছে হাঁকিয়ে
শম্ভুর সেই শরাগ্নি যেন আমাদের পাপ হরে ॥ ২ ॥

রসকলি নাকে

হাওয়ায় উড়ছে চূর্ণ অলক
দোলে কুণ্ডল,
ঘামে ধেবড়ানো তিলক কপালে, রসকলি নাকে
সুরতে ক্লান্ত তন্বীর মুখে নিঃসম্বল
শূন্য দৃষ্টি
সে মুখ তোমাকে দেখুক, কী হবে হরিহর ব্রহ্মাকে? ॥ ৩ ॥

ওষ্ঠামৃত

দষ্ট অধরে চকিত হয়ে সে হাত নেড়ে বলে,
'না, না, ছাড়ো, ঠক—
কুপিত কণ্ঠ, নাচছে ভ্রূলতা, চক্ষে পুলক ;
মানিনীকে চুমো খায় যে সজোরে
সে লভে অমৃত—
সাগর ছেঁচে যা মূর্খেরা পায়, হায়, কী কষ্ট ক'রে ॥ ৪ ॥

সখী বলে

ঢলো ঢলো প্রেম, ঢুলু ঢুলু আঁখি
একবার চেয়ে, পরক্ষণেই
লজ্জায় মুখ চকিতে ফেরাতে রোজ দেখি তোকে,
হৃদয়গহনে সে-নেই সে-নেই
চোখে পড়ে ধরা ;
কে ভাগ্যবান যার দিকে চেয়ে থাকিস নিষ্পলকে ? ॥ ৫ ॥

নায়িকাকে সখী

কেন চুপচাপ চোখ মোছো খালি
নখের ডগায় ? কেন তার চেয়ে
চেঁচিয়ে কাঁদো না ?
খলের কথায় ভারী ক'রে কান
মাত্রা না রেখে করেছিল মান
বয়ে গেছে ওর করতে এখন তোমাকে সাধ্যসাধনা ॥ ৬ ॥

নায়ককে সখি

এতদিন প্রেমে তা দেওয়ার পর
গাইছ উল্টো সুর।
ওই বা কী ক'রে সয় মুখ বুঁজে
বলো, তার এই দুঃসহ ব্যথা,
ওহে নিষ্ঠুর ?
গলা ছেড়ে সখি কাঁদুক, সখিকে সান্ত্বনা দেওয়া বৃথা ॥ ৭ ॥

মান ভাঙানো

দয়িত বাইরে নতশিরে কাটে আঁচড়,
সখিরাও দাঁতে কুটো কাটে নি কো
কেঁদে চোখ গেছে ফুলে,
খাঁচায় টিয়ার নেই সেই হাসিখেলা—
সব কিছু ভুলে
হে কঠিনা, দেখ এসেছে এবার মান ভাঙবার বেলা ॥ ৮ ॥

পাকা বুদ্ধিতে

বদ্ মেয়েগুলো মানে না বারণ,
ছিনায় তোমার প্রিয়কে।
তুমি কেন কাঁদো ? কাঁদলে ওভাবে
ওদেরই তো পোয়াবারো।
আঙুলে খেলিয়ে ওকে
বরং বন্য স্বভাবের জোরে সহজেই পেতে পারো ॥ ৯ ॥

অধীর বাচাল

প্রিয়কে কোমল বাহুডোরে ক'ষে বেঁধে
মালিনী সরোষে সখীদের ঠিক সামনে দিয়েই
ঘরে নিয়ে ঢোকে।
'আর ওরকম হবে কি?' বলতে বলতে
সমানে সে ঠোকে।
সে-প্রিয় সুভগ হাসে নাককান মলতে মলতে॥ ১০

প্রবাসে যেতে

'যে যায় সে আর ফিরে আসে না কি?
ভেবে ভেবে তুমি রোগা হয়ে গেলে—'
আমি বলি জলচোখে।
অশ্রু সামলে অলস নয়ন মেলে
চেয়ে আহ্লাদে
সুন্দরী তার ভাবী মরণের জন্যে কোমর বাঁধে॥ ১১

কী করব বলো

মুখ তার চোখে পড়া মাত্রই
নতমুখে আমি চেয়েছি পায়ের দিকে;
কানে ছিপি আঁটি পাছে কথা শুনে ভুলি
গালের পুলক হাতে ঢাকি বেগতিকে
সখি, কী করব বলো—
এদিকে বুকের কাঁচুলি যে ছিঁড়ে হয়ে যায় উলিডুলি॥ ১২ ॥৮

সে যায় প্রবাসে

যে-দূর প্রবাসে পৌঁছুতে লাগে শত দিন
প্রিয় যাবে সেইখানে ;
জল-ঝরা চোখে প্রিয়তমা তাকে বলে,
'দুপুর নাগাদ ফিরে আসবে তো ? নাকি আরো পরে ?
অথবা দিনাবসানে ?'
এইভাবে তার যাওয়া আটকায় ছলে বলে কৌশলে ॥ ১৩ ॥

লজ্জার মাথা খেয়ে

'যাও' তাকে বলেছিলাম নেহাৎ খেলার ছলে
কঠিন হৃদয়ে সেটুকু শুনেই
জোর ক'রে, সখি, সে গেল শয্যা ছেড়ে ;
প্রেমের সৌধ ধূলিসাৎ, দেখ চেয়ে
প্রাণে তার দয়ামায়া নেই ;
কী করব, তবু তাকে প্রাণে ধরি লজ্জার মাথা খেয়ে ॥ ১৪ ॥

মুখবন্ধন

পতি-পত্নীর নৈশ আলাপ আড়ি পেতে শুনে
সকালে শালিক গুরুজনদের কাছে
যেই যায় আওড়াতে
বউ তাড়াতাড়ি লজ্জার চোটে
ডালিমের দানা ব'লে শালিকের ফাঁক-করা ঠোঁটে
কানের দুলের চুনী খুলে নিয়ে মুখে তার ছিপি আঁটে ॥ ১৫ ॥

দুঃখী পরাঙ্‌মুখী

হেরে গিয়ে আমি দুঃখী পরাঙ্‌মুখী।
না জেনে আমাকে বাহুডোরে বেঁধে, শঠ,
নিজের পায়েই মেরেছ কুড়ুল,
যাবে না এ পরিতাপ।
দয়িতার স্তনস্পর্শে তোমার রাঙা যে বক্ষপট
দেখ, তাতে পড়ে আমার তৈলমলিন বেণীর ছাপ ॥ ১৬ ॥

শোধ তোলা

একত্রে বসা এড়ালো কায়দা ক'রে
আলিঙ্গনে সে বিঘ্ন ঘটালো হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে
পান আনবার ছলে,
পরিজনদের কাছেপিঠে কাজে ভিড়িয়ে
সুযোগ দিল না বাক্যালাপের।
অনুষ্ঠানের ত্রুটি না রেখেও শোধ তোলে কৌশলে ॥ ১৭ ॥

জোড়া সামলানো

দুই প্রিয়তমা একই আসনে ব'সে আছে দেখে
একের পেছনে দাঁড়িয়ে যেন সে খেলে
এইভাবে তার চোখ চেপে ধরে,
তারপর ঘাড় ঈষৎ বেঁকিয়ে
অন্যের গালে
অন্তরে হেসে প্রেমের পুলকে সুখে চুম্বন করে ॥ ১৮ ॥

কলহান্তরিতা

পায়ে পড়েছিল, তবুও ফেরায় তাকে
'তুমি বিশ্বাসঘাতক ধূর্ত' ব'লে।
প্রচণ্ড রেগে প্রিয়তম চলে গেলে
রমণীটি স্তনে হাত রেখে তার শোকে
দীর্ঘশ্বাস ফেলে
সখীদের দিকে তাকায় অশ্রুসজল ঝাপ্‌সা চোখে ॥ ১৯ ॥

ঘুমোতে দেবে না

আঁচলে খুঁট আঁট ক'রে বেঁধে চন্দ্রহারে
সুনয়না কেন ঘুমোয়, হ্যাঁরে ?
প্রিয় নিজে থেকে পরিজনটিকে শুধায়।
'এ দেখি একটু ঘুমোতেও দেবে না, মা'
এই ব'লে প্রিয়তমা
যেন রাগ ক'রে পাশ ফিরে তাকে শোবার জায়গা দেয় ॥ ২০ ॥

পিঠোপিঠি

একই বিছানায় শুয়ে আছে পিঠ ফিরিয়ে
এ কিছু বললে ও থাকে চুপটি ক'রে
ইচ্ছেটা হল দুজনে এ ওকে সাধে
অথচ বাধছে দুজনেরই ইজ্জতে
আড়চোখে চার চোখের মিলন হতে
ভেঙে গেল রাগ, অমনি আবেগে এ ওকে বাহুতে বাঁধে ॥ ২১

চুপচাপ

রাগ ক'রে প্রিয়া ভাবছে, 'লোকটা শঠ—
বলছে না কেন কথা ?'
আমি ঠায় চুপ, দেখিই না সে কী করে।
এদিকে যখন ঘটল অন্য ব্যাপার,
দুজনেরই চোখে সলজ্জ মধুরতা।
আমি কী কারণে হাসতেই ওর নয়নে অশ্রু ঝরে ॥ ২২

পাছে ঘুমোয়

একই খাটে শুয়ে প্রতিপক্ষের নাম নেয়।
রেগে টং হয়ে সে মুখ ঘোরায়
ভোলে না কো ভবী চাটুকারিতায়।
এত মুখনাড়া খেয়েও দয়িত
কেন চুপ মেরে আছে ?
ভয়ে তাড়াতাড়ি ঘাড় তুলে চায়—ঘুমিয়ে সে পড়ে নি তো ? ॥ ২৩ ॥

কারচুপি

'পায়ে পড়বার ছল ক'রে তুমি লুকাও বক্ষপট
যাতে আছে স্তনতটে অঙ্কিত টিপছাপ'
সে যখন বলে, আমি বলি, 'কই কোথায় ?'
বলেই সজোরে বুকে চেপে ধরি তাকে
যাতে দাগগুলো মুছে যায়।
সেও দেখি বেশ সুখের আবেশে গদ গদ হয়ে থাকে ॥ ২৪ ॥

ঘর ছেড়ে যায়

‘সুনয়না তুমি কী যে মনোরমা কাঁচুলি ছাড়াই’
—ব’লে প্রিয়তম ছোঁয় তার গিরা।
বিছানার ধারে বসেছিল মালিনীরা
তাদের চোখের আড়ে
মাতে আনন্দ উৎসবে, ঠোঁটে হাসি।
আস্তে আস্তে নানা অছিলায় তারা সব ঘর ছাড়ে ॥ ২৫

আক্ষেপ

বাইরে ভ্রূকুটি, অন্তরে উৎকণ্ঠা ;
কথা না বললে কী হয়,
পোড়া মুখে হাসি জাগে ;
মনকে যদিচ করেছি কঠোর অতি
দেহে শিহরণ লাগে।
যাকে দেখে প্রাণ জুড়োয় কী ক’রে রাগ করি তার প্রতি ॥ ২৬ ॥

সখীরা শেখায়

প্রিয়ের প্রণয়ে যখন প্রথম ঘটে অপরাধ
মেয়েটি জানে না অঙ্গ ঘুরিয়ে কোন কায়দায়
বলবে স্পষ্ট ক’রে
সহচরীদের উপদেশ ছাড়া।
তকতকে গালে গড়ানো অশ্রু চূর্ণ অলক লুট ক’রে নেয়,
বিপর্যস্ত নেত্রপদ্মে কেঁদে কেঁদে হয় সারা ॥ ২৭ ॥

বোঝা গেছে

যাক, বোঝা গেছে। কথা ব'লে আর কী হবে ?
প্রিয়, চলে যাও।
তোমাকে দেব না আমি এতটুকু দুর্নাম
আসলে বিধিই বাম।
তোমার প্রেমের হয় যদি হাল এই
হতভাগা ক্ষণভঙ্গুর প্রাণ গেলেও দুঃখ নেই ॥ ২৮ ॥

কাকে ভয়

পরেছ গলায় ঝকমকে হার
কোমরে তোমার বাজে মেখলায় ঝুমুর ঝুমুর
পায়ে রুনু ঝুনু বাজছে নূপুর।
এত ঢাকঢোল পিটিয়ে যেখানে
অভিসারে যাও,
দুরু দুরু বুকে কী তোমার এত তাকাবার মানে ? ॥ ২৯

খণ্ডিতা

এসে রোজ সাতসকালে চোখের ঘুম তুমি কাড়ো—
ফলে, গৌরব হয়েছে লাঘব এ পোড়া কপালে।
কী কাণ্ড তুমি করেছ, মূর্খ
মরণেও ভয় নেই আর কোনো।
যাক্ গে, যখন পাচ্ছ দুঃখ
এবার তোমাকে দেবো কী পথ্য মন দিয়ে সেটা শোনো ॥ ৩০ ॥

কেন ছেড়ে যাও

খসে কঙ্কণ, ঝরে অজস্র অশ্রু বন্ধুজনের
ধীরেসুস্থে যে থাকব একটু সে উপায় নেই।
আগেভাগে যেতে মন দেয় তাড়া
প্রিয়তম ঠিক করেছে যখন যাবেই
সবই যায় তার সঙ্গে—
হে প্রাণ, তাহলে কেন যাও প্রিয় সুহৃৎ স্বজন ছাড়া॥ ৩১॥

কপট নিদ্রা

সখীরা সবাই ফেলে চ'লে গেল আমায়
'প্রিয় ঘুমোচ্ছে, তুমিও ঘুমোও' ব'লে।
প্রেমের আবেশে আমি গ'লে গিয়ে
মুখ রাখি তার গালে।
এমন সেয়ানা, পুলকিত হয়ে অমনি সে চোখ খোলে
সব লজ্জাই হরণ করল একে একে যথাকালে॥ ৩২॥

পালা বদল

ছিল একদিন, ভ্রূকুটিতে রাগ, কথা না বললে আড়ি,
একটু হাসলে মিনতি বোঝাত
তাকানো মানেই প্রশ্রয়
আজ সে প্রেমের দেখ কী খোয়ার
নিচে নেমে গেছি এত
তুমি পায়ে পড়ো তাতেও আমার হয় না কো মন ভার॥ ৩৩॥

কথাটি বলে না

'দেখ গা, সুতনু, পড়েছি তোমার পায়
কেন আছ চুপ করে ?
আগে তো এমন করো নি কখনও মান ?'
এভাবে দয়িত বলায়
তেরছা ক'রে সে চায়,
কথাটি বলে না, দুচোখে কেবল ডাকে অশ্রুর বান ॥ ৩৪

লীন, না বিলীন

কুচযুগ সংকুচিত হয়েছে নিবিড় আলিঙ্গনে
সারা দেহ জুড়ে তার শিহরণ
ঘন প্রেমরস উথ্‌লিয়ে কটিবাস
হয়েছে অসম্বৃত,
ক্ষীণস্বরে 'না, না, আর বেশি কিছু ক'রো না' যে বলে,
জানে না সে মনে লীন, না বিলীন, নিদ্রিত, নাকি মৃত ? ॥ ৩৫

আলগোছে

পায়ের কাপড়ে হাত পড়ে যেই স্বামীর
নোয়ায় মুখ সে সহজাত শালীনতায়,
হুট্‌ করে তাকে জড়িয়ে ধরলে
নিজেকে মুক্ত ক'রে নেয় আলগোছে,
সখীরা মুচ্‌কে হাসছে দেখতে পায়
প্রথম এ পরিহাসে নববধূ ম'রে যায় সংকোচে ॥ ৩৬ ॥

চোখাচোখি হতে

অনুনয়ে কোনো কাজ হয় নি কো
মাঠে মারা গেছে সুহৃদের পরামর্শ
দীর্ঘদিন সে রেখে দিয়েছিল হৃদয়ে যত্নে তুলে—
যেই অবশ্য
চোরা চাহনিতে চোখোচোখি হল দুজনের
সহাস্যে সব মান অভিমান দুজনেই গেল ভুলে ॥ ৩৭

মনে প'ড়ে গিয়ে

নেই আর সেই প্রেমের বিহ্বলতা,
চ'টে গেছে ভাব, নেই আর সেই খাতির—
আর পাঁচজন লোকের মতই সে যায় সামনে দিয়ে।
তবুও সেসব হারানো দিনের কথা মনে প'ড়ে গিয়ে
যত করি নাড়াচাড়া
জানি না কেন যে হৃদয় আমার ফেটে হয় চৌচির ॥ ৩৮ ॥

পুর্নদর্শনে

দীর্ঘ অদর্শনে পড়েছিল এলিয়ে শরীর
হেনকালে কাছে এসে হাসিমুখে দাঁড়াতেই প্রিয়
মনে হল যেন পুনর্জীবন পেল পৃথিবীও।
দিনের বেলাটা কোনোমতে ক'রে পার
রাত্রি যখন এল
রতি যদিও বা শেষ হয়, তবু কথা ফুরোয় না আর ॥ ৩৯ ॥

গৃহপ্রবেশ

নীল পদ্মে না, দৃষ্টি দিয়ে সে গেঁথেছে তোরণমালা ;
কুন্দকুসুম-টুসুম নয় কো
দয়িতের হাতে সে দেয় হাসির তোড়া ;
ঘটের জলে না, ঘাম দিয়ে করে আবাহন স্তনজোড়া ;
ঘরের ভেতর প্রবেশ করলে প্রেমিক
তন্বী নিজের দেহ দিয়ে করে প্রিয়ের মাঙ্গলিক ॥ ৪০ ॥

ছলেবলে

আমি কি তা জানি, ঘাড়-ধ'রে-বার-ক'রে-দেওয়া সেই ডেক্‌রা
ভেতরে আবার এসে গেছে প্রিয়সখীর ছদ্মবেশে !
আমি ভুল ক'রে টেনে নিয়ে তাকে কোলে
জানিয়েছি যেহ গূঢ় বাসনার কথা, বলেছে সে হেসে—
'উঁহু, সম্ভব নয়'।
রাতে সেই, দেখ, জড়িয়ে ধরল ছলেবলে কৌশলে ॥ ৪১ ॥

মান করলেও

পাছে পায়ে ধরি, তাই রেখেছে সে পা-দুটো আঁচলে ঢেকে
সোজা না তাকিয়ে হাসি চাপে কোনো ফিকিরে,
আমার কথা সে কানেই তোলে না
সমানে কেবল বক বক করে সখীদের দিকে ফিরে।
তন্বীর প্রেম ষোলকলা হলে ভরা—
থাক্ গে সে কথা, মান করলেও আহা সে তো অপ্সরা ॥ ৪২ ॥

যাও পাখি বলো

সখীদের যত সাজানো মিথ্যে বুলি
মুখের ওপর ওগ্‌রায়,
স্বামীটিকে দাঁড় করায় সে কাঠগড়ায়।
প্রেম জিনিসটা মজাদার স্বভাবত
কাজেই সে এরপর
সোৎসাহে কাজ শুরু ক'রে দেয় মদনের মনোমত'॥ ৪৩ ॥

বহুরূপী

দূরে গেলে করে উচাটন, কাছে এলে হয় বিস্ফারিত,
লাজে রাঙা হয় নিবিড় আলিঙ্গনে,
বসন টানলে ভুরু কোঁচকায়,
জলে ভ'রে ওঠে সে যখন পড়ে পা-য় —
প্রেমিকের ঘটে যখন যেমন ত্রুটি,
সেই মত রং-ঢং বদ্‌লায় প্রেয়সীর চোখদুটি ॥ ৪৪ ॥

হেত্বাভাষ

প্রেমিক শুধায় : 'কী কারণে তুমি হয়েছ এতটা রোগা ?
সুন্দরি, তুমি কাঁপছ কিসের জ্বরে ?
কেন বিবর্ণ হয়েছে তোমার গাল ?'
সব প্রশ্নের উত্তর দেয় একটি কথায় তন্বী :
'অম্‌নি।'
দীর্ঘশ্বাস ফেলে পাশ ফেরে ; দুচোখে অশ্রু ঝরে ॥ ৪৫ ॥

সকরুণ সুরে

রাতে জলভরা মৃদুমন্থর মেঘের মন্দ্রস্বরে
বিরহী পথিক উঠেছিল গেয়ে দুঃখের গীতাবলি
শুনে সেই গান গিয়েছিল থেমে
প্রাণ উচাটন প্রবাসের সব আলাপ ;
সবাই তখন প্রেমে
যার যত কিছু ছিল অভিমান দিয়েছে জলাঞ্জলি ॥ ৪৬ ॥

চিনতে না পেরে

নিজেরই নখের আঁচড় চিনতে না পেরে নেশার ঘোরে
চলে যাচ্ছিল ঈর্ষ্যায় রেগে মেগে
'কোথায় যাচ্ছ' বলে আমি যেই আঁচল ধরেছি চেপে
কান্নায় ঠোঁট ফুলিয়ে সে আক্ষেপে
খালি বলেছিল, 'ছেড়ে দাও, ছাড়ো'—
তার সেই কথা আছে চিরদিন স্মৃতিতে আমার জেগে ॥ ৪৭

পরিণাম

প্রেমে বিগলিত মনের মানুষ একদিন ঘরে এসে
পড়েছিল দুটি পায়
তাকে দূরে ঠেলে দিয়েছ আপন খেয়ালে
চপল হৃদয়ে চরম অবজ্ঞায়—
সেই থেকে সুখ গেছে জীবনের মত
কাঁদতেই হবে, যে গাছ পুঁতেছ তার ফল পাও ডালে ॥ ৪৮ ॥

বলা যায় না

আকাশের মেঘ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে
বলেছিল তার দয়িতকে, 'যদি প্রবাসে—'
বাকি কথাটুকু পারে নি বলতে চোখ ছিল জলে ভেজা।
আঙুলে জড়িয়ে আমার বসনপ্রান্ত সে ঝুঁকে প'ড়ে
কেটেছিল দাগ মাটিতে নখের আঁচড়ে।
সে কথা কি আর মুখে আনা যায়, এরপর ঘটেছে যা ॥ ৪৯

কেন কাঁদি

'ও মেয়ে?'
'হে নাথ!'
'যা করেছি সব রাগের মাথায়, অভিমান যাও ভুলে'
'দোষ তোমার না, এ অধম অপরাধী।'
'তবে আর কেন এত কাঁদো ফুলে ফুলে?'
'কার কাছে?'
'কেন, এই তো আমার—'
'কে আমি তোমার? নই প্রিয়তমা। সেই দুঃখেই কাঁদি' ॥ ৫০ ॥

হায়

যখন সে ছিল নববধূ সেই দিনগুলো মনে ক'রে
সেয়ানা বয়সে আজ রসবতী পস্তায়।
ভাবে তখন কী ছিলাম আহাম্মুক!
দয়িতকে কেন বাঁধি নি কো বাহুডোরে?

সে যখন করেছিল চুম্বন আমায়
কেন চোখ তুলে তাকাই নি, কেন থেকেছি নীরব মূক ? ॥ ৫১ ॥

পরাভব

যারা পায়ে প'ড়ে বাধা দেয় প্রিয়তমের যাওয়ায়
মাথায় দিব্যি দেয়, কেঁদে মরে, মন রাখে নানা ছলে
আমি নই সেই দলে।
নেই কোনো খেদ, কাল ভালো দিন
ভোরে উঠে দিও রওনা দুর্গা ব'লে
বেরিয়ে শুনবে প্রেমের ক্ষেত্রে যেটা হয় সমীচীন ॥ ৫২ ॥

প্রতিরোধ

চেপে ধরে নি কো কাপড়ের খুঁট, থাকে নি আগ্‌লে দুয়োর।
কোটে নি কো মাথা কেবলি পায়ের ওপর,
বলে নি, 'যেয়ো না, থাকো।'
তন্বীর ভয়, চতুর প্রমিক মেঘের বাহানা ক'রে
কেটে পড়ে যদি
তাই পথরোধ ক'রে তার চোখে বয় কল্পিত নদী ॥ ৫৩ ॥

সমান

যম যে রকম দিন গণনায় দক্ষ পারঙ্গম—
অতনু পুষ্পধনু

বিষম বিরহে ক'রে দেয় তাকে দিনে দিনে ক্ষীণতনু।
কম নও তুমিও তো !
এভাবে কেবলি মান-রোগে যদি ভোগো
হে নাথ, কী ক'রে বাঁচে কিশলয়-কোমল রমণী, ওগো ॥ ৫৪ ॥

মান ভাঙলে

পায়ে পড়া ছাড়া আমার তখন কীই বা করার ছিল ?
এমন সময় নিজেই নিজের চাঁদমুখটি সে
স্বহস্তে তুলে নিল।
তার কাছ থেকে মিলেছিল বটে প্রসাদ—
চোখের পাতার জলাধার থেকে
ভেসে গেল যেই তার স্তনতট ভেঙে গিয়ে সব বাঁধ ॥ ৫৫ ॥

জ্বালা

দূর থেকে মৃদুমধুর হাসিতে জানিয়েছ তুমি স্বাগত
মেনেছ আদেশ, কথারও দিয়েছ জবাব
দৃষ্টিতে মোটে ছিল না আল্গা ভাব—
সাধ অন্তর্নিহিত রাগের বাইরের প্রসাধন।
ঢাকা দাও বৃথা, কঠিন হৃদয়া !
জ্বালা ধরে মনে, কারণ আমি তা বুঝি যে বিলক্ষণ ॥ ৫৬ ॥

উভয়সঙ্কটে

আদৌ ভরসা করা যায় না কো সখীদের।
যে জানে মনের কথাটি, তাকেও বলতে পারি না লজ্জায়—
স্থলিত চোখে তাকাব একটু, তারও যে এদিকে জো নেই,
ভিড় ক'রে আছে পরিহাসপ্রিয় পরিবার পরিজনে।
সাঁট-ইশারাও বোঝে সব বাছাধনরা।
নিভু-নিভু আঁচ প্রেমের, এখন বল্ মা কোথায় যাই ॥ ৫৭ ॥

রোমাঞ্চ

গায়ে কাঁটা দেয় কানে এলে তার নামের মধুর ধ্বনি
তার চাঁদমুখ দেখলে আমার দেহ হয় ঝলমলে
যেন অবিকল চন্দ্রকান্তমণি।
সে যখন আসে কাছে
হাত বাড়ালেই যখন জড়াতে পারি তার গলা
টুটে যায় অভিমানের চিন্তা, কঠিন হৃদয় গলে ॥ ৫৮ ॥

পুরুষ

ঘরে ঘরে আছে যুবতী অনেক, তাদের শুধিয়ে এসো—
তোমাদের প্রেমিকেরা সবাই কি এই অধীনের মতো
একেবারে পদানত ?
নিজেই নিজের পায়েতে কুড়ুল মেরো না, খবর্দার !
যারা দুর্জন তাদের আকথাকুকথায় কান দিও না।
পুরুষের প্রেম ছুটে যায় দিলে দুঃখ বারংবার ॥ ৫৯ ॥

রসের জোয়ারে

প্রেমের রসের জোয়ারে দুজনে ভাসে।
মাঝখানে গুরুজনদের সাঁকো থাকায়
থাকে অপূর্ণ দুজনেরই মনোরথ।
তবু চিত্রার্পিতবৎ
দুজনের মুখ দুজনের দিকে হেলে—
পান করে রস তারা নিজেদের নয়নপদ্মনালে ॥ ৬০ ॥

অবুঝ

তন্বী, তোমার কুচযুগ থেকে চন্দন গেছে উঠে
মুছেচে চোখের কাজল, ওষ্ঠরাগ
সারাটা শরীরে পুলক উঠেছে ফুটে।
ওহে, মিথ্যুক দূতী!
বন্ধুর ব্যথা আদৌ গায়ে না মেখে
অধমের কাছে না গিয়ে সটান দীঘিতে গেছ গা ধুতে ॥ ৬১ ॥

প্রবাস অন্তে

যখন ছিলাম প্রবাসে, তখন ম্লান পাণ্ডুর মুখে
ছিল অগোছালো চূর্ণ অলক
ফিরে আসতেই প্রিয়ার সে মুখে হঠাৎ আলোর ঝলক।
ছিল কি আদর তার রমণীয়
আবেগদৃপ্ত সুরতক্রিয়ার সেদিন দ্বৈত মিলনে।
অধরের সুধাপানের সে সুখ চিরদিন রবে মনে ॥ ৬২ ॥

ঈর্ষ্যায়

কাঁহাতক করে ঈর্ষ্যা, কাজেই ছেদ টেনে দিল বিবাদে।
গায়ের কাপড় খসায় যদি সে, চুলের মুঠিও ধরে
তবুও প্রেয়সী কোঁচকায় না কো ভুরু
করে না আদৌ সজোরে অধর দংশন।
দেয় গা এলিয়ে সে যদি হঠাৎ বাহুডোরে বাঁধে।
প্রেয়সী করেছে রাগ দেখানোর অভিনব পালা শুরু ॥ ৬৩ ॥

পথরোধ

হয়ে উচাটন মোহাবেশে বিনাবাক্যব্যয়ে সে
প্রেয়সীর পায়ে পড়েছিল এসে।
প্রত্যাখ্যাত হয়ে যখন সে ভগ্নহৃদয়ে ফিরে যেতে উদ্যত
তখনই তন্বী লজ্জাবনত চোখে
অশ্রুর ধারা ঢেলে অবিরাম
তরলতা দিয়ে প্রিয়ের যাওয়ায় বাধাদানে হল রত ॥ ৬৪ ॥

প্রচ্ছদপট

কোথাও পানের পিক, অগুরুর প্রলেপ কোথাও,
কোনোখানে ছুঁড়ে-মারা কুমকুম,
কোথাও পায়ের আলতার ছোপ,
এখানে সেখানে শরীরের ভাঁজে পড়েছে চুনট,
কোথাও চূর্ণ কুন্তল থেকে খসে-পড়া কিছু শুষ্ক কুসুম
—তার রকমারি রতিক্রিয়ায় আঁকা প্রচ্ছদপট ॥ ৬৫ ॥

ঠক

ডেকে বলেছিল, 'কিছু কথা আছে নিভৃতে বলার।'
বুঝি নি তো কিছু, গিয়েছি সরল মনে।
শোনার জন্যে ছিলাম আমিও উৎসুক।
এমন ঠক সে, কানে কানে কথা বলবার ভান ক'রে
খালি শোঁকে মুখ।
তারপর খোঁপা ধ'রে সে অধর ভরে দিল চুম্বনে ॥ ৬৬ ॥

শোধবোধ

হে কমলাক্ষী, ক্রোধ যদি এত বড় হয় আজ তোমার কাছে
হয়ে যাই তাজ্জব
সেখানে আমার কীই বা করার আছে!
এতদিন আমি দিয়েছি তোমাকে যে ক'টা আলিঙ্গন,
চুম্বন যতগুলো
আমাকে ফেরত দিয়ে যাও তুমি সুদে ও আসলে সব ॥ ৬৭ ॥

ভয় নেই

'হস্তিশিশুর মত উরু নিয়ে, ওগো সুন্দরি, গভীর আঁধারে
এ নিশুতি রাতে চলেছ কোথায় ধেয়ে?'
'যেখানে রয়েছে, মনের মানুষ, যেখানে প্রাণেশ্বর।'
'একা একা তুমি চলেছ, ও মেয়ে
করে না তোমার ভয়?'
'ভয় কী? মদন সাথে, তাঁর হাতে রয়েছে ধনুঃশর' ॥ ৬৮ ॥

ছাড়া

হাত জোড় ক'রে কত যে মিনতি করেছে প্রেয়সী
তাকিয়ে প্রিয়ের দিকে সকাতর চোখে,
ধ'রে কাপড়ের কষি
বাহুপাশে তাকে বেঁধেছে অসংকোচে,
তবুও প্রিয়কে পায়ে ঠেলে সব চলে যেতে দেখে
প্রথমে সে ছাড়ে বাঁচার বাসনা, পরে ছাড়ে দয়িতকে ॥ ৬৯ ॥

দীর্ঘশ্বাস

কপালে আলতা, গলদেশে বাজুবন্ধের ছাপ,
মুখময় কালো কাজলের দাগ,
চোখের দুপাশে পান-খাওয়া কারো ঠোঁটের রক্তরাগ—
প্রিয়ের অঙ্গে ক্রোধ-জন্মানো এসব চিহ্ন ধরা প'ড়ে গেলে সকালে
গন্ধ নেবার ছলে সে হরিণনয়না
হাতে নিয়ে লীলাকমল দীর্ঘনিশ্বাস খালি ফেলে ॥ ৭০ ॥

হলে প্রিয়হারা

আজ থেকে গেল সমস্ত মান অভিমান চুকে বুকে
তার নাম এরপর বিষবৎ আনব না আর মুখে।
সব ছেড়ে দিয়ে দাঁড়ায় মোদ্দা কথা,
হই যদি প্রিয়হারা
জ্যোচ্ছনা রাত আমাকে দেখে কি ভরবে অট্টহাসিতে ?
বর্ষার মেঘমলিন দিন কি কাটবে না তাকে ছাড়া ? ॥ ৭১ ॥

কাকে বলি

আলিঙ্গনের সময়, হে শঠ, সহসা অন্য মেয়ের
মণিমেখলার রিনিকি ঝিনিকি ওঠে।
শুনে তুমি করেছিলে যে শিথিল বাহুবন্ধন, সে কথা
হায়, কাকে জানাব তা।
ঘৃত মধুময় তোমার বাক্যবিষে
ঘুরে গেছে সখী এমন, আমাকে পাত্তা দেয় না মোটে ॥ ৭২

ধরা প'ড়ে

স্বামী ঘুমোবার ভান ক'রে শুয়ে আছে নিঃসাড়ে।
ঘর নির্জন ; বউ উঠে প'ড়ে এগোয় পা টিপে টিপে,
দেখে শুনে নির্ভয়ে তারপর চুমো আঁকে চুপিসারে—
স্বামীর গণ্ডে পুলকচিহ্ন চোখে পড়তেই
লজ্জায় বধূ হয়ে পড়ে অধোবদন,
হেসে ফেলে প্রিয় তাকে বুকে টেনে করে মুখচুম্বন ॥ ৭৩ ॥

মার্জনা

কখন থেকে সে পায়ে প'ড়ে আছে, হে কোপবতী!
কেন কিছুতেই যায় না তোমার রোষ?
আরম্ভে তার ঢিলেমি কিছুটা থাকতেই পারে
তাতেই বা কোন্ দোষ?
পরিজনদের এসব কথায় তার রাগ পড়ে।
থাকা না-থাকার দ্বিধা নিয়ে চোখে জল টলমল করে ॥ ৭৪ ॥

দ্বিচারী

ভুল নামে ডেকে ফেলেছিল স্রেফ মুখ ফস্‌কে সে
ওর ঘর থেকে এর ঘরে এসে।
শোনে নি এমন ভান করেছিল বিরহে শীর্ণকায়া ;
তার খালি ভয়, অসহনশীল সখীদের কানে গেলে
না জানি কী থেকে কী হয়—
জুল্‌জুল্‌ ক'রে চায় খালি ঘরে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ॥ ৭৫ ॥

ভয়

'যেতে দে এখুনি, যদি ভালো চাস
নইলে কিন্তু রাত্রের কথা ক'রে দেব সব ফাঁস—'
দাঁড়ের ময়না বলল ফিস্‌ফিসিয়ে।
শুনে লজ্জায় পেটে হাসি চেপে
বউটি এমন মুখের ভঙ্গি করে
যেন পদ্মের আধফোটা কুঁড়ি নত হয়ে আছে ঝড়ে ॥ ৭৬ ॥

অংশীদার

বন্ধুরা জোড়ে অঝোরে কান্না, চিন্তার বোঝা গুরুজনে বয়
পরিজনে নেয় দৈন্যদশার ভার,
সখীরাও সয় জ্বালাযন্ত্রণা কম নয়।
সব কিছু যাবে জুড়িয়ে আজ কি কাল
যতই সে ধুঁকে মরুক, কষ্ট পাক—
জেনে রেখো, তার বিরহদুঃখে সবাই অংশভাক ॥ ৭৭ ॥

আসা-পথ চেয়ে

'হোক তনু কৃশ, হোক গে হৃদয় দীর্ণ পঞ্চশরে
কাজ নেই, সখি, আর দয়িতের ওসব চটুল প্রেমে'—
প্রচণ্ড রাগে এইসব কথা ব'লে গেল বটে
সে খুব ঝাঁঝালো স্বরে,
যত কিছু তড়পানো সব মুখে—
সে মৃগনয়না তার আসা-পথে চায় দুরু দুরু বুকে ॥ ৭৮ ॥

অছিলায়

অন্য মেয়ের দষ্ট অধর ঢাকা দিয়ে লীলাকমলে
চোখ বুঁজে থাকে আচমকা তার চোখে
পরাগ পড়েছে ব'লে।
কান্তা তখন চাঁদমুখ নিচু ক'রে
ফুঁ দেয় চোখের তারায়।
প্রিয় তক্ষুণি তার নতমুখ চুম্বনে দেয় ভ'রে ॥ ৭৯

একদা শরীর ছিল আমাদের এক অভিন্ন
প্রিয় হলে তুমি তারপর
তুলনায় আমি প্রেয়সী ভগ্নহৃদয়
ইদানীং আমি জায়া তুমি পতি
তারপর আর কী হয়!
বজ্রকঠিন প্রাণ হল এই অভাগীর পরিণতি ॥ ৮০ ॥

না শোনে

উজবুক মেয়ে, কেন তুমি চাও মোহাচ্ছন্ন হয়ে
কাটাতে সারাটা জীবন ?
মেজাজ দেখাও, সরলতা ছাড়ো, ক'ষে বাঁধো মন—'
সখীকে থামিয়ে সভয়ে প্রেয়সী বলে,
'চুপ, চুপ, ওলো ! আস্তে !
প্রাণেশ্বর যে রয়েছে আমার বুকের অন্তস্তলে' ॥ ৮১ ॥

সাজা

চরণ রাঙানো ছিল প্রেয়সীর লাল আল্‌তায়
নতুন পাতার মতন কোমল
পদযুগে ছিল নূপুর ।
ঘটেছিল প্রেমে অপরাধ তাই
প্রিয়কে প্রেয়সী দিয়েছিল পায়ে ঠেলে—
এ সাজা দেবতা মকরধ্বজ করেছেন মঞ্জুর ॥ ৮২

এখন কেন

সময় থাকতে তলিয়ে ভাবো নি প্রেমের কী পরিণতি
হে তরলমতি,
সখীদের তুমি করেছিলে হেলাফেলা ।
আজ অবেলায় কেন করো মন ভার ?
বৃথাই এখন করো অরণ্যে রোদন
নিজে হাতে নিয়ে প্রলয়াগ্নির জলন্ত অঙ্গার ॥ ৮৩ ॥

আমি নই

তোমার গালের পত্রলেখার উঠে গেছে রং
হাতের চেটোর ঘষা লেগে লেগে,
নিশ্বাস শুষে নিয়েছে তোমার অধরের সুধারস,
কণ্ঠলগ্ন অশ্রু বারংবার কাঁপিয়েছে স্তনতট উদ্বেগে
তোমার তো আর ক্রোধ বই
প্রিয় কিছু নেই। আমিও এখন সে প্রিয়পাত্র নই ॥ ৮৪

আলো নিভে যায়

কতদিন পর স্বামী ফেরে বাড়ি ; বধূর আজকে সাধআহ্লাদ কত·
বড় আশায় সে ঘরে ঢুকে দেখে মূর্খ বাড়ির লোকে
বকর বকর ক'রে চলে ক্রমাগত।
কামনাকাতর তন্বী তখন হঠাৎ 'আমাকে কিসে কামড়ালো'
ব'লে দ্রুত পায়ে শাড়ির আঁচল
ঝাড়ল এমন জোরে যে তাতেই নিভল ঘরের আলো ॥ ৮৫ ॥

অন্য পথে

আমার প্রথম স্তনমুকুল তো তোমার হাতেই বড় হয়েছিল
তোমার বাক্যভঙ্গিতে মিশে আমার মুখের কথা
হারালো সে সরলতা।
ধাত্রীর গলা ছেড়ে, নিষ্ঠুর
বাহুলতা দিয়ে বেঁধেছি তোমার গ্রীবা।
হায়, আজ আর এ পথ তোমার পথ নয়, করি কিবা ॥ ৮৬ ॥

একবার দেখে

একবার চোখে যদি ভালো লাগে তাহলেই মজে মন।
পরিচয় হলে কত রকমে যে
অনুরাগ যায় বেড়ে।
দূতী মারফত হয় বিস্তর কথোপকথন
প্রিয়াকে আবেগে আলিঙ্গনের আনন্দ দূরে থাকুক—
বাড়ির সামনে পায়চারি করি, তাতেও পরম সুখ ॥ ৮৭ ॥

রতি অবসানে

হাতের ছড়িটি দিয়ে বার বার চেয়েছে প্রদীপ নেভাতে
নাগাল না পেয়ে শেষে
স্খলিত বসনে মালাগাছিটাই ছুঁড়ে দিয়েছে সে।
রতি অবসানে পতির দুচোখ হাত দিয়ে ঢেকে রাখে,
তারপর হেসে কুটোপাটি হয়ে
প্রিয়তমা তার দয়িতের মুখ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে ॥ ৮৮ ॥

ধন্ধ

প্রাণবল্লভ যখন আমার সুমুখে দাঁড়িয়ে ঠায়
কানে অবিরাম
মধু ঢেলে যায়—
কি রকম যেন ধাঁধা লাগে মনে
আমার সকল অঙ্গ ও প্রত্যঙ্গ
শুধু চোখ হয়ে দর্শন করে, শুধু কান হয়ে শোনে ॥ ৮৯ ॥

ফেরা

যে পথ দিয়ে সে আসে সারাদিন সেই দিকে চোখ মেলে
যতদূরে যায় দৃষ্টি তাকিয়ে থাকে।
থেমে আসে পথে লোক চলাচল, ঘনায় অন্ধকার।
হয়ত এখন ফিরে এসেছে সে, এই ভেবে প্রিয়তমা
ঘরের দিকে পা ফেলে
তবুও পেছনে তাকাতে ভোলে না সহসা ফিরিয়ে ঘাড় ॥ ৯০ ॥

পথে প্রবাসে

প্রিয়তমা আছে যেখানে সে-দেশ বহু যোজনের পথ
দুইয়ের মধ্যে রচে ব্যবধান
শত শত নদী বন পর্বত—
তবু সে পান্থ তার পদাগ্র আঁকড়ে মাটিতে
জলভরা চোখে প্রিয়ার আশায়
উদ্‌গ্রীব হয়ে দূরদিগন্তে খালি বার বার চায় ॥ ৯১ ॥

সাফাই

মুখ কেন এত ঘামে জবজবে ? চড়া রোদ্দুরে।
চোখ কেন লাল ? কথার খোঁচায়।
কেন আলুথালু চূর্ণ অলক ? হাওয়া বয় জোরে।
কী কারণে মুছে গেছে কুঙ্কুম ? ওড়নায় ঘষা লেগে।
হাঁপাচ্ছ কেন ? হাঁটাহাঁটি ক'রে
যা বলো তা ঠিক। কিন্তু হে দূতী, ঠোঁটের ক্ষত যে জেগে ॥ ৯২ ॥

হেস্তনেস্ত

হে কঠিনপ্রাণ, আমার বিষয়ে মিথ্যাশ্রয়ী ভ্রান্ত ধারণা ছাড়ো
আমাকে দুঃখ দেওয়া ঠিক নয়
কুলোকেরা যাই বলুক।
মনে তোমার কী বুকে হাত দিয়ে বলো
ঘোচাও আজকে সমস্ত সংশয়।
আমাকে তোমার যা মর্জি হয় ক'রে তুমি পাও সুখ ॥ ৯৩॥

দৈবের হাতে

ভ্রূসংকেতের গুণে ঘাটি নেই আমার,
চোখ টেপাতেও অভ্যেস বহু দিনের,
যত্ন ক'রেই শিখেছি কায়দা হাসি চাপা যায় যাতে,
জানি কৌশল মুখ বুঁজে থাকবার,
সহ্যশক্তি থেকেও হৃদয় অভিমানে বেশ দড়।
অনুষ্ঠানের ত্রুটি নেই কোনো, ফল দৈবের হাতে ॥ ৯৪

কী করি

পায়ে পড়া, কথা বলতে বলতে অশ্রুমোচন,
মন-কাড়া চাটুকারিতা।
কৃশতর তনু বুকে টেনে নিয়ে হঠাৎ ওষ্ঠে চুম্বন—
অভিমানে মেলে এমনি অনেক সুফল
তবুও আমার মন দেয় না কো সায়।
হৃদয় যেখানে কামনার ধন, সেখানে কী করা যায় ॥ ৯৫ ॥

পাল্টেছে

এতদিন আমি যা ব'লে এসেছি, ও বলেছে ঠিক সেটাই।
সে লোক এখন দেখি
পাল্টে গিয়েছে বেবাক।
কে জানে পুরুষ জাতটার হয় যে কী!
সে বলবে 'এটা সাদা', যদি বলি 'প্রিয়তম, এটা কালো।'
আমি 'চলো যাই' বললে সে বলে, 'বরং যাওয়াই ভালো' ॥ ৯৬ ॥

ইন্ধন

গায়ে লেপ্‌টানো ভিজে জবজবে বসন,
ফোটা পদ্মের ফুলদল,
সুগন্ধ, চন্দন,
শিশিরবিন্দু ছিটানো স্নিগ্ধ চাঁদ
যার ইন্ধন
সেই কামানল নির্বাপণের আছে কোন্ কৌশল? ॥ ৯৭ ॥

বিরহবার্তা

বৃষ্টি পড়েছে টিপ্‌টিপ্‌ ক'রে সারা রাত
বিরহিণী প্রিয়া একা ব'সে খালি দীর্ঘশ্বাস ফেলে
করেছে অশ্রুপাত।
তার কথা ভেবে ভেবে রাতভর ঠায়
বিরহী পথিক কেঁদেছে এমন ডাক ছেড়ে পথেঘাটেই
মোড়ল দেয় নি তাই তাকে গাঁয়ে মাথা গুঁজবার ঠাঁই ॥ ৯৮ ॥

পথের বাধা

অভিমানে আমি পীড়িত, পারি না যেতে
ইদানীং তার কাছে।
ধ'রে নিয়ে যেত জোর ক'রে, হলে সখীরা তেমন চতুর
সে নিজে আসবে তাও তো পারে না, তারও
ষোলআনা ভয় মান ক্ষয়ে যায় পাছে—
যায় দিন, আয়ু ফুরোয়, বিষাদে মন হয় ভারাতুর ॥ ৯৯

অদ্বৈতবাদ

প্রাসাদে সে, দিক্‌দিগন্তেও সে, সম্মুখে সে, পিছনেও সে
সে পর্যঙ্কে, সে পথে
সে তো ঐ, সে তো এই—
তাকে ছেড়ে মনে বিরহী বিষাদ
প্রকৃতিতে তবু সে ছাড়া দ্বিতীয় কেউ নেই।
চরাচর জুড়ে সে শুধু, শুধু সে—এ কী অদ্বৈতবাদ ॥ ১০০ ॥

১ হাফিজের কবিতা

সুভাষ মুখোপাধ্যায় অনূদিত। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলিকাতা-৯। প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারী ১৯৮৪, দ্বিতীয় মুদ্রণ, নভেম্বর ১৯৮৭। ২৫ সে. মি.× ১৩ সে. মি.। প্রচ্ছদ ও অলংকরণ: সুনীল শীল। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ফণিভূষণ দেব কর্তৃক ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলিকাতা-৭০০০০৯ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ প্রেস এণ্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক পি ২৪৮ সি. আই. টি. স্কীম নং ৬ এম কলিকাতা-৭০০০০৯ থেকে মুদ্রিত। মূল্য ৩০.০০ টাকা। উৎসর্গ: আবু সয়ীদ আইয়ুব শ্রদ্ধাস্পদেষু। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৮৬। এর মধ্যে প্রথম ১০৮ পৃষ্ঠা বাংলা অনুবাদ। ১১১ পৃষ্ঠা থেকে ১৮৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত বাংলা হরফে হাফিজের মূল কবিতা দেওয়া আছে।

বাংলায় হাফিজ অনুবাদের ঐতিহ্য বেশ অনেক দিনের। ১৮৩১ শক (১৯০৯ খ্রি.)-এ প্রকাশিত 'হাফেজ' নামক একখানি বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণের সন্ধান পাওয়া যায়। নানা সূত্র থেকে অনুমান করা যায় এই বইয়ের অনুবাদক ভাই গিরিশচন্দ্র সেন। ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরির পুস্তকতালিকা থেকে জানা যায় যে এই বইয়ের প্রথম ভাগের প্রকাশকাল ১৮৭৭। আখ্যাপত্রে বর্ণনা পাওয়া যায়: "মহা প্রেমিক খাজা হাফেজের প্রণীত দেওয়ান হাফেজ নামক মূল পারস্য গ্রন্থ হইতে অনুবাদিত। প্রথমার্ধের দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশনা বর্ণনা এই রকম: কলিকাতা। ৩নং রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট। মঙ্গলগঞ্জ মিসন প্রেসে কে. পি. নাথ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ১৮৩১ সন। [All right reserved] মূল্য ১ টাকা। ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরির তালিকা অনুসারে বইটির তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯১৫-তে। দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে অনুবাদকের অস্বাক্ষরিত সম্পূর্ণ ভূমিকাটি এখানে উদ্ধার করা হল:

"প্রধানাচার্য্য শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতের আর্য্য মহর্ষিগণ প্রণীত উপনিষদের রচনাবলী এবং পারস্য দেশের প্রমত্ত প্রেমিক খাজা হাফেজের গজল-নামক কবিতাবলী এই দুয়ের পেতি একান্ত হৃদয়ের অনুরাগ প্রকাশ করিয়া থাকেন। হাফেজের অনেক গজল তাঁহার কণ্ঠস্থ, তিনি সচরাচর বন্ধু-বান্ধবদের নিকটে তাহা উচ্চারণ করেন ও ভাবে মগ্ন হইয়া তাহার ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন।

ব্রহ্মানন্দ শ্রীমদাচার্য্য কেশবচন্দ্র সেনও হাফেজের প্রতি অতিশয় অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি অনেক সময় হাফেজের কবিতা পড়িয়া শুনাইতে আমাকে অনুরোধ করিতেন, এবং সময়ে সময়ে গভীর ভাবের অবস্থায় প্রার্থনাতে হাফেজের নাম উচ্চারণ করিতে তাঁহাকে দেখা গিয়াছে। কিছুকাল পূর্ব্বে তিনি আগ্রহের সহিত আমার নিকটে হাফেজ পড়িতে প্রবৃত্ত হন। কিয়ৎকাল প্রতিদিন কিছু কিছু করিয়া হাফেজ পড়িয়াছিলেন, প্রতিদিনের পাঠ প্রতিলিপি ও বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। তিনি পারস্য অক্ষর অতি সুন্দর ও পরিষ্কাররূপে লিখিতে পারিতেন। তাঁহার পারস্য হস্তাক্ষর মুদ্রাঙ্কিত অক্ষরের ন্যায় পরিষ্কার। হাফেজের গজল বাংলায় অনুবাদ করিয়া মুদ্রিত করিবার জন্য এক সময় আমার প্রতি তাঁহার বিশেষ আদেশ ও অনুরোধ হয়। তদনুসারে ১৭৯৮ শকের মাঘোৎসবের সময় কয়েকটি কবিতা অনুবাদ করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করা গিয়াছিল। অনেক বৎসর হইতে সেই পুস্তক নিঃশেষিত হইয়াছে। হাফেজের প্রতি বঙ্গীয় পাঠকদিগের বিশেষ আগ্রহ দেখিয়া এবার তাহা নূতন আকারে প্রকাশ করা গেল। পূর্ব্বে মূল পুস্তকের নানা অংশ হইতে কয়েকটি গজল বা গজলের অংশ নির্ব্বাচনপূর্ব্বক অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করা গিয়াছিল, এক্ষণ প্রথম হইতে রীতিমত অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হওয়া গেল।

মূল গ্রন্থকার পরমপ্রেমিক মহাপণ্ডিত খাজা সম্‌সোদ্দিন হাফেজ সুবিখ্যাত পারস্য কবি শেখ মসালহোদ্দিন্ সাদির ভাগিনেয় বলিয়া প্রসিদ্ধ। প্রায় সাত শত বৎসর পূর্ব্বে পারস্য দেশান্তর্গত শিরাজ নগরে তাঁহার জন্ম হয়। মোসলমান সাধকগণ "সালেক" ও "মজ্জুব" এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। যাঁহারা শাস্ত্রীয় বিধি প্রণালীর অধীন হইয়া নমাজ রোজা প্রভৃতি ধর্ম্মসাধনা করিয়া থাকেন তাঁহারা সালেক, ও যাঁহারা শাস্ত্রোক্ত বিধি প্রণালীর অধীন নহেন ঈশ্বরপ্রেমে বিশেষরূপে আকৃষ্ট, তাঁহারা মজ্‌জুব। খাজা হাফেজ এই শেষোক্ত শ্রেণীর অন্তর্গত ছিলেন। তাঁহার জীবনের পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে এরূপ জনশ্রুতি যে তিনি সন্ধ্যা কালে এক সমাধিমন্দিরে নিয়ত আলো দান করিতেন। একদিন যাইয়া দেখেন, কয়েকজন আরেফ (যোগী) ধ্যান স্তিমিতনেত্রে বসিয়া আছেন। তিনি সেই ধ্যানস্থিত আরেফদিগের স্বর্গীয় ভাব দেখিয়া তাঁহাদের সঙ্গে ধ্যানধারণায় প্রবৃত্ত হন। পরে তাঁহাদের নিকটে কিছু কিছু ধর্ম্মোপদেশ লাভ করেন। সেই হইতেই তিনি এক স্বর্গীয় নূতন জীবন প্রাপ্ত হন, ঈশ্বরপ্রেমে একেবারে প্রমত্ত হইয়া যান, এবং গজলনামক কবিতাবলীতে গভীর প্রেমের নানা সুমিষ্ট বচন বলিতে থাকেন। তিনি গজলের এক স্থানে বলিয়াছেন যে, "সুরাদাতা গুরুর দাসত্ব স্পর্শমণি সদৃশ, আমি তাঁহার আশ্রিত

হইয়া এই উচ্চপদ লাভ করিয়াছি।"

হাফেজের অধিকাংশ উক্তি রূপক। কবিতার অনেক স্থানে সুরা, সুরাদাতা, সুরালয়, সুরাকলস, পানপাত্র, অগ্নি উপাসক, প্রতিমা, প্রতিমামন্দির, বসন্ত ঋতু, ইদ, রোজা, উদ্যান, বোল্ বোল্ পক্ষী ইত্যাদির প্রসঙ্গ আছে। কিন্তু ইহার ভাব স্বতন্ত্র। সুরা শব্দে প্রেম বা মত্ততা, সুরাদাতা শব্দে প্রেমোদ্দীপক গুরু, সুরালয় প্রেমনিকেতন, সুরার কলস শব্দে প্রেমিক, পানপাত্র শব্দে হৃদয়, অগ্নি উপাসক শব্দে প্রেমোৎসাহী, প্রতিমা শব্দে সখা, প্রতিমামন্দির শব্দে সখানিকেতন; উদ্যান শব্দে প্রেমিকমণ্ডলী, বসন্ত ও ইদ্ শব্দে সখা সন্মিলনকাল, বোল্ বোল্ শব্দে প্রেমতত্ত্ববাদী লোক প্রভৃতি বুঝায়। হাফেজের প্রেমপূর্ণ উক্তি সকল যে শুধু ঈশ্বরকে লক্ষ্য করিয়া হইয়াছে তাহা নয়। তিনি ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক মহাত্মা মোহম্মদকে ও অন্য অন্য ঈশ্বর প্রেমিককে রূপবান্ সখা বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। মৌলবি ফতেহ আলি ও অন্য কোন কোন পারস্য পণ্ডিত পারস্য ভাষায় হাফেজের উক্তির টীকা লিখিয়াছেন। একটি কবিতার পারস্য ব্যাখ্যা এ স্থানে অনুবাদ করিয়া দেওয়া গেল, যথা; সুরাপাত্র আমার করতলে অর্পণ কর, তাহা হইলে অনুরাগের সহিত কপট বৈরাগ্যতনুচ্ছদ পরিত্যাগ করিব।" ইহার ব্যাখ্যা এই;—"আমার হৃদয়কে প্রেমসুরাতে নির্মল কর, তাহা হইলে আমি বাহ্য অস্তিতের (sic.) পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিব।" হাফেজের অনেক গজলে বাহ্য প্রেমের আভাষও পাওয়া যায়। এক এক গজলে যে, এক এক ভাবের বাক্যাবলী সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহা নয়। অনেক স্থলে একটি গজলেই ভিন্ন ভিন্ন ভাবের কবিতা সকল দেখিতে পাওয়া যায়। হাফেজের গজল সকল যেরূপ উৎসাহপূর্ণ, ওজস্বী ও সুমধুর এরূপ অন্য কোন কবিতা দৃষ্টিগোচর হয় না। গজলের ছন্দোবন্দ (sic.) অত্যন্ত কঠিন, তাহাতে তিনি সুগভীর আধ্যাত্মিক ভাব সকল বিশদরূপে নানা প্রণালীতে প্রকাশ করিয়া স্বীয় অলৌকিক ক্ষমতা ও অসাধারণ কবিত্বের পরিচয় দান করিয়াছেন। প্রত্যেক গজলের শেষ কবিতায় তাঁহার নিজের নাম পাওয়া যায়। প্রথম কবিতার উভয় চরণ মিত্রাক্ষর। অপর কবিতাগুলির শেষ চরণ প্রথম কবিতার সঙ্গে মিত্রাক্ষরে সম্বন্ধ, কিন্তু সে সমস্তের প্রথম চরণ অমিত্রাক্ষর। গজলসমুদায় শ্রেণীবদ্ধরূপে পারস্য আদিবর্ণ "আলেফ" হইতে আরম্ভ করিয়া অন্তিম বর্ণ "ইয়া" পর্য্যন্ত পর্য্যায়ক্রমে অন্তভাগে স্থাপিত। অর্থাৎ কতকগুলি গজল প্রথম বর্ণ আকারান্ত, কতকগুলি দ্বিতীয় বর্ণ বান্ত, কতকগুলি তান্ত ইত্যাদি। অকারান্তর অন্তর্গত ১৬টী গজল আছে। গজল পুস্তককে দেওয়ান বলে। এজন্য হাফেজের গজল সমূহকে দেওয়ান হাফেজ বলিয়া

থাকে। হাফেজের পূর্ব্বে প্রেমসম্বন্ধে এরূপ সুন্দর কথা যে কেহ বলিয়াছিলেন শ্রবণ করা যায় না। দেওয়ান হাফেজ গ্রন্থকে প্রেমের খনিবিশেষ বলা যাইতে পারে। আমি বাঙ্গলা গদ্যে অনুবাদে হাফেজের কবিতার সেই স্বর্গীয় লালিত্য কিছুই রক্ষা করিতে পারিলাম না, তাহার ভাবমাত্র কোন রূপে প্রকাশ করিয়াছি। মূল গ্রন্থ ভিন্ন ভিন্ন ছন্দের পাঁচশত পঁচিশটি গজলে পূর্ণ হইয়াছে। এক একটি গজলে ১০।১৫ বা ততোধিক কিংবা তন্ন্যূন (sic.) কবিতা আছে। কোন কোন গজলের কোন কোন অংশ পরিত্যক্ত হইয়াছে। স্থলবিশেষে এক গজলের দুই চারিটি কবিতার অনুবাদ অন্য গজলের অনুবাদের সঙ্গে সন্নিবেশিত করা গিয়েছে। হাফেজের গজল কোন সুকবি কবিতায় নিবদ্ধ করিতে পারিলে চমৎকার হয়। কিন্তু পদ্যে তাহা প্রকাশ করিতে গেলে অনেক স্থলে ছন্দোবন্দের অনুরোধে অবিকল অনুবাদ হইয়া উঠে না, সুতরাং মূলের যথার্থ ভাবের ব্যতিক্রম হয়, এই একটি দোষ। হাফেজের গজল সকল রাগ রাগিণী যোগে গীত হইয়া থাকে।

কথিত আছে যে, খাজা হাফেজের জীবদ্দশায় তাঁহার গজল সকল গ্রন্থকারে সম্বদ্ধ হয় নাই। তাঁহার লোকান্তর গমনের পর সেগুলি সংগৃহীত হইয়া গ্রন্থবদ্ধ হয়। হাফেজের সময়ে পারস্য দেশে মোসলমানসম্প্রদায়ের মধ্যে প্রেমের অভাব, ধর্ম্মের শুষ্ক বাহ্যাড়ম্বর কপটতার অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব ছিল। তিনি সময়ে সময়ে সেই সকলকে লক্ষ্য করিয়া উপদেষ্টা, ধর্ম্মযাজক ও ধর্ম্ম সাধকদিগকে কঠোর তিরস্কার করিয়াছেন। দরবেশী পরিত্যাগ করিয়া সুরালয়ে গিয়া সুরা পান কর, প্রতিমা পূজা কর, অগ্নি উপাসকের শিষ্য হও, ইত্যাদি মোসলমান ধর্ম্মবিগর্হিত কথা সকল বলিয়াছিলেন। তাহাতে মোসলমানগণ তাঁহার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত ও জাতক্রোধ ছিলেন, এবং সকলে তাঁহাকে দুশ্চরিত্র কাফের বলিয়া ঘৃণা করিতেন। তিনি পরলোকগত হইলে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগদানে অনেকে অনিচ্ছু ছিলেন ও তদ্বিষয়ে কর্তব্যাকর্তব্য অবধারণের জন্য পণ্ডিতমণ্ডলীতে মহাবাগ্বিতণ্ডা উপস্থিত হয়। পরিশেষে হাফেজ কিরূপ উক্তি সকল লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন তাহা পাঠ করিতে সকলে সমুৎসুক হন। প্রথমে এই ভাবের একটি কবিতা তাঁহাদের নয়নগোচর হয়। "হাফেজের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য যাত্রা করিতে চরণকে সঙ্কুচিত করিও না, সে যদিচ পাপে নিমগ্ন ছিল, কিন্তু স্বর্গলোকে যাইতেছে।" এই কবিতাপাঠে আর কাহারও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগদানে আপত্তি রহিল না। ইহাকে সকলে দৈববাণীস্বরূপ বিশ্বাস করিয়া লইলেন। পরে তাঁহার অন্যান্য গজলপাঠে তাহার ভবে (sic.) মুগ্ধ হইয়া সকলেই তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হইলেন। অনন্তর সমুদায় গজল গ্রন্থাকারে বদ্ধ

হইল। শিরাজনগরে মসল্লানামক স্থানে হাফেজের সমাধি বিদ্যমান। তাহা এক তীর্থ স্বরূপ হইয়াছে। নানা স্থান হইতে যাত্রিক সকল তাহা দর্শন করিতে যাইয়া থাকে।"

এই অনুবাদকের মতে, "হাফেজের গজল কোন সুকবি কবিতায় নিবদ্ধ করিতে পারিলে চমৎকার হয়। কিন্তু পদ্যে তাহা প্রকাশ করিতে গেলে অনেক স্থলে ছন্দোবন্দের অনুরোধে অবিকল অনুবাদ হইয়া উঠে না, সুতরাং মূলের যথার্থ ভাবের ব্যতিক্রম হয়, এই একটি দোষ।" বর্তমান অনুবাদ গদ্যে নিবদ্ধ। নমুনা হিসেবে প্রথম গজলটির অনুবাদ এখানে উদ্ধৃত হল :

"শুন হে সুরাদাতা, সুরা পরিবেশন কর, এবং তাহা দান কর, যেহেতু প্রেম প্রথমে সহজ বোধ হইয়াছিল, কিন্তু পরে বহু সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে।

যদি গুরু অগ্নিপূজক তোমাকে বলেন তবে সুরাদ্বারা তুমি পূজার আসনকে রঞ্জিত করিও, যেহেতু যাত্রিক পথের ও বিশ্রামস্থান সকলের অবস্থা অজ্ঞাত নহেন!

যখন গাঁঠরী বাঁধিবার জন্য অনুক্ষণ ঘণ্টাধ্বনি হইতেছে তখন সখার নিকেতনে স্থিতি আমার পক্ষে কেমন আরাম ও শান্তি!

রজনী তিমিরাচ্ছন্না ও তরঙ্গভয় এবং এরূপ ভীষণ আবর্ত্ত তীরস্থ লঘুভার লোকেরা আমার অবস্থা কোথায় জ্ঞাত?

স্বার্থপরতাবশতঃ আমার সমুদায় কার্য্যে অখ্যাতি হইয়াছে; যাহা লইয়া লোকে বহু সভার অধিবেশন করিবে সেই তত্ত্ব কেন গুপ্ত থাকিবে?

হাফেজ, যদি তুমি তাঁহার সম্মিলন বাঞ্ছা কর, তবে তাঁহার হইতে লুক্কায়িত হইও না. যাঁহাকে তুমি প্রীতি কর যখন তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইবে তখন সংসারকে বিসর্জ্জন করিও*"। ১।

অনুবাদকের টীকাগুলি লক্ষণীয়। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের অনুবাদ পড়বার সময়ে কোনো কৌতূহলী পাঠক তুলনামূলকভাবে এইসব টীকা ও ভূমিকায় প্রতিফলিত অনুবাদকের দৃষ্টিভঙ্গি মিলিয়ে পড়তে পারেন।

"* প্রথম বচনে;—সুরার অর্থ প্রেমমত্ততা; সুরাদাতা প্রেমমত্ততার উদ্দীপক গুরু; সুরাপাত্র প্রেমোন্মত্ত হৃদয়। দ্বিতীয় বচনে; —গুরু অগ্নিপূজক, প্রেমোদ্যম তেজস্বী আচার্য্য। তৃতীয় বচনে;—সখা, ঈশ্বর বা মহাপুরুষ মোহম্মদ, কিংবা অন্য ঈশ্বরপ্রেমিক পুরুষ। প্রায় সর্ব্বত্রই সুরা সুরাপাত্র অগ্নিপূজক সখা প্রভৃতি এই প্রকার অর্থ। হাফেজ সখার রূপের ব্যাখ্যা নানা স্থানে নানা প্রকারে করিয়াছেন। স্থানে স্থানে কথা সকল রূপক অভিনিবিষ্ট হইয়া ভাব গ্রহণ করিতে হইবে। গজলের চতুর্থ বচনে সংসারের অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে।"

ভূমিকাটিতে হাফেজের গজল বিষয়ে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'একান্ত হৃদয়ের অনুরাগ'-এর কথা বলা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে তাঁর 'আত্মজীবনী' গ্রন্থে (১৮৯৮) দেবেন্দ্রনাথ প্রায়ই হাফেজের গজল উদ্ধৃত করেন, সেইসঙ্গে থাকে তার গদ্যানুবাদও। 'আত্মজীবনী'র বিভিন্ন অংশ থেকে দেবেন্দ্রনাথের সেই অনুবাদকটিও এখানে সংকলিত হল :

দর্ আঁ হবা কে জুজ্ বরক্ অন্দর্ তলব্ ন বাশদ্
গর্ খির্মনে বেসোজদ্ চন্দে অ্ জব্ ন বাশদ্। [১৮১।১]

সেই অভিলাষে—বিদ্যুতের প্রার্থনা ছাড়া আর কোন প্রার্থনা না থাকুক, যদি বিদ্যুৎ পড়িয়া ধনধান্য জলিয়া যায়, তবে সে বড় আশ্চর্য্য নহে।

অয়াঁ ন শুদ্, কে চেরা আমদম্, কুজা বূদম্,
দর্দ্ ও দরেগ্ কে গা ফিল্ জে কারে খেশ্তনম্। [৩৮৮।৩]

প্রকাশ হল না যে, কোথায় ছিলাম, এখানে কেন আইলাম; দুঃখ ও পরিতাপ যে, আপনার কাজ আপনি ভুলিয়া রয়েছি।

তোরা জে কঙ্গুরয়ে অর্শ্ মী জ়নন্দ্ সফীর্,
ন দানমৎ, কে দরী দাম্গহ্ চে উফ্তাদ্ অস্ত। [২৩।৭]

সপ্তম স্বর্গ হইতে তোমার আহ্বান আসিতেছে; না জানি, এই পৃথিবীর মোহ-পাশে তোমার কি কাজ আটকাইয়াছে!

কিশ্তী-নিশস্তগান্ এম, অয়্ বাদে শুর্তা, বর্খেজ্
বাশদ্ কে বাজ্ বীনেম্ দীদারে আশনারা। [৩।৩]

আমরা এখন নৌকাতে বসিয়াছি; হে অনুকূল বায়ু, তুমি উঠ। হয়তো আবার আমাদের সেই দর্শনীয় বন্ধুকে দেখিতে পাইব।

হর্গিজ়্ম্ মেহ্রে তো অজ্ লওহে দিল্ ও জাঁ ন-র্‌বদ্।
... ...
আঁচুনাঁ মেহ্রে তো অম্ দর্ দিল্ ও জাঁ জায়ে গিরিফ্ৎ
কে গর্ অম্ সর্ বে-রবদ্, মেহ্রে তো অজ্ জাঁ ন-রবদ্। [২৬৬।১,২]

তোমার করুণা আমার মন প্রাণ হইতে কখনই যাইবে না। তোমার করুণা আমার মন প্রাণে এমনি বিদ্ধ হইয়া আছে যে, যদি আমার মস্তক যায়, তথাপি প্রাণ হইতে তোমার করুণা যাইবে না।

য়া রব্, আঁ শমে শব্-অফ্রোজ, জে কাশানা-এ-কীস্ত্?
জানে-মা সোখ্ৎ, বে-পুর্সীদ্ কে জানানা-এ-কীস্ত্? [৬১।১]

যে দীপ রাত্রিকে দিন করে, সে দীপ কাহার ঘরে ? আমার তো তাতে প্রাণ দগ্ধ হলো, জিজ্ঞাসা করি তাহা প্রিয় হলো কার ?

গো শম্‌অ ম-য়ারেদ্ দরী জম্‌অ, কে ইম্‌শব্‌

দর্ মজ্‌লিসে-মা মাহে রুখে দোস্ত্‌ তমাম্ অস্ত্‌। [৫৬। ২]

আজ আমার এ সভাতে দীপ আনিও না। আজিকার রাত্রিতে সেই পূর্ণচন্দ্র আমার বন্ধু এখানে বিরাজমান।

বাদ্ অজ-ঈ নূর্ ব-আফ়াক্ দেহেম্ অজ্‌ দিলে খেশ্‌,

কে ব-খুর্শীদ্ রসীদেম্ ও গোবার্ আখির্ শুদ্। [২০০। ৩]

এখন অবধি জ্যোতি আমার হৃদয় হইতে পৃথিবীতে ছড়াইব, যেহেতুক আমি সূর্য্যতে পঁহুছিয়াছি, ও অন্ধকার বিনাশ হইয়াছে।

রহ্‌জনে দহর্ ন খুফ়্‌তস্ত্‌, ম-শও অয়্‌মন্ অজ্‌ ও

অগর্ ইম্‌রোজ্‌ ন বুর্দস্ত, কে ফ়র্দা বে-বরদ্। [২৫৬। ৮]

সংসারের ডাকাত ঘুমায় নাই, তাহা হইতে নির্ভয় হইও না; যদি আজ সে না নিয়া যায়, কাল সে নিয়া যাবে।

বাংলায় দিওয়ান-ই হাফিজের আর এক অনুবাদক নরেন্দ্র দেব। বইটির প্রকাশ ভাদ্র ১৩৫৯ (১৯৫২ খ্রি.)। প্রকাশক : শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। সচিত্র। মুদ্রক : শ্রীগোপালচন্দ্র রায়, নাভানা প্রিন্টিং ওআর্কস্ লিমিটেড, ৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-১৩। দাম : পাঁচ টাকা

নরেন্দ্র দেবের কাব্যানুবাদের সঙ্গে একটি দীর্ঘ গদ্য ভূমিকা আছে। হাফিজের জীবনকথা ও তাঁর কাব্য বৈশিষ্ট্য বিষয়ে বেশ বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যায় এই ভূমিকাতে। হাফিজের অনুবাদকেরা সবাই তো তাঁর কবিতাকে ঠিক এক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেন নি। সেটাই স্বাভাবিক। নরেন্দ্র দেবের ভূমিকা থেকে কিছু প্রাসঙ্গিক অংশ তুলে দিচ্ছি :

১. "প্রধানতঃ তিনি ছিলেন সুফী সম্প্রদায়েরই সাধক। এই সুফীদের সঙ্গে ভারতের বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কতকটা সাদৃশ্য আছে। এঁরা ভগবানের ভক্ত-প্রেমিক, ধর্মের নিগূঢ় রহস্য-জ্ঞাতা মরমী সাধক সম্প্রদায়—কখনও ভগবানের সঙ্গে এঁদের সখ্যভাব, কখনও তিনি প্রেমাস্পদ, আবার কখনও বা প্রণয়িনী! দাস ও প্রভু ভাবে ভক্তির সঙ্গে সেবার সম্মেলনও কখনও কখনও দেখা যায়। যেমন এক জায়গায় বলেছেন :

'তুমি যে রাজার রাজা, তুমি প্রিয়তম
রহ মোর প্রেমলোকে ধ্রুবতারা সম !'

আবার অন্যত্র বলেছেন :

'ঘোমটা খোলো, ঘোমটা খোলো
আমার দিকে মুখটি তোলো
আর কতকাল চলবে বলো,
লুকিয়ে তোমার থাকা ?'

আর এক স্থানে :

'আসিয়াছি দুয়ারে তোমার
সেবকের লয়ে অধিকার
হে প্রভু, করুণা তব যাচি
চরণের দাস হয়ে আছি
—মুখপানে ফিরে তুমি চাও !' " (পৃ. ছয়)

২. "ফার্দৌশীর কাব্যে ভাষার ঐশ্বর্য এবং সাদীর কাব্যের নৈতিক সম্পদ পারস্য-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গৌরব সন্দেহ নেই, কিন্তু, দিওয়ান-ই-হাফিজ এ-সবের অনেক উচ্চে। কারণ, এর মধ্যে যে মহান অধ্যাত্ম জ্ঞান ও প্রেমের নিগূঢ় রসবোধের পরিচয় পাওয়া যায় তা এক অতীন্দ্রিয় তত্ত্বোপলব্ধির বিষয়। অথচ, আশ্চর্য এই যে, এর মধ্যে আমরা পারস্যের অধিবাসীদের ব্যক্তিগত জীবনের ছবি, তার অতীত ও বর্তমানের চিত্রও দেখতে পাই। দেখতে পাই তাদের মনের গতি, তাদের চিন্তার ধারা সেদিন কোন্ পথে চলেছিল। তাদের তৎকালীন কর্মপ্রেরণারও কতকটা পরিচয় পাই।" (পৃ. সাত)

৩. "হাফিজের কবিতাগুলির আক্ষরিক অর্থই ধরা হবে ? না, সুফীধর্মের অনুভাব অনুসরণে এর ব্যাখ্যা করা হবে ? এইটেই ছিল হাফিজের গজলগুলি সম্বন্ধে একটি বড় প্রশ্ন। সার উইলিয়ম জোন্সের মতে কোনও শেষ উত্তর দেওয়া চলে না। কারণ, একাধিক ধর্মপ্রাণ সুফী সাধক বলেন হাফিজের বহু রচনার মধ্যে সুফীধর্মের কোনও রহস্যেরই অস্তিত্ব নেই ! সুতরাং সেগুলিকে আক্ষরিক অর্থেই গ্রহণ করতে হবে। চার্লস স্টুয়ার্টের মতে কিন্তু হাফিজের অতি অল্পসংখ্যক কবিতাই আক্ষরিক অর্থে নেবার সুযোগ পাওয়া যাবে। কারণ, অধিকাংশ গজলই সুফীধর্মের পরমানন্দে অভিষিক্ত রহস্য-গূঢ় রচনা !"
(পৃ. নয়)

৪. "হাফিজ তাঁর ধর্মরহস্য প্রকাশের বাহন স্বরূপ যেসব রূপকের সাহায্য নিয়েছেন সেগুলির কিছু কিছু পরিচয় জানা থাকলে কবির এ কাব্য সংগীতের মর্মকথা অনুধাবন করা সহজসাধ্য হতে পারে। 'সাকী' অর্থে সুরাপরিবেশন-কারিণী নারী অথবা সুরাপরিবেশক বালক বোঝায়। হাফিজের সাকী হলেন সেইসব সতীর্থ যাঁরা পাপীতাপী সকলকেই ভাগবত প্রেমসুধা নির্বিচারে বিতরণ করেন, এবং যাদের সঙ্গলাভের জন্য ভগবদ্ভক্তেরা সর্বদা ব্যাকুল। 'সুরা' অর্থে, ঈশ্বর-প্রীতি, ভগবানের প্রতি অকপট প্রেম ভক্তি ও ভালবাসা। এইভাবে হাফিজ যেখানে সুরা বিক্রেতাদের উল্লেখ করেছেন সেখানে তিনি পীর ফকীর ও দরবেশদের কথাই বলেছেন বুঝতে হবে। 'তামসী রাত্রি' অর্থে তিনি পৃথিবীর মানুষের অজ্ঞানতার অন্ধকার সম্বন্ধেই বলতে চেয়েছেন। 'মুর্শীদ' কথাটা তিনি ধর্মের পথপ্রদর্শক গুরুর উদ্দেশে ব্যবহার করেছেন। 'মুশাল্লা' বলতে যে সব সময় ঠিক মশ্‌জেদ্‌ই বোঝায় তা নয়, অনেক সময় যে-কোনও স্থানই বোঝাতে পারে যেখানে মানুষ ঈশ্বরোপাসনা করে। হাফিজের প্রিয়, প্রভু, প্রাণেশ্বর, প্রণয়িনী সবই সেই পরম বঁধুয়া পরমেশ্বর। ভাগবত প্রেমই তাঁর সুরা, পানশালা বলতে সেইসব সংসারত্যাগী সাধু পীর ও দরবেশগণের আস্তানার কথাই বলতে চেয়েছেন যেখানে গিয়ে ভক্তের আর ফিরতে ইচ্ছা হয় না, যেস্থানে দ্বারপ্রান্তের ধূলিকণাও পবিত্র ব'লে মনে হয়; সাধ যায় সেইখানেই মাতালের মতো প'ড়ে থাকি !"

এইভাবে গজলগুলি বোঝবার চেষ্টা করলে হাফিজের প্রত্যেকটি রচনার অন্তর্নিহিত রহস্যের নির্গলিতার্থ অনুধাবন করা সহজ হবে।" (পৃ. ষোলো)

নরেন্দ্র দেবের অনুবাদের নমুনা হিসেবে প্রথম গজলটি এখানে তুলে দিচ্ছি :

শুন্‌চো সাকি, সুন্দরী লো ! দাওনা সুরার পাত্র ভরি,
দাওনা আমার হৃৎ-পিয়ালায় প্রেমের সরাব পূর্ণ করি।
ভেবেছিলাম, ভ্রান্তমতি
প্রেম তো পাওয়া সুলভ অতি ;
দেখছি এখন স্রোতের বাঁকে ঘূর্ণিপাকে ডুবছে তরী ॥

বয় মৃগমদ্-গন্ধ-মদির শান্ত ভোরের শীতল বায়ু ;
কুঞ্চিত তার অলকদামের বার্তা-মধুর বাড়ায় আয়ু।

সেই স্বরভির সোহাগ লুটি'
চিত্ত পাগল বেড়াই ছুটি
দুঃখ শোণিত বক্ষে ঝরে, দীর্ণ প্রাণের সকল স্নায়ু॥

মোর নমাজের আসনখানি
রঙীন করে দাওগো রানী
তোমার প্রেমের পীযূষধারা ঢেলে;
ভাণ্ডারী সে স্বধার যিনি,
আদেশ যদি করেন তিনি
পারবে কি তার চলতে কথা ঠেলে?

সকল কথাই তাঁহার জানা,
পথঘাটেরও নাই তো মানা;
বিশ্বরাজের রঙ্গনায়ক যিনি,
চালান নিজেই নাট্যশালা
কার পরে কার আসবে পালা
জানেন সেটাও তোমার চেয়েই তিনি॥

হাফিজের রোবাইয়াৎ-এরও বেশ কয়েকটি বাংলা অনুবাদ পাওয়া যায়। তার কিছু পরিচয় এখানে দেওয়া হল।

আলী আহমদ সংকলিত বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জী (বাংলা একাডেমী, ঢাকা; ১৭ অগ্রহায়ণ ১৩৯২, ৩ ডিসেম্বর ১৯৮৫) সূত্রে আমরা যেসব অনুবাদের সন্ধান পাই তার তালিকা:

১. অজয়কুমার ভট্টাচার্য এম. এ.—রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ (কবিতা) "Translation in verse by Ajaya kumar Bhattacharya, through the English version by L. Crammer (based on the prose translation by Sayyid abd-ul-Majid of 65 Persian Rubaiyyat by Hafiz."

প্রকাশক: বি. কে. ভট্টাচার্য এম. এ., বি. টি., কুমিল্লা। মুদ্রক: স্বশীলকুমার দে, জগৎ স্বহৃদ প্রেস, কুমিল্লা। প্রথম সংস্করণ: ১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩০ খ্রী. পৃ: ১০+৬৫। মূল্য—বার আনা। তথ্য নির্দেশ: (১) বেঙ্গল লাইব্রেরী

ক্যাটালগ, ১৯৩০ খ্রীঃ, ১ম ত্রৈমাসিক খতিয়ান। (২) ব্রিটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরী ক্যাটালগ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৪৮।

২. রোবাইয়াৎ-ই-হাফিজ (কবিতা) আজিজুল হাকিম অনূদিত।
প্রকাশক : আজিজুল হাকিম, ইস্টার্ণ বুক সেণ্টার, ৩০, কাজী আবদুর রউফ, ঢাকা। মুদ্রক : আর. কে. পাল। জিনাত প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ ১৯, রমাকান্ত নন্দী লেন, ঢাকা। প্রথম প্রকাশ : ১৮ই বৈশাখ, ১৩৬২ সন। অনুবাদ কাল, ১৩৪২ সন। পৃ. ২০। মূল্য : এক টাকা।

৩. রোবাইয়াৎ-ই-হাফিজ (কবিতা)

(ক) পারস্য কবি হাফিজের রুবাইয়াতের কাব্যানুবাদ। অনুবাদক— কান্তিচন্দ্র ঘোষ।

প্রকাশক : শরৎচন্দ্র মুখার্জী, বিচিত্রা নিকেতন, ২৭/১, ফ্লোরিয়াপুকুর স্ট্রীট, শ্যামবাজার, কলিকাতা। প্রথম সং : ১১ মার্চ, ১৯৩৩, পৃ. ১+৩৮। মূল্য -বার আনা। তথ্য নির্দেশ : বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ, ১৯৩৫ খ্রীঃ, ২য় ত্রৈমাসিক খতিয়ান।

(খ) হাফিজের রুবাইয়াতের কাব্যানুবাদ, অনুবাদক—কান্তিচন্দ্র ঘোষ। প্রকাশক : হরিপদ নাগ, এম. এস. সি., কমলা বুক ডিপো লিঃ, ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। প্রথম সং : ৯ জুলাই ১৯৩৭, পৃ. ১+৩৮; মূল্য—এক টাকা। তথ্য নির্দেশ : বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ, ১৯৩৭, ৩য় ত্রৈমাসিক খতিয়ান।

৪. রোবাইয়াৎ-ই-হাফেজ (কবিতা) অনুবাদক—সুধীরকুমার হাজরা

পারস্য কবি হাফেজের রুবাইয়াতের কাব্যানুবাদ। সচিত্র। প্রকাশক : নির্মলকুমার মিত্র, সুজাতা স্মৃতি মন্দির, ৬।১৪, একডালিয়া রোড, কলিকাতা। প্রথম সং : ১৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৭, পৃ. ২+৫৫। মূল্য—আট আনা। তথ্য-নির্দেশ : বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ, ১৯৩৭ খ্রীঃ ১ম ত্রৈমাসিক খতিয়ান।

এই অনুবাদগুলির মধ্যে শ্রীশরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষের অনুবাদটি আমাদের দেখার সুযোগ হয়েছে। প্রথম সংস্করণের এই বইয়ের প্রিণ্টার শ্রীসুধীরচন্দ্র কায়েত, ইউ. রায় এণ্ড সন্স প্রেস, ১১৭/১ বহু-বাজার স্ট্রীট, কলিকাতা। এই অনুবাদের অন্তর্গত মোট রোবাইয়ের সংখ্যা ৭৫। বইটিতে কোনো গদ্য ভূমিকা নেই। একটি উৎসর্গ কবিতা আছে।

মূল রোবাইয়ের অনুবাদের নমুনা হিসেবে প্রথম রোবাইটি এখানে

উদ্ধার করছি :

"ভিড়ের মাঝে দেখছি শুধু আননখানি তব,
ওই চরণের চিহ্ন-আঁকা পথটি চিনে লব ;
পাপড়ি তো কেউ দেয়নি রেখে তোমার পথে কভু—
তোমায় ঘিরে ফিরছে কেন গন্ধটুকু তবু !"

নজরুল ইসলামের রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ-এর অনুবাদও অজয়কুমার ভট্টাচার্যের অনুবাদের সমসাময়িক। বইটির প্রকাশক—শ্রীকালীকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী, শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী এণ্ড সন্স, ২১, নন্দকুমার চৌধুরী লেন, কলিকাতা। প্রিণ্টার—শ্রী মনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, কালিকা প্রেস, ২১, নন্দকুমার চৌধুরী লেন, কলিকাতা। দাম—দুই টাকা। বইটি উৎসর্গ করা হয়েছে নজরুল ইসলামের মৃত শিশুপুত্র বুলবুল-এর স্মৃতির উদ্দেশে। উৎসর্গ পত্রে কবি লিখছেন :

"তোমার চার বছরের কচি গলায় যে স্বর শিখে গেলে, তা ইরাণের বুল্‌বুলিকেও বিস্ময়ান্বিত ক'রে তুল্‌বে। শিরাজি-বুল্‌বুল্‌-কবি হাফিজের কথাতেই তোমাকে স্মরণ করি,—

সোনার তাবিজ রূপার সেলেট
মানাতনা বুকে রে যার,
পাথরচাপা দিল বিধি
হায়, কবরের শিয়রে তার !"

নজরুলের অনুবাদের সঙ্গে একটি গদ্য ভূমিকা সংবলিত আছে। হাফিজের কবিতার আস্বাদন এবং সে বিষয়ে নজরুলের দৃষ্টিভঙ্গি ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের দৃষ্টিভঙ্গিকে মিলিয়ে পড়বার সুবিধা হবে বলে নজরুলের ভূমিকাটি এখানে তুলে দিলাম :

মুখবন্ধ

আমি তখন স্কুল পালিয়ে যুদ্ধে গেছি। সে আজ ইংরিজি ১৯১৭ সালের কথা। সেইখানে প্রথম আমার হাফিজের সাথে পরিচয় হয়।

আমাদের বাঙালী পল্টনে একজন পাঞ্জাবী মৌলবী সাহেব থাকতেন। একদিন তিনি দীওয়ান-ই-হাফিজ থেকে কতকগুলি কবিতা আবৃত্তি ক'রে শোনান। শুনে আমি এমনি মুগ্ধ হয়ে যাই, যে, সেইদিন থেকেই তাঁর কাছে ফার্সি ভাষা শিখ্‌তে আরম্ভ করি।

তাঁরই কাছে ক্রমে ফার্সি কবিদের প্রায় সমস্ত বিখ্যাত কাব্যই প'ড়ে ফেলি।

তখন থেকেই আমার হাফিজের "দীওয়ান্" অনুবাদের ইচ্ছা হয়। কিন্তু তখনো কবিতা লিখ্‌বার মত যথেষ্ট সাহস সঞ্চয় ক'রে উঠ্‌তে পারিনি। এর বৎসর কয়েক পরে হাফিজের দীওয়ান্ অনুবাদ কর্‌তে আরম্ভ করি। অবশ্য, তাঁর রুবাইয়াৎ নয়—গজল। বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় তা প্রকাশিতও হয়েছিল। ত্রিশ পঁয়ত্রিশটী গজল অনুবাদের পর আর আমার ধৈর্য্যে কুলোলনা, এবং ঐখানেই ওর ইতি হয়ে গেল।

তারপর এস, সি, চক্রবর্ত্তী এণ্ড সন্সের স্বত্বাধিকারী মহাশয়ের জোর তাগিদে ওর অনুবাদ শেষ করি।

যেদিন অনুবাদ শেষ হ'ল, সেদিন আমার খোকা বুল্‌বুল্ চ'লে গেছে!

আমার জীবনের যে ছিল প্রিয়তম, যা ছিল শ্রেয়তম তারই নজ্‌রানা দিয়ে শিরাজের বুল্‌বুল্ কবিকে বাঙ্‌লায় আমন্ত্রণ ক'রে আন্‌লাম।

বাঙ্‌লার শাসনকর্ত্তা গিয়াসুদ্দিনের আমন্ত্রণকে ইরানের কবি-সম্রাট্ হাফিজ উপেক্ষা করেছিলেন। আমার আহ্বান উপেক্ষিত হয়নি। যে পথ দিয়ে আমার পুত্রের "জানাজা" (শব-যান) চ'লে গেল, সেই পথ দিয়ে আমার বন্ধু, আমার প্রিয়তম ইরানী কবি আমার দ্বারে এলেন। আমার চোখের জলে তাঁর চরণ অভিষিক্ত হ'ল!

অন্যত্র হাফিজের সংক্ষিপ্ত জীবনী দিলাম। যদি সময় পাই, এবং পরিপূর্ণ দীওয়ান-ই-হাফিজ অনুবাদ কর্‌তে পারি, তখন হাফিজের এবং তাঁর কাব্যের পরিপূর্ণ পরিচয় দিবার চেষ্টা কর্‌ব!

সত্যকার হাফিজকে চিন্‌তে হ'লে তাঁর গজল-গান—প্রায় পঞ্চশতাধিক পড়্‌তে হয়। তাঁর রুবাইয়াৎ বা চতুষ্পদী কবিতাগুলি প'ড়ে মনে হয়, এ যেন তাঁর অবসর সময় কাটানোর জন্যই লেখা। অবশ্য এতেও তাঁর সেই দর্শন, সেই প্রেম, সেই শারাব সাকী তেমনি ভাবেই জড়িয়ে আছে।

এ যেন তাঁর অতল সমুদ্রের বুদ্বুদ-কণা। তবে এ ক্ষুদ্র বিম্ব হলেও এতে সারা আকাশের গ্রহ তারার প্রতিবিম্ব প'ড়ে একে রামধনুর কণার মত রাঙিয়ে তুলেছে। হয়ত ছোট বলেই এ এত সুন্দর।

আমি অরিজিন্যাল্ (মূল) ফার্সি হ'তেই এর অনুবাদ করেছি। আমার কাছে যে কয়টী ফার্সি দীওয়ান-ই-হাফিজ আছে, তার প্রায় সব কয়টীতেই পঁচাত্তরটী রুবাইয়াৎ দেখ্‌তে পাই। অথচ ফার্সি সাহিত্যের বিশ্ববিখ্যাত সমালোচক ব্রাউন

সাহেব তাঁহার History of Persian Literature-এ এবং মৌলানা শিব্‌লি নোমানী তাঁহার "শেয়রুল্‌ আজমে" মাত্র উনসত্তরটী রুবাইয়াতের উল্লেখ করেছেন ; এবং এই দুইজনই, ফার্সি কবি ও কাব্য সম্বন্ধে Authority—বিশেষজ্ঞ।

আমার নিজেরও মনে হয়, ওঁদের ধারণাই ঠিক ! আমি হাফিজের মাত্র দুটী রুবাইয়াৎ বাদ দিয়েছি—যদিও আরো তিন চারটী বাদ দেওয়া উচিত ছিল। যে দুটী রুবাইয়াৎ বাদ দিয়েছি, তার অনুবাদ নিম্নে দেওয়া হল। সমস্ত রুবাইয়াতের আসল সুরের সঙ্গে অন্ততঃ এই দুইটী রুবাইয়াতের সুরের কোনো মিল নেই। বেসুরো ঠেক্‌বে ব'লে আমি এ দুটীর অনুবাদ মুখবন্ধেই দিলাম।

১। জমায় না ভিড় অসৎ এসে
যেন গো সৎলোকের দলে।
পশু এবং দানব যত
যায় যেন গো বনে চ'লে।
আপন উপার্জ্জনের ঘটায়
হয় না যেন মুগ্ধ কেহ,
আপন জ্ঞানের গর্ব্ব যেন
করে না কেউ কোনো ছলে।

২। কালের মাতা দুনিয়া হ'তে,
পুত্র, হৃদয় ফিরিয়ে নে তোর !
যুক্ত ক'রে দেরে উহার
স্বামীর সাথে বিচ্ছেদ ওর।
হৃদয় রে, তুই হাফিজ্‌ সম
হ'স যদি ওর গন্ধ-লোভী,
তুইও হবি কথায় কথায়
দোষগ্রাহী, অম্‌নি কঠোর !

রুবাইয়াতের আগাগোড়া শারাব, সাকী, হাসি, আনন্দ, বিরহ ও অশ্রুর মধ্য এই উপদেশের বদ-সুর কানে রীতিমত বেখাপ্‌পা ঠেকে।

তাহা ছাড়া কালের বা সময়ের মাতাই বা কে, পিতাই বা কে, কিছু বুঝিতে পারা যায় না।

আমার অনুবাদের আটত্রিশ নম্বর রুবাই-ও প্রক্ষিপ্ত ব'লে মনে হয়। কেননা

প্রথম দুই লাইনের সাথে শেষের দুই লাইনের কোন মিল নেই, এবং ওর কোনো মানেও হয় না। দিনের ঔরসে রাত্রি গর্ভবতী হবে, এ আর যিনি লিখুন—হাফিজ লিখ্‌তে পারেন না।

এইজন্যই ব্রাউন সাহেব বলেছেন, ফার্সি কবিতার সব চেয়ে শুদ্ধ সংস্করণ হচ্ছে—তুরস্কে প্রকাশিত গ্রন্থগুলি। তাঁর মতে—তুর্কীরা নাকি হিন্দুস্থানী বা ইরানীর মত ভাবপ্রবণ নয়। কাজেই তারা নিজেদের দু দশ লাইন রচনা অন্য বড় কবিদের রচনার সাথে জু'ড়ে দিতে সাহস করেনি বা পারেনি। অথচ, নাকি ভারতের ও ইরানীর সংগ্রাহকেরা ঐরূপ দুঃসাহসের কাজ কর্‌তে পশ্চাৎপদ নন এবং কাজও তা করেছেন।

এ অনুযোগ হয়ত সত্যই। কেননা আমি দেখেছি, ফার্সি কাব্যের ('ভারতবর্ষে প্রকাশিত) বিভিন্ন সংস্করণের কবিতার বিভিন্ন রূপ। লাইন, কবিতা উল্টোপাল্টা ত আছেই, তার ওপর কোনটাতে সংখ্যায় বেশী কোনোটায় কম কবিতা। অথচ তুরস্ক-সংস্করণ বই সংগ্রহ করাও আমাদের পক্ষে একরূপ অসাধ্য।···

হাফিজ্‌কে আমরা—কাব্য-রস-পিপাসুর দল—কবি বলেই সম্মান করি, কবি-রূপেই দেখি। তিনি হয়ত বা সুফী দরবেশও ছিলেন। তাঁর কবিতাতেও সে আভাস পাওয়া যায় সত্য। শুনেছি, আমাদের দেশেও, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশব সেন প্রভৃতি হাফিজের কবিতা উপাসনা-মন্দিরে আবৃত্তি করতেন। তবু তাঁর কবিতা শুধু কবিতাই। তাঁর দর্শন আর ওমরখাইয়ামের দর্শন প্রায় এক।

এঁরা সকলেই আনন্দ-বিলাসী। ভোগের আনন্দকেই এঁরা এই জীবনের চরম আনন্দ বলে স্বীকার করেছেন। ইরানের অধিকাংশ কবিই যে শরাব সাকী নিয়ে দিন কাটাতেন, এত মিথ্যা নয়।

তবে, এও মিথ্যা নয় যে, মদিরাকে এঁরা জীবনে না হোক কাব্যে প্রেমের আনন্দের প্রতীকরূপেই গ্রহণ করেছিলেন।

হাফিজ এক জায়গায় বলছেন—'কাল আমার গুরু মসজিদ ছেড়ে পানশালার দিকে যাচ্ছেন দেখলাম, ওগো তোমরা বল—আমি এখন কোন্ পথ গ্রহণ করি।" অর্থাৎ তিনি বল্‌তে চান—পানশালা প্রেমোন্মত্তের মন্দির; সেইখানেই সত্যকে পাওয়া যায়।

মুসলমান-শাস্ত্রে শারাব বা মদিরাপান হারাম অর্থাৎ নিষিদ্ধ। কাজেই এঁদের গোঁড়ার দল আজও কাফের ব'লে অভিহিত করে—সে যুগের কথা না-ই বল্‌লাম।

ইরানী কবিদের অধিকাংশই তথাকথিত নাস্তিকরূপে আখ্যাত হলেও, এঁরা

ঠিক নাস্তিক ছিলেন না। এঁরা খোদাকে বিশ্বাস করতেন। শুধু স্বর্গ, নরক, রোজ্‌ চিয়ামত্‌ (শেষ বিচারের দিন) প্রভৃতি বিশ্বাস করতেন না। কাজেই শাস্ত্রাচারীর দল এঁদের উপর এত খাপ্পা ছিলেন। এঁরা সর্ব্বদা "রিন্‌দান্‌" বা স্বাধীনচিন্তাকারী, ব্যভিচারী ব'লে সম্বোধন করতেন। এর জন্য এঁদের প্রত্যেককেই জীবনে বহু দুর্ভোগ সহ্য করতে হয়েছিল।

হাফিজের সমস্ত কাব্যের একটি সুর—

"কায় বেখরব, আজ ফস্‌লে গুল্‌ ও তরকে শারাব।"

"ওরে মূঢ়! এমন ফুলের ফসলের দিন—আর তুই কিনা শারাব ত্যাগ ক'রে ব'সে আছিস!…"

* * * *

আমাকে যাঁরা এই রুবাইয়াৎ অনুবাদে নানারূপে সাহায্য করেছেন, তাঁদের মধ্যে আমার শ্রেয়তম আত্মীয়াধিক বন্ধু গীত-রসিক শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার অন্যতম। তাঁরই অনুরোধে ও উপদেশে এর বহু অসুন্দর লাইন সুন্দরতর হয়ে উঠেছে। যদি এ অনুবাদে কোনো ত্রুটী না থাকে, তবে তার সকল প্রশংসা তাঁরই।

কলিকাতা
১লা আষাঢ়,
১৩৩৭

বিনয়াবনত
নজরুল ইস্‌লাম

নমুনা হিসেবে প্রথম রোবাইয়ের অনুবাদ এখানে উদ্ধার করা হল :

"তোমার ছবির ধ্যানে, প্রিয়,
দৃষ্টি আমার পলক-হারা।
তোমার ঘরে যাওয়ার যে-পথ
পা চলে না সে-পথ ছাড়া।
হায়, দুনিয়ার সবার চোখে
নিদ্রা নামে দিব্য সুখে,
আমার চোখেই নেই কি গো ঘুম,
দগ্ধ হ'ল নয়ন-তারা॥"

বাংলায় হাফেজ চর্চার প্রসঙ্গে শ্রীশগোবিন্দ সেন অনূদিত "হাফেজ বচন" ও বৈদ্যনাথ রায়ের "হাফেজ জীবনী ও কবিতা"-রও উল্লেখ করা চলে। প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুরের "হৈফাজিক" (শনিবারের চিঠি ২২শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৫৬) নামের কবিতাগুচ্ছও প্রসঙ্গত স্মরণীয়।

২ বাঘ ডেকেছিল

সুভাষ মুখোপাধ্যায়, স্বরলিপি, কলকাতা-৯। প্রথম প্রকাশ : ১৯৮৫। প্রকাশক : রণবীর সরকার, স্বরলিপি, ২৩এ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলকাতা-৯। মুদ্রক : লক্ষ্মীনারায়ণ প্রেস, ৬ শিবু বিশ্বাস লেন, কলকাতা-৬। প্রচ্ছদ : শ্যামল দত্তরায়। দাম : দশ টাকা। উৎসর্গ : প্রায় কৈশোরের বন্ধু সন্তোষকুমার ঘোষকে। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৪৫। ২৭টি কবিতার সংকলন :

১. বাঘ ডেকেছিল
২. কেন যে
৩. সেও ঠিক এমনি বৃষ্টি
৪. ছাড়াছাড়ি
৫. পায়:ভারী
৬. একাকারে
৭. দু ছত্র
৮. জরুরি ডাকে
৯. এককাঠি দুকাঠি
১০. আরে ছো
১১. মনে পড়ে নি
১২. দূরান্বয়
১৩. ছড়াই
১৪. তা হয় না
১৫. তখনও
১৬. তার কাছে
১৭. কখনও কখনও
১৮. বুড়ি ছুঁয়ে
১৯. পালানো
২০. খালি পুতুল
২১. একটু আধটু
২২. অর্থাৎ
২৩. সেকেলে

২৪. ও আমার বঙ্গ

২৫. মুইন বিসেস্থ

২৬. প্রকৃতি-পুরুষ

২৭. টানা ভগতের প্রার্থনা

১৯৮৩-র মার্চে প্রকাশিত 'চইচই-চইচই'-এর পরে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মৌলিক কবিতার সংকলন এই 'বাঘ ডেকেছিল'। এর মাঝখানে প্রকাশিত হয়েছে হাফিজের অনুবাদ কবিতার সংকলন। আগেও যেমন লক্ষ করা গেছে, মূলত মৌলিক কবিতার সংকলন হলেও 'বাঘ ডেকেছিল'-র মধ্যেও অনুবাদ কবিতা স্থান পেয়েছে। "তা হয় না" ফয়েজ আহ্‌মদ ফয়েজের কবিতার অনুবাদ। "সেকেলে" শিরোনামে আছে যথাক্রমে অজ্ঞাতনামা, সদুক্তিকর্ণামৃত, রাজশেখর ও গোবর্ধনাচার্যের তিনটি কবিতার অনুবাদ।

জদীশ ভট্টাচার্য সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের এই পর্বের কবিতার কথা বলতে গিয়ে লিখেছেন :

"আমি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সাম্প্রতিক পদযাত্রার দিকে একটু দৃষ্টি নিবদ্ধ করব। কবির ৬১ থেকে ৭০ বছরের মধ্যে চারখানি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৮১-তে 'জল সইতে', ১৯৮৩-তে 'চইচই-চইচই', ১৯৮৫-তে 'বাঘ ডেকেছিল' এবং ১৯৮৯-এ 'যারে কাগজের নৌকো'। ১৯৮৯-এ তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতার যে ষষ্ঠ পরিমার্জিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে তার শেষ কবিতা হল 'বাঘ ডেকেছিল' গ্রন্থের "টানা ভগতের গান"। টানা ভগত একটি আদিবাসী গোষ্ঠী। কবির এই আদিবাসীচেতনা সুভাষ কাব্য-রসিকের নতুন প্রাপ্তি। অবহেলিত, সভ্যতার আলো থেকে নির্বাসিত এই সব আদিবাসী গোষ্ঠীর মধ্যেই সুভাষ নতুন আলোর সন্ধান পেয়েছেন। "টানা ভগতের গান" কবিতায় বলছেন :

মাটির পেট থেকে সবকথা
আজও বার করা যায়নি
আরও কত পাথরের হাতিয়ার
হাড়ের অলংকার আর মাটির তৈজস
মুখের আরও কত কথা
খোদাই করা আরও কত অক্ষর
অন্ধকার থেকে আলোয় আসার প্রতীক্ষায়।

অর্থাৎ আদিবাসী মানবগোষ্ঠীর মধ্যেই আছে অঙ্গারের মধ্যে বেঁধে রাখা

মহাদ্যুতিময় শক্তি। সভ্যতার প্রত্যন্তবাসী এই শক্তিচেতনায় প্রবুদ্ধ হয়েই কবি বলছেন :

হেঁকে আজ বলুক সবাই
মানুষ আমার ভাই!
বন্ধ কর ভ্রাতৃযুদ্ধ,
যেন কেউ মানুষ মারে না—
ঘরে না, বাইরে না।

*　*　*

"সবার জন্যে শুভেচ্ছা-সম্প্রীতি জাগাতে হলে মধ্যযুগীয় বৈষ্ণব কবির সুভাষিত—সবার উপরে মানুষ সত্য—অচল হয়ে গেছে। মানুষ নয়, চাই মনুষ্যত্ব। সুভাষ তাই বলেন :

সবার উপর আজ সত্য
মনুষ্যত্ব।"

[সুভাষ মুখোপাধ্যায় : কবি ও কর্মী, সপ্তাহ. শারদীয়া সংখ্যা ১৩৯৯]

৩ চর্যাপদ

অনুবাদ : সুভাষ মুখোপাধ্যায়। স্বরলিপি। প্রথম প্রকাশ : মে ১৯৮৬। প্রকাশক : রণবীর সরকার, স্বরলিপি, ২৩এ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলকাতা-৯। প্রচ্ছদ : শ্রীসব্যসাচী বর্দ্ধন। মুদ্রক : নবজীবন প্রেস, ৬৬ গ্রে স্ট্রীট, কলকাতা-৬। মূল্য : কুড়ি টাকা। উৎসর্গ : স্নেহের জয়শ্রী-নুবুকে। পৃষ্ঠাসংখ্যা ৯৬। চর্যাগীতির মূল পদ সংবলিত।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় ভূমিকাতে লিখেছেন, "সুমঙ্গল রাণার 'চর্যাগীতি পঞ্চাশিকা' হঠাৎ হাতে এসে গিয়েছিল। কিন্তু সেই বই থেকেই আমি রসদ পেয়েছি সবচেয়ে বেশি।" তিনি এও জানিয়েছেন যে, "কিন্তু অনুবাদের ক্ষেত্রে সর্বত্র শুধুই একজনকে আমি অনুসরণ করিনি। যেখানে যাঁকে মনে ধরেছে তাঁর সঙ্গ নিয়েছি।"

শুধু অনুবাদ. নয়, মূল পাঠগ্রহণের বেলাতেও মনে হয় তিনি কোনো একজনকে অনুসরণ করেননি। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের গৃহীত পাঠের সঙ্গে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (তৃতীয় সংস্করণ, চতুর্থ মুদ্রণ, ভাদ্র ১৩৮৮)-র পাঠের ভিন্নতা নিচে দেখানো হল :

চর্যা সংখ্যা	পংক্তি সংখ্যা	স্থ. মু.	হ. শা.
১	৮	লাহু	লেহু
	৯	সাণে	ঝাণে
	১০	পাণ্ডি	পিণ্ডি
২	২	তেন্তলী	তেন্তলি
	৪	চৌরি	চৌরে
	১০	সমাইড়	সমীইড়
৩	৩	সান্ধে	সান্ধ
	৯	ঘড়ুলী	স ডুলী
	১০	ভণন্তি	ভণতি
৪	২	ঘাণ্ট	ঘাণ্টি
	৬	সমাঅ	সগাঅ
৫	৮	নিয়ড়ী	নিয়ড্ডী
৬	১	আচ্ছহু	অচ্ছহু
	৫	পানী	পাণী
	৬	হরিণীর	হরিণির
	৬	জানী	জাণী
	৮	হোহু	হোহ
৯	২	বান্ধন	বান্ধণ
	৯	দিসেঁ	দিসে
১১	৪	একাকারেঁ	একাকারে
১২	২	জিতেল	তিচতল
	৪	জিনউর	তিনউর
	৭	পরিণিবিতা	পরি'নিবিভা (sic.)
১৩	১	অঠকমারী	অঠকুমারী
	৮	জইসো	জইসোঁ
	৯	চিঅ কন্নহার	চিঅকণ্ণহার
১৪	১	মাঝেঁ	মাঝে
	২	বুড়িলি	বুড়িলী
	২	যোইআ	পোইআ

চর্যা সংখ্যা—পংক্তি সংখ্যা		সু. মু.	হ. শা.
	৫	পড়ন্তে	পড়ন্তেঁ
	৫	বান্ধি	বান্ধী
	৭	চান্দ	চন্দ
১৫	২	উজ্‌বাটে	উজুবাটে
	৩	উজ্‌বাট	উজুবাট
	৪	ভূলহ	ভুলহ
	৮	উজ্‌বাট	উজুবাট
১৬	৮	পঞ্চবিসঅনায়ক	পঞ্চবিষয়নায়ক
	৮	কোনী	কোনি
	৮	দেখি	দেখী
১৮	৮	মেলঈ	মেলই
১৯	১০	সহজ	সহঅ
২০	১	খমণভতারে	খমণভতারি
	৯	ভণাতি	ভণথি
	১০	বুঝএঁ	বুঝই
২১	১	অন্ধারী	কন্ধারী
	১	মুসাঅ	মুসঅ
	৪	জেঁণ	জেণ
২১	৯	তব	তাব
	১১	মুসাএর	মুষাএর
	১২	তবেঁ	ভবেঁ
২২	৩	জানহুঁ	জাণহুঁ
২৩	২	নলিনীবন	নলিণীবন
	২	একুমনা	একুমণা
২৬	৫	সুনে	সুণে
	৬	শূণ	পুন
	৭	বাট	বট
২৭	৫	নিবাণেঁ	নিবাণে
২৮	৪	নামে	ণামে

চর্যা সংখ্যা	পংক্তি সংখ্যা	সু. মু.	হ. শা.
	৭	সেষ্কি	সেজ্জি
	৮	ভুজঙ্গঁ	ভুজঙ্গ
	৯	হিআ তাঁরোলা	হিঅ তাঁরোলা
	১২	পরমণিবাণেঁ	পরমণীবাণেঁ
	১৪	পইসন্তে	সইসন্তো
৩০	২	দলিআ	দলিয়া
	৫	সুনন্তে	সুনন্তে (sic.)
	৭	বিশুদ্ধেঁ	বিশুদ্ধে
	৭	বুজ্‌ঝিঅ	বুঝ্‌ঝিঅ
৩১	৪	নিরালে	নিরাসে
	৫	চান্দেরে	চান্দরে
৩৪	৬	দুলখ	দুনখ
	৮	স্বপরাপর	স্বরাপর
	১০	ভুঅণেঁ	ভূঅণে
৩৫	৫ ও ৬	পেখমি দহ দিহ সর্ব্বই শূন। চিঅ বিহুন্নে পাপ ন পুন্ন ॥	নেই
৩৬	২	মোহভাণ্ডার	মোহভণ্ডার
৩৭	৫	তইসন	তইছন
৩৮	৬	সহজে	সহজেঁ
৪০	৪	সমাঅ	সমায়
	১০	কালেঁ	কালে
৪৪	১	মিলিঅ	মিলিআ
	৩	ঋণ	খণ
	৭	জথাঁ	জথা
	৮	মাঝঁ	মাসং
	১০	তথতা নাদেঁ	তথনানাদেঁ
৪৫	৩	কুঠারেঁ	কুঠারে
৪৭	১	মাঝেঁ	মাঝে
	১	মিথলী	মিঅলী

চর্যা সংখ্যা	পংক্তি সংখ্যা	সু. মু.	হ. শা.
	১০	নালেঁ	নালে
৪৯	১	খালেঁ	খালে
	২	দঙ্গালে দেশ	বঙ্গালে ক্লেশ
	৩	ভুসুকু	ভুসু
	৫	পঞ্চপাটণ	পঞ্চধাটন
৫০	৫	সমতুলা	মমতুলা
	১০	অণুদিন	অণুদিণ
	১১	বাসেঁ	বাসে

উপরে নির্দেশিত পাঠান্তর ছাড়াও শব্দবিন্যাসেরও তফাত আছে। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের গৃহীত পাঠে আলাদা শব্দ, হরপ্রসাদে একই সঙ্গে লিখিত এক শব্দের রূপ, এরকম উদাহরণ অনেক আছে। হরপ্রসাদে আলাদা শব্দ হিসেবে লিখিত, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের গৃহীত পাঠে এক শব্দ এরকম উদাহরণও আছে। যেমন, ১৫ নং পদের শেষ পংক্তিতে হরপ্রসাদে পাই 'খড় তড়ি'।

১৪-সংখ্যক চর্যার শেষ পংক্তিতে 'বাহবা ণ র্জা (ন) ই'-এর জা-র রেফ চিহ্ন সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের অনুবাদের প্রথম সংস্করণে থাকলেও বর্তমান মুদ্রণে বাদ দেওয়া হয়েছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সুকুমার সেন বা সুমঙ্গল রাণা-ধৃত পাঠে রেফ-চিহ্ন নেই।

প্রসঙ্গত, 'চর্যাপদ থেকে' এই শিরোনামে পাঁচটি পদ সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের অনুবাদে 'ছেলে গেছে বনে' (১৯৭২) কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই পাঁচটি চর্যাগীতি যথাক্রমে ১, ৫, ৬, ২ ও ৭-সংখ্যক চর্যাগীতির অনুবাদ। এই অনুবাদগুলি বিশ্ববাণী প্রকাশনীর 'সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাব্যসংগ্রহ' দ্বিতীয় খণ্ডের অন্তর্গত 'ছেলে গেছে বনে' অংশের অন্তর্ভুক্ত। 'কবিতা সংগ্রহ' দ্বিতীয় খণ্ডের মধ্যেও একইভাবে 'ছেলে গেছে বনে' অংশের অন্তর্ভুক্ত আছে এই পাঁচটি অনুবাদ। বর্তমান 'চর্যাপদ'-এর অন্তর্গত এই পাঁচটি পদের অনুবাদ আগের অনুবাদ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। দুটি অর্থান্তর বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ২-সংখ্যক চর্যাগীতির অনুবাদে পূর্বপাঠে পাই :

"শোন্ ওরে বউ, উঠোনেই ঘরদোর।
কর্ণাভরণ মাঝরাতে নিল চোর।
শ্বশুর ঘুমোয়, বধূ একা জেগে আছে—"

আর বর্তমান পাঠে আছে :

"শোন্ বউ, তোর উঠোনেই ঘরদোর
মাঝরাতে কানি নিয়ে গেল কোন্ চোর।
শাশুড়ি ঘুমোয়, বধূ ঠায় জেগে আছে"

আবার ৬-সংখ্যক চর্যাগীতির অনুবাদে পূর্বপাঠে পাই :

"হরিণী বলেছে, 'ও হরিণ, শোন্—
দূরে চলে যা রে, ছেড়ে এই বন।'"

আর বর্তমান পাঠে আছে :

"হরিণী বলছে : ও হরিণ, শোন্—
ভুল ক'রে ছেড়ে যাস্‌নে এ বন।"

৪ অমরুশতক

অনুবাদ : সুভাষ মুখোপাধ্যায়। প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড। প্রথম প্রকাশ : বইমেলা, জানুয়ারি ১৯৮৮। প্রকাশক : প্রিয়ব্রত দেব, প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৭ জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা-১৩। মুদ্রক : প্রতিক্ষণ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড, ১২বি, বেলেঘাটা রোড, কলকাতা-১৫। প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ : রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়। মূল্য : পঁচিশ টাকা। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫৬। ২৬·৫ সে. মি. × ১৭·৫ সে. মি.।

বাংলায় অমরুশতকের অনুবাদ খুব বেশি নেই। 'রূপান্তর'-এর অন্তর্গত রবীন্দ্রনাথ-কৃত এই একটি শ্লোকের কাব্যানুবাদ পাওয়া যায় :

"আসে তো আসুক রাতি, আসুক বা দিবা,
যায় যদি যাক নিরবধি।
তাহাদের যাতায়াতে আসে যায় কিবা
প্রিয় মোর নাহি আসে যদি।"

পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাবলীর জন্মশতবার্ষিক সংস্করণের পঞ্চদশ খণ্ডে বর্তমান শ্লোকটি সম্পর্কে এই মন্তব্য পাওয়া যায় : "শ্রী ডাক্তর যোহন হেবর্লিন কর্তৃক সমাহৃত ও মুদ্রাঙ্কিত কাব্যসংগ্রহ (১৮৪৭, পরবর্তী পরিবর্ধিত সংস্করণ ১৮৬১-৬২ খৃষ্টাব্দ) গ্রন্থে দেখা যায়।"

বাংলায় অমরুশতকের আর এক অনুবাদক বামাপদ বসু। বইটির প্রকাশ-বিবরণ : প্রকাশক : শ্রী বামাপদ বসু। ৪৪ বিদ্যাসাগর স্ট্রীট, কলিকাতা-৯। মুদ্রক :

শ্রী প্রশান্তকুমার মিত্র, ভিনাস প্রিন্টিং ওআর্কস্, ৫২-৭ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য : ছয় টাকা। দোলপূর্ণিমা, ১৩৭২।

অনুবাদকের নিবেদন অংশে আমরা পাই :

"একদিন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' পড়ার পর অলস মনে তাঁর উদ্ধৃত একটি সংস্কৃত শ্লোকের বাংলা অনুবাদ করবার চেষ্টা করি। কিন্তু দেখলুম সেটি একটি পূর্ণ শ্লোক নয়—শ্লোকার্ধ মাত্র। এটি কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে খুঁজতে গিয়ে পেলুম সেই বহুজন-নিন্দিত আর বহুতর-জন বন্দিত শতশ্লোক সমষ্টি অমরুশতক কোষ-কাব্যখানি।"

বামাপদ বসু তাঁর নিবেদনে রবীন্দ্রনাথকে আরো স্মরণ করেছেন। "আধুনিক কালে রবীন্দ্রনাথকে এর 'মৃদঙ্গাঘাতগম্ভীর শ্লোকগুলির মধ্যে যে ঘুরাইয়াছে' তা তাঁর জীবনস্মৃতির পাতায় পাই।"... " 'সম্ভাষণ'-এর নায়িকা বর্ণনায় অমরুশতকের স্রগ্ধরা, শিখরিণীর ছন্দহিল্লোল তাঁর মনকে উদ্বেলিত করেছিল।"

বামাপদ বসুর অনুবাদ-নমুনা :

লজ্জাশীলার কৌশল-কলা

জায়াপতি দোঁহে কাটাইল রাতি
মধু প্রেম-আলাপনে।
সে সকল শোনে পোষা শুকপাখি
পিঞ্জরে গৃহকোণে।
প্রভাতে উঠিয়া গুরুজন সনে
বধূ করে গৃহকাজ
শুক আওড়ায় মিলন ভাষণ—
ছিছি—ছিছি একী লাজ!
পদ্মরাগ-মণি দোলে অলংকার
বধূটির দুই কানে
খুলিয়া তাহাই করেতে লইয়া
ধরিল পাখির পানে।
কথা বন্ধ ক'রে তখনি আদরে
শুক-যে লইয়া তায়

ডালিমের দানা ভ্রমেতে ভাবিয়া
ঠোঁট দিয়া ঠোকরায়। ১৪

সুশীল রায়ের অনুবাদে অমরুশতক তাঁর সম্পাদিত ধ্রুপদী পত্রিকায় বৈশাখ ১৩৭৪ (বর্ষ ৮ সংখ্যা ১) থেকে চৈত্র ১৩৭৪ (বর্ষ ৮ সংখ্যা ১২) পর্যন্ত ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়েছিল। অনুবাদটি যতদূর জানি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি। একটি নমুনা উদ্ধৃত হল :

নিশীথে দম্পতি দোঁহে বলেছে যতেক কথা, গৃহের পালিত শুকপাখি
প্রভাতে তাবৎ কথা গুরুজন-সমক্ষেই একে-একে করে উচ্চারণ।
মুখবন্ধ-হেতু তার লজ্জাকুলা বধূ ত্রস্তে দাড়িম্বের দানার সদৃশ
পদ্মরাগ-মণি দেয় কর্ণভূষা থেকে খুলে পাখির বাচাল চঞ্চুপুটে।

সুশীল রায়ের অনুবাদ ক্রমে এই শ্লোকটির সংখ্যা অবশ্য ১৩।

নবপত্র প্রকাশন, ৮ পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯ থেকে প্রকাশিত সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার পুস্তকমালার অন্তর্গত অমরুশতকের একটি গদ্য অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে পুস্তকমালার তৃতীয় খণ্ডে। পুস্তকমালার প্রধান উপদেষ্টা গৌরীনাথ শাস্ত্রী, অমরুশতক গ্রন্থটির অনুবাদক শ্রী রবিশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। এই খণ্ডটির প্রথম প্রকাশ : ৩১ জুলাই, ১৯৭৮।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের অমরুশতক অনুবাদ প্রথম প্রকাশিত হয় প্রতিক্ষণ পত্রিকার ১৩৯৪-এর শারদীয় সংখ্যায়। এই কিস্তিতে ৫০টি অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল।

\+ \+ \+

হাফিজের কবিতা বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন সংস্কৃতির মানুষকে আকৃষ্ট করেছে। আলী সর্দার জাফরী লিখছেন : "দেশে দেশে যুগে যুগে কত ভিনদেশী কবিকে হাফিজ যে প্রেরণা যুগিয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই। একজন যেমন ভারতের কবীর (১৪৪০-১৫১৮), তেমনি আরেকজন জার্মানির গ্যয়টে (১৯শ শতাব্দী)।

কবীরের সময় সুর করে গাওয়া হত রুমী আর হাফিজের কবিতা। সমবেত গোষ্ঠীতে যোগ দিতেন ভক্তি সাধক ও সুফী সন্তেরা। এই ভাবেই কবীরের দোঁহা গানে মহৎ ফার্সী কবিদের ছাপ পড়ে।

১৮১২ সালে জার্মান ভাষায় হাফিজের তর্জমা বার হয়। গ্যয়টের বয়স তখন ৬৫। ইউরোপে তখন টালমাটাল অবস্থা এবং জার্মান জাতের অবক্ষয় দশা। এই সময় হাফিজ পড়ে গ্যয়টে এমন মুগ্ধ হন যে, ফার্সী কবিতার ঢঙে কবিতাও

লেখেন। সুফী মতবাদ তাঁকে টানে নি; গ্যয়টেকে অনুপ্রাণিত করেছিল হাফিজের বিশুদ্ধ গজল। তাঁর সমসাময়িক বিপ্লবী কবি হাইনেও ফার্সী কবিতার খুব অনুরাগী ছিলেন। এক জায়গায় তিনি নিজেকে যেন জার্মানিতে নির্বাসিত পারস্যের কোনো কবি বলে কল্পনা করে লিখেছিলেন, 'ও ফিরদৌসি, ও জামি, ও সাদি, দুঃখক্লেশে বন্দী তোমাদের ভাই শিরাজের গোলাপের জন্যে তিলে তিলে তনুক্ষয় করছে।'

গ্যয়টের এক জীবনীকার হাফিজ প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'গ্যয়টে শিরাজের সেই বুলবুলের গানে দেখেছিলেন তাঁর নিজেরই প্রতিফলন। কখনও কখনও তিনি অনুভব করতেন যেন তাঁর নিজের আত্মা প্রাচ্যভূমিতে হাফিজেরই দেহ ধারণ করে থেকেছে। সেই পার্থিব সুখ, সেই আধ্যাত্মিক পরমানন্দ, সেই সারল্য আর গভীরতা, সেই হার্দ্য ভাব আর উৎফুল্লতা, সেই বিশ্বজনীনতা, খোলামেলা মন আর চিরাচরিতের বন্ধন থেকে মুক্তি হাফিজের এই সব কিছুরই তিনি সমভাগী। হাফিজের সহজ সহজ কথায় ধরা পড়েছে বিশ্বের ব্যঞ্জনা। ঠিক একই ভাবে, গ্যয়টে তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তির ভেতর দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন জীবনের সব রহস্য আর সত্য! ওঁরা দুজনেই ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সকলের কাছ থেকেই পেয়েছেন শ্রদ্ধার্ঘ্য। সমকালীন বড় বড় রাজ্য বিজেতাদের সামনে দুজনেই নিজেদের মাথা উঁচু রেখেছিলেন (তিমুরের সামনে হাফিজ আর নেপোলিয়নের সামনে গ্যয়টে)। সে সময়কার সর্বাত্মক ধ্বংস আর লুণ্ঠনের দুঃখকষ্টের মধ্যেও দুজনেই অন্তরের প্রশান্তি বজায় রাখতে পেরেছিলেন। সেই সঙ্গে তাঁরা অকাতরে গেয়ে গেছেন নিজেদের গান।' "

[হাফিজের জীবন ও কবিতা, সপ্তাহ, শারদীয় সংখ্যা, ১৯৮৩]

১৯৯২-এর ৬ ডিসেম্বর ঘটে যাবার পরে অনেকেরই আবার মনে পড়ছে সাদী-হাফিজের কথা। সম্প্রতি প্রকাশিত অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের "ঈর্ষাপ্রবণ" নামে কবিতায় পাই :

"সাদী-র ছিল গুলিস্তান, শিল্প সরস্বতীকে নজরানা
দিতে হলেও সুফী কবির ডানা
ছেঁটে দেয়ার স্পর্ধা কারো ছিল না; নজরুল
যতোটা বিপ্লবী ছিলেন ততোটাই মঞ্জুল;
এবং যখন তুলসীদাস বারাণসীর ঘাটে
রামচরিত লিখছিলেন হিন্দুরা মাতেনি মৌলবাদে;

এবং হাফিজ যেই শুনলেন জার্মানির গ্যেয়টে স্বয়ং
তাঁর গজলের তর্জমায় মজে আছেন তাঁর যে কীরকম
দিব্যানন্দ ঘটেছিল—যদিও তিনি দীর্ঘকাল মৃত—
সে সব খবর সবাই রাখেন।
কিন্তু আমি হঠাৎ ঈশ্বরিত
হয়ে ওঠার দুঃসাহসে ত্বরান্বিত একখানি ত্রিপদী
লিখতে গিয়ে দেখেছি আজ হয়নি কোথাও যুদ্ধের বিরতি—
সাদী-র ছিল যোজনব্যাপী গুলবাগিচা, আমার তকদির :
বিবদমান বন্ধুদের গুলিগালাজ, জম্মু ও কাশ্মীর !

[দেশ, ২ জুলাই, ১৯৯৪]

+ + +

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার শৈলী, তাঁর আটপৌরে শব্দ ব্যবহার ও ছন্দের কুশলতা বিষয়ে কথাবার্তা চলে আসছে সেই পদাতিক-চিরকুটের দিন থেকেই। সাম্প্রতিকেও তার বিরাম নেই। ১৩৯৩-এ নারায়ণ চৌধুরী লিখছেন :

"বরং সেই তুলনায় সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বিমলচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ বামপন্থী কবিরা অনেক বেশী সুবোধ্য, প্রাঞ্জল, জনসাধারণের রুচি ও চাহিদায় সংলগ্ন সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'পদাতিক' কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলির শৈলী ছিমছাম, শব্দ-ব্যবহার প্রায়শঃ আটপৌরে ধ্বনির উদ্রেককারী হলেও যথাযথ অর্থের প্রকাশক, একহারা কবিতার ভাব। আঙ্গিকের প্রয়োগে যথেষ্ট মুন্সিয়ানা দেখা যায়। কিন্তু এত সব সদগুণ সত্ত্বেও সুভাষের কবিতা অগভীর, ওপর-ছোঁয়া, ভাসা-ভাসা।"

[রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি, চতুষ্কোণ, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৯৩]

অরুণকুমার সরকারের কবিতার ভাষা ও ছন্দ আলোচনার প্রসঙ্গে অশোক মিত্রের মন্তব্যে পাই :

এত বছর বাদে নতুন করে পুরোনো প্রতীতিতে স্থিত হই, অরুণকুমার সরকারের মতো কয়েকজনের আবির্ভাব না ঘটলে বাংলা কবিতার ভাষা অত চট করে প্রাত্যহিকতার পরিবেশের সঙ্গে অন্বিত হতে আরও ঢের সময় নিত।··· ভাষার তৎসম-তৎভবর নিবিড়তা থেকে কতটা দূরে সরে আসা সমীচীন, তা নিয়ে সেই অবস্থাতেও অঢেল দোটানা। ক্রিয়াপদের ব্যবহার

নিয়েও সমান সমস্যা।··· এমনধারা দ্বিরাচারের দৃষ্টান্ত, সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে না হয় ছেড়েই দিলাম, 'কবিতা'-গোষ্ঠীর সমীপবর্তী প্রত্যেকটি কবির সৃষ্টিকর্মে পর্যাপ্ত পরিমাণে বিদ্যমান। হয়তো সমর সেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়রা ব্যতিক্রম, কিংবা তাই বা বলি কী করে, যাঁদের কাছে পৌঁছুতে চাইছেন, তাঁদের কাছে যথাযথ পৌঁছুতে পারছেন না, কে জানে এই উপলব্ধি থেকেই সম্ভবত সমর সেন চল্লিশের দশকের উপান্তে ঈশ্বর গুপ্তীয় পয়ারে অপসৃত হলেন। সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে অবশ্য ঠিক সেরকম সমস্যায় কোনওদিন পড়তে হয়নি, তাঁর ভাষা গোড়া থেকেই নিখাদ ঘরোয়া ('শত্রুপক্ষ যদি আচমকা ছোড়ে কামান / বলবো, বৎস, সভ্যতা যেন থাকে বজায়')। তবে, কেউ যদি বলেন, স-মিল স-ছন্দ কবিতায় যে-বাচনিক দ্বন্দ্বের আশঙ্কা, তা এড়ানোর জন্যই সুভাষ মুখোপাধ্যায়, একটু একটু করে বরঞ্চ সমর সেনের উল্টোমুখে হাঁটলেন, প্রায় পুরোপুরি গদ্যকবিতার অলিন্দে সেঁধিয়ে গেলেন, তেমন অতিভাষণ বোধহয় হবে না তা।"

[কবিতার ভাষা আর জীবনের ছন্দ, আনন্দবাজার পত্রিকা, ১০ জুলাই ১৯৯৪]

মুখের ভাষা আত্মস্থ করার প্রসঙ্গে সুভাষ মুখোপাধ্যায় অনেক জায়গাতেই বলেছেন তাঁর মায়ের মুখের ভাষা আর তাঁর স্ত্রী গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখের ভাষার কথা। 'মা বলতেন, হেঁকে : জয়মণি ! স্থির হও' এতো সেই মায়েরই মুখের কথা। আর একজনের কথাও বলেছেন মাঘ ১৩৯৪-এ প্রকাশিত আনন্দবাজার পত্রিকার এক লেখায়। কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তকে তিনি জানতেন তাঁর পুত্র সুনীলকান্তির সূত্রে। সুনীলকান্তি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সমবয়সী। "একদিন সুনীলকান্তিকে ডাকতে গিয়ে খোদ বাঘের মুখে প'ড়ে গেলাম।

আমার ওপর হুকুম হল বসবার।

তারপর শুরু হল আক্রমণ। ঠিক আমার ওপর নয়, আধুনিক কবিতার ওপর।

টিকটিকির সামনে প'ড়ে পোকা যেমন সম্বিৎ হারিয়ে ফেলে, আমারও হল সেই দশা। উনি যেসব তত্ত্বের কথা আর রসশাস্ত্রের কথা বলছিলেন, সেদিকে আমার লক্ষ্য ছিল না। আমি মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনছিলাম তাঁর মুখের বাংলা ভাষা।

যতীন্দ্রনাথ নদে-শান্তিপুরের মানুষ। আমার মা ছিলেন কেষ্টনগরের মেয়ে। সেই প্রথম আঁচ করতে পারলাম, বাবার বন্ধুরা কেন কথা শোনার জন্যে মা-কে ছাখ্-না-ছাখ্ রাগিয়ে দেয়।···

সেদিন আমার সত্যিই একটা তুরীয় অবস্থা হয়েছিল। বাংলাভাষা যে কত মধুর, সে সম্বন্ধে যতীন্দ্রনাথ সেদিন আমাকে দিয়েছিলেন যেন দিব্যজ্ঞান।"

['স্রষ্টা আছে বা নাই', কবিতার বোঝাপড়া। পৃ. ১১২-১৩]

গদ্য-পদ্যের কথায়, পরিণত বয়সে পৌঁছে সুভাষ মুখোপাধ্যায় লিখছেন :

"গদ্যকে দিয়ে এখন যেসব মামুলি কাজ করানো হয়ে থাকে, সে কাজও আগে পদ্যের ঘাড়ে ফেলা হত।

তেমনি কবিতার যে কাজ আগে শুধুই পদ্যের এক্তিয়ারে ছিল, গদ্যও আজ তার শরিক।

সত্যি বলতে কি, গদ্য পদ্যের মাঝখানে এখন আর জেলখানার উঁচু পাঁচিল তোলা সাজে না।

কবিতায় তাই আজ গদ্যের অবাধ গতিবিধি। কিন্তু তার মানে এ নয় যে, পদ্যকে নাকচ করে কবিতায় গদ্যই হবে সর্বেসর্বা।

সুতরাং গদ্য থেকে পদ্যে কিংবা পদ্য থেকে গদ্যে আনাগোনা তেমন আটকায় নি।"

[কবিতা কেন লিখেও লিখি না, দেশ, ২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৮]

\+ + +

'কবিতাসংগ্রহ' ১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ডের গ্রন্থপরিচয় অংশে সুভাষ মুখোপাধ্যায়—নাজিম হিকমত প্রসঙ্গে কিছু তথ্য সংকলিত হয়েছে। চিন্মোহন সেহানবীশের স্মৃতিকথন থেকে আরো কিছু প্রাসঙ্গিক অংশ এখানে তুলে দেওয়া হল। হেলসিঙ্কির বিশ্বশান্তি সম্মেলনে প্রতিনিধি হিসেবে এসেছিলেন নিউজিল্যাণ্ডের রিউই অ্যালি। তাঁর মারফত ছাত্রদের হোস্টেলে খাবার ঘরে নাজিম হিকমতের সঙ্গে চিন্মোহন সেহানবীশের আলাপ হয়। "এধার ওধার খুঁজে নাজিম হিকমতের টেবিলে গিয়ে রিউই অ্যালি আমাকে দেখিয়ে বললেন, 'ইনি হচ্ছেন ভারতবর্ষের প্রতিনিধি। তোমার সঙ্গে আলাপ করবার বড় আগ্রহ এঁর।' হতবাক হয়ে অর্থহীন প্রশ্ন করলাম আমি 'আপনিই নাজিম হিকমত?' কবি বুকে হাত দিয়ে সামনের দিকে ঈষৎ ঝুঁকে জানালেন ঠিক ধরেছি। তারপর দৌড়ে গিয়ে একজন দোভাষী ডেকে আনলেন, কারণ কবি ফরাসী বলেন ইংরেজি জানেন না।··· তারপর বললেন, একটি হলদে মলাটের বই তিনি কিছুদিন আগে পেয়েছিলেন, সম্ভবত সেটাই তাঁর বই-এর বাঙলা তর্জমা। 'কিন্তু বলো দেখি তোমাদের দেশে কি লেখা হচ্ছে?'··· আমি পাঁচ মিনিট আলাপের পরেই তাঁর কাছে পরিচয়ের জন্য কবিতা দাবি

করলাম, কিন্তু অপ্রকাশিত কবিতা হওয়া চাই। তিনি মাথা নেড়ে জানালেন 'নিশ্চয়, একটা রুবাই দেব, তুর্কি রুবাই। চীন ভ্রমণের সময়ে একটি পাথরের তৈরি জাহাজ দেখে লেখা চার লাইনের কবিতাটি এই সংখ্যা পরিচয়-এই অন্যত্র ছাপা হয়েছে। রোমান হরফে তুর্কি ভাষায় কবিতাটি লিখে তাঁর তুর্কি বন্ধু ও দোভাষীর সাহায্যে তিনি সেটিকে ইংরেজিতে তর্জমা করিয়ে দিলেন।

প্রশ্রয় পেয়ে আমি একদিন চরম দুঃসাহসের কাজ করে বসলাম। ভাবলাম নাজিম হিকমত তো এককথায় একটা কবিতা দিলেন। এর একটা ঠিকমতো প্রতিশোধ নেওয়া দরকার। সুভাষের 'সুন্দর' কবিতাটি আমার ভারি পছন্দ। স্থির করলাম তর্জমা করে কবিকে ঐটেই দেব। বিজবুদ্ধি বারবার বাধা দিল। কবিতা তর্জমা শুধু কবিই করতে পারে। তর্জমাকারের দুভাষায় সমান দখল থাকা আবশ্যিক—আর সব থেকে গোড়ার কথা কবিতাটি পুরোপুরি মনে আছে কি না জানি না—শুধু তার ইমেজগুলোই মাথায় নাচছে। কিন্তু হিকমতের সংক্রামক বেপরোয়াপানা তখন আমায় পেয়ে বসেছে। মন থেকে যতটা উদ্ধার করা যায় তর্জমা করে পা বাড়ালাম কবির ঘরের দিকে।

কবি কাজ করছেন। টেবিলের পরে স্তূপাকার কাগজপত্র। পাশে দোভাষী তুর্কী বন্ধুও কাজে ব্যস্ত। এমন সময় মূর্তিমান বিঘ্নের মতো আমি ঢুকে জানালাম 'কবিকে বলো পাঁচ মিনিট সময় চাই।' হিকমত চোখ তুলে ঈষৎ ভুরু কুঁচকে বললেন 'পাঁচ মিনিট কেন?' আমি বললাম 'কবিতা শোনাবার জন্য।' আমার কথাটা ভাষান্তরিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই কবি এক কাণ্ড করলেন। হাত দিয়ে সমস্ত কাগজপত্র দূরে হটিয়ে, মৌজ করে বসে বললেন, 'For poetry not five minutes, but eternity.'

কবিতা পড়ছি, দোভাষী বন্ধু তুর্কিতে তর্জমা করছেন—হিকমত মাঝে মাঝে মাথা নাড়ছেন আর তুর্কিতে কিসব যেন বলছেন। কবিতা শেষ হবার পর দো-ভাষী বন্ধু বললেন 'মহৎ কবিতা এটি।' আমি জানতে চাইলাম এটা কার মত, তাঁর না হিকমতের? দোভাষী বললেন, 'আমি হিকমতের কথারই তর্জমা করলাম। তবে আমিও নিশ্চয়ই এ-বিষয়ে একমত।' তারপর বললেন 'হিকমত আপনার কাছে একটা অনুমতি চাইছেন—আপনার কবিতা তুর্কিতেও সম্ভব হলে রুশে অনুবাদের অনুমতি!' আমি বললাম 'হিকমত অনুবাদ করতে চাইছেন এতে আর কথা কি। তবে কবিকে বলো এ কবিতাটি আমার নয়, সুভাষের অর্থাৎ বাংলা ভাষায় তাঁর কবিতার অনুবাদকের। শুনে হিকমত আবার বুকে হাত দিয়ে

সামনের দিকে ঝুঁকে বললেন 'তবে তো এখানে আনন্দের সাথে কর্তব্যপালনের মিল হয়ে যাবে। তিনি তাঁর ভাষায় আমার কবিতা তর্জমা করেছেন, আমি আমার ভাষায় তাঁর কবিতা অনুবাদ করব।' "

[বিশ্ব-মনীষী সঙ্গমে, পরিচয় আশ্বিন-কার্তিক ১৩৬২, পুনর্মুদ্রণ : সুবর্ণজয়ন্তী সংকলন, মে-জুলাই ১৯৮১]

'কবিতাসংগ্রহ' ৩য় খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত 'চইচই-চইচই'-এর শেষ কবিতা মারিস চাকলাইসের 'যুদ্ধের পর : অন্ধ শিল্পীর ছবি দেখানো'। এই কবির আরো তিনটি কবিতার পূরবী রায়-কৃত অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল পরিচয় পত্রিকার ফেব্রুয়ারি ১৯৯১ (৬০ বর্ষ, ৭ সংখ্যা), মাঘ ১৩৯৭-এ। ঐ অনুবাদের সঙ্গে যে কবি পরিচয় ছিল সেটি নিচে উদ্ধৃত হল :

"লাতভিয়ার কবি মারিস চাক্‌লাইস (জন্ম ১৬ জুন ১৯৪০) গত বিশ বছর ধরে রিগার পত্র পত্রিকায় এবং 'লিয়েসমা' নামক প্রকাশনালয়ে কাজ করেছেন। বর্তমানে লাতভিয়া প্রজাতন্ত্রের সাংস্কৃতিক বিভাগে আছেন। তিনি মূলত লাতভিয় ভাষাতেই লেখেন। লাতভিয় থেকে রুশ ভাষায় যে সব তাঁর কবিতাগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলির মধ্যে "পেশেখদ ই ভিয়েচ্‌নস্ত" (পথিক ও অনন্তকাল) "দিয়েন ত্রাভি" (আগাছার দিন), "উত্রের নাইয়া কাপেলকা" (ভোরের শিশির) উল্লেখযোগ্য।

১৯৮৭ সনে তাঁর প্রকাশিত কবিতাগ্রন্থ "দেরেভো পস্রিয়েদি পোলিয়া" (মাঠের মাঝে গাছ) থেকে কবিরই বেছে দেওয়া তিনটি কবিতার অনুবাদ।"